সূচি

ভূ মি কা

আমাদের জাতীয় জীবনে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের ভূমিকা অনন্য। অসাধারণ প্রভাবশালী এই সঙ্গীত পরাধীনতার বন্ধন মোচনের সংগ্রামে দুর্জয় এক হাতিয়ার—মন্ত্রস্বরূপ। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন তাঁদের সকলেরই এক মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্', বিপ্লবীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এর জঙ্গি জাতীয়তাবাদ। সঠিকভাবেই বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাঙালির জাতীয়জীবন ছিল না। বন্দে মাতরমের এই সর্বব্যাপী স্বাদেশিকতার মন্ত্র রূপে ব্যবহার আকস্মিক মনে হতে পারে। এই আকস্মিতার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা একটিই। লেখক বঙ্কিম হয়তো সমকালীন কোনো ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাদেশিকতার নবীন ভাবনাকে সঙ্গীতে রূপ দিয়েছিলেন পরাধীনতার সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে। কী সেই ঘটনা? বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, বন্দে মাতরম্ রচিত হয় *আনন্দমঠ* রচনার অনেকটা আগেই। কিন্তু দেশাত্মবোধক *আনন্দমঠ* উপন্যাসের কাহিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় লেখকের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটির সুপ্রয়োগে। বঙ্কিমের জীবদ্দশায়ই বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতটি *আনন্দ মঠ* গ্রন্থভুক্ত হওয়ায় গোটা উপন্যাসটিই যেহেতু রাজরোষে পড়ে, তাই বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতটিরও ব্যাখ্যা চান তদনীন্তন ব্রিটিশ শাসকবর্গ। এর পরই ব্রিটিশ সরকার বঙ্কিমের সারভিস রেকর্ডের কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টে বিরূপ মন্তব্য করতে আরম্ভ করেন। তাঁকে অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারির পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং *আনন্দমঠ* সহ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি যে রাজদ্রোহ মূলক নয় তা প্রমাণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সঙ্কটে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন বঙ্কিমকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, ইংরেজের রোষ প্রশমনের জন্য বঙ্কিম *আনন্দমঠ*-এর পরবর্তী সংস্করণগুলির পাঠ পরিবর্তন করতে আরম্ভ করেন। ফলে ইংরেজ বিদ্বেষের ভাব অনেকটা দূর হয়ে যায়। কৃষ্ণবিহারী লিখিত অনুকূল সমালোচনাটিও *আনন্দমঠ*-এর পরবর্তী সংস্করণে ভূমিকা স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমের মৃত্যুর অনেক পরে *আনন্দমঠ* তথা 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি যখন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্যোতকরূপে বিপ্লবীরা গ্রহণ করেন তখন শাসকশ্রেণি 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতই শুধু নয় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' এক অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিল সে কথা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা-র যে অভিযোগ বিশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত উঠে এসেছে, তার বিচার করা হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও। কিন্তু প্রায় নব্বই বছরেও শেষ হয়নি এই বিচার, বিশেষ করে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদার প্রশ্নে। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে কেন পৌত্তলিক বলা চলে না এবং এর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ কী করে এল তা বিশ্লেষণ করাও যেমন হয়েছে তেমনি আবার স্বদেশি গানের শীর্ষ স্থানে যেমন 'বন্দে মাতরম্' .... স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদের কণ্ঠে শেষ উচ্চারণও ধ্বনিত হয়েছে সেই 'বন্দে মাতরম্' ই।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় একদিকে যখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিল বিদেশি বস্ত্র পোড়ানো হচ্ছিল, আর অন্যদিকে তখন এক ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী দল আনন্দমঠের অগ্ন্যুৎসব করেছে বিদেশি সরকারের ইঙ্গিতে। এ কথাও ইতিহাসই বলে।

বরং বলা যায় *আনন্দমঠ*-এর প্রেরণায় কেউ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিতে যায়নি, এমনকি ব্রিটিশদের বিতাড়নের জন্য সংকল্প-সংগ্রাম দৃঢ়তর হয়েছে।

'বন্দে মাতরম্' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সংকলনে বিভিন্নজনের লেখা প্রবন্ধগুলিতে যে বিপরীতমুখী প্রয়াস লক্ষিত হয় তাই-ই পাঠকমনে আশা করি কিছু উত্তর খুঁজে দেবে এই দেশমাতৃকার বন্দনা সঙ্গীতটিতে, যা 'শুধু আমাদের জাতীয়তাবোধের মন্ত্রেই উদ্বোধিত করেনি আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্ত বাঙ্‌ময় হয়ে রয়েছে। জানি না, বিশ্বের আর কোনো জাতীয় সঙ্গীত একটি সুপ্ত জাতিকে এতটা একতায়-বীর্যে-প্রত্যয়ে-বলিদানে এগিয়ে নিয়ে গেছে কি না!

এখানে সংকলিত আলোচনাগুলিতে বন্দে মাতরম্ রচনার স্থান, কাল, ব্যবহার প্রভৃতির সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে আলোচনা এবং তার সপক্ষে তথ্যাদি উপস্থিত করেছেন যেমন বিভিন্ন লেখকবৃন্দ তেমনি 'বন্দে মাতরম্'-এর সাঙ্গীতিক দিক এবং জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদার ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের রচনার স্থান ও কাল নিয়ে নানা মত ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে, প্রথমে সেইগুলো নিয়েই আলোচনা করা যাক।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর মজিলপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, মজিলপুর গ্রামের জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই নগেন্দ্র দত্তই বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের নগেন্দ্র দত্ত। উপন্যাসের নগেন্দ্র দত্তর ন্যায় মজিলপুরে নগেন্দ্র দত্ত মহাশয়েরও দুটি বিবাহ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেইসময় তিনি মজিলপুরে নগেন্দ্র দত্তের বাড়িতে থাকতেন এবং সেখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে বারুইপুর কোর্টে যাতায়াত করতেন। এইভাবে মজিলপুরে অবস্থানকালে একবার দুর্গাপূজার সময় নগেন্দ্র দত্তর বাড়িতে দুর্গা প্রতিমা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত রচনার প্রেরণা পান এবং একরাত্রের মধ্যেই সঙ্গীতটি রচনা করেন। সঙ্গীত রচনা শেষ করে পরদিন সকালেই বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতটি দেখাবার জন্যে মজিলপুর-নিবাসী শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্যের কাছে যান।

এখন এই প্রচলিত প্রবাদটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই : বারুইপুর থেকে মজিলপুরের দূরত্ব প্রায় ১৫/১৬ মাইল। বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর কোর্টের আশে পাশে না থেকে ১৫/১৬ মাইল দূরত্বের কাঁচা রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়ে এসে কোর্টে পৌঁছতেন, একথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা হল এই যে, তিনি ঘোড়ায় চড়তেই জানতেন না। এ-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্র একজন ভাল Executive Officer ছিলেন তথাপি কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। ১৭-১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি পিতৃদত্ত একটি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। তিনি পূজার ছুটিতে কর্মস্থল হইতে বাড়িতে আসিয়া উহা জানিতে পারিয়া ঘোড়াটি বিক্রয় করাইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (২৪ অক্টোবর ১৮৬৪-৭ আগস্ট ১৮৬৬) থাকার সময় কোথায় থাকতেন এ সম্পর্কে আমি বারুইপুরে খোঁজ নিয়েছি। এ বিষয় বার অ্যাসোসিয়েশন ও এলাকার প্রাচীন বৃদ্ধ বসবাসকারীদের মতে বঙ্কিমচন্দ্র এই বারুইপুরেই নীলকর সাহেবদের পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে থাকতেন এবং সেখান থেকেই কোর্টে আসা যাওয়া করতেন। তাছাড়া জয়নগর মজিলপুরে প্রচলিত এই প্রবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে মজিলপুরের ওই দত্ত বংশেরই সন্তান বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক স্বর্গত কালিদাস দত্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> মজিলপুরে বন্দে মাতরম্ রচিত হয়েছিল বলে প্রবাদ এখানে প্রচলিত আছে তা সত্য নয়। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম্ কখনোই এখানে রচনা করেননি। আর এখান থেকে বারুইপুর কোর্টে যাতায়াত করতেন বলে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাও সত্য নয়।

কালিদাস দত্ত আরো বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্র দত্ত মজিলপুরের নগেন্দ্র দত্তকে দেখে কল্পিত হওয়া অসম্ভব নয়। মজিলপুরের নগেন্দ্র দত্তরও দুটি বিবাহ ছিল এবং তিনি অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তবে এই নগেন্দ্র দত্তর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্ব আদৌ ছিল না এবং থাকাও সম্ভব ছিল না। তখনকার দিনে বিভিন্ন স্থানে যে ক্যাম্পকোর্ট থাকত, তেমনি একটা ক্যাম্পকোর্ট ছিল এই মজিলপুরে। মজিলপুরের ক্যাম্পকোর্টে বিচার কাজে কখনো কখনো তিনি দু-একদিনের জন্য মজিলপুরে আসতেন এবং মজিলপুরে এসে তাঁর পিতামহ হরমোহন দত্তর বৈঠকখানা বাড়িতে

থাকতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর থেকে আসবার সময় ঘোড়ার গাড়িতে করে আসতেন এবং তাঁর সঙ্গে সশস্ত্র সেপাই থাকত।

কালিদাসবাবুর এই কথা সত্য বলেই মনে হয়। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুরে থাকার সময়কার ওই কোর্টের হেডক্লার্ক বঙ্কিমচন্দ্র স্নেহভাজন কালিনাথ দত্তও লিখে গেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মজিলপুরে গেলে হরমোহন দত্তের বৈঠকখানা বাড়িতে থাকতেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তখন তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই জীবিত এবং তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে তখন তাঁদের বাড়িতে মহা ধুমধাম ও আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গাপুজা হত। তাই বঙ্কিমচন্দ্র পুজোর সময় বাড়িতে না গিয়ে, মজিলপুরে থাকতে যাবেন কেন?

ওপরের এইসব আলোচনা থেকে এখন বলা যেতে পারে যে জয়নগর মজিলপুরে বসে 'বন্দে মাতরম্' রচনা সম্বন্ধে যে প্রবাদটি আছে, তা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত-মিথ্যা।

এবার একটি মজার কাহিনি বলছি। গল্পভারতী মাসিক পত্রিকার ১৩৬২ সালের আষাঢ় সংখ্যায় এই কাহিনিটি প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনিটির লেখিকা শ্রীমতী অনিমা দেবী এবং লেখাটির নাম 'পুরাতন ডায়েরির কয়েকটি পাতা'। লেখাটির কিয়দংশ এই :

> প্রায় সত্তর বছর আগেকার ঘটনা। গঙ্গায় একখানি সুসজ্জিত নৌকা। সেখানে একটি সম্বর্দ্ধনা সভা হবে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসায় নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই আয়োজন করেছেন। নদীতে নৌকার ওপর এই সম্বর্ধনা সভা। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে একে গিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আসবেন। বাঁধার ওপর রাস্তায় রাস্তায় জনসমুদ্র.....।
>
> নৌকায় গিয়ে উঠলাম। উদ্বোধন সঙ্গীত হল 'বন্দে মাতরম্' গানে। মনে হয় সভার উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে এইখানেই সর্বপ্রথম এই গান গাওয়া হয়েছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশমতই। 'বন্দে মাতরম্' গান আমার শিক্ষক ও আমি দুজনে গাইলাম......বঙ্কিমচন্দ্র খুব মন দিয়ে গানটি শুনেছিলেন এবং গান শেষ হলে প্রশংসা করেছিলেন। সে কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর একটি মেয়ে মালা চন্দন দিয়ে সম্বর্ধনা জানাল বঙ্কিমচন্দ্রকে। ....আমরা দুটি মেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পাশে বসে রইলাম। তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমাদের দুজনকে আদর করে রসিকতা করে কতকথাই না বললেন।.....বঙ্কিমচন্দ্র রসিকতা করে আমাদের দুজনকে যে নতুন নাম দিয়ে ফেললেন তা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস কপালকুণ্ডলা ও দেবী চৌধুরীরানীর নায়িকাদ্বয়/সম্বর্ধনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র যা' বলেছিলেন সব কথা সেই বয়সে বোঝা ও মনে থাকা সম্ভব নয়। তবু কিছু কিছু মনে আছে মাত্র। ...আজ তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল এই বন্দে মাতরম্ গান গাওয়া এবং জনসমাজে তার সুরের রেশ ছড়িয়ে পড়ায়। .... এইখানে বসেই একদিন আনন্দমঠ রচনার অনুপ্রেরণা আমি পাই। আজ এইখানেই সে গানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল।

অণিমা দেবী তাঁর এই দীর্ঘ প্রবন্ধের অন্যান্য স্থানে লিখেছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্রের শোবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, বিস্তৃত পালঙ্ক পাতা, সামনে আলমারি। বই টানা রয়েছে। খাতাপত্র পড়ে রয়েছে একটা টেবিলে। সেগুলি কোনো উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নয়—সব কাছারির নথিপত্র। পিতাঠাকুরের সঙ্গে বের হলাম। তিনি ক'দিন ধরেই রোজ বিকেলবেলা বঙ্কিমচন্দ্রের সান্ধ্য আসরে যোগ দিতে যাওয়ার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সে সময় বহরমপুরে কয়েকজন দেশবিখ্যাত সাহিত্যিক বাস করতেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, লোহারাম শিরোমণি প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখনই অক্ষয়চন্দ্র সরকার ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহরমপুরে ছিলেন। তাই অণিমাদেবীর এই সকল উক্তি ও তাঁর লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে দীর্ঘকাল অবস্থানের কথা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অণিমা দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের যে সংবর্ধনা সভাটির কথা লিখেছেন সেটি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গিয়েছিলেন ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৬৯ এবং ছিলেন ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ পর্যন্ত।

অণিমা দেবী লিখেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র সংবর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন তিনি বহরমপুরে বসেই *আনন্দমঠ* রচনার প্রেরণা পান এবং এই সংবর্ধনার আগেই তিনি *আনন্দমঠ* রচনা করেছিলেন। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে না আসতেই তিনি *আনন্দমঠ* রচনার প্রেরণাই বা পেলেন কবে আর *আনন্দমঠ* রচনাই বা করলেন কবে? বঙ্কিম জীবনী তথা বঙ্কিম জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য গবেষণায় যাঁরা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের রচনার মাধ্যমে আমরা যেগুলি আজ সবাই জানি তা হল বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ছিলেন প্রায় চারবছর। তারপর বারাসতে কিছুদিন থেকে (৪ মে, ১৮৭৪—২০ অক্টোবর, ১৮৭৪) আটমাস ছাব্বিশ দিন ছুটি নিয়ে কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে থেকে ১৮৭৬ খিস্টাব্দের ২০ মার্চ হুগলিতে কাজে যোগ দেন। হুগলিতে ডেপুতে ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে তিনি ১৮৮০ খিস্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখে চুঁচুড়া থেকে কবি নবীনচন্দ্র সেনকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। সেইপত্র থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, তিনি *আনন্দমঠ* রচনায় হাত দিয়েছেন।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের কাছে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রটিতে *আনন্দমঠ* রচনার স্পষ্ট উল্লেখের কথা ছাড়াও আরো জানা যায় যে হুগলি থেকে বদলি হওয়ার পর যখন তিনি কলকাতায় ও আলিপুরে ছিলেন (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮১—৩ মে ১৮৮২) তখন তাঁর কলকাতায় বহুবাজার স্ট্রিটস্থ বাসভবনে সাহিত্যিকদের সান্ধ্যবৈঠকে আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি পড়া হত। (প্রথম প্রকাশ ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৮২)

অতএব *আনন্দমঠ* যে বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের বহু বছর পরে রচিত হয়েছিল তার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল। আর একটি কথা—অণিমা দেবী যে

লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ও তাঁর সঙ্গিনীটিকে *কপালকুণ্ডলা* ও *দেবী চৌধুরীরানী*-এর নায়িকাদ্বয়ের নাম দিয়েছিলেন, এও অসম্ভব কথা। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর যাওয়ার পূর্বে *কপালকুণ্ডলা* রচিত হলেও (১৮৬৬) তাঁর বহরমপুর যাওয়ার অন্তত ১৩-১৪ বছর পরে (*আনন্দমঠ*এরও পরে) ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে *দেবীচৌধুরীরানী* রচিত হয়েছিল।

আনন্দমঠ ও *দেবীচৌধুরানী*-র মতো মহরমপুরে যাওয়ার অনেক পরেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' গানটিও রচনা করেছিলেন। তাই অণিমা দেবী *আনন্দমঠ* রচনা ও তাঁর নিজে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া সম্বন্ধে যে সব কথা লিখেছেন, তা সম্পূর্ণই একটি বানানো অলীক কাহিনি বলেই মনে হয়।

'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে এবার আর একটু গভীর আলোচনায় আসা যাক : সঞ্জীবচন্দ্র তখন *বঙ্গদর্শন*-এর সম্পাদক। সেই সময় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা থেকে *বঙ্গদর্শনে*-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। প্রথম মাসেই *আনন্দমঠ*-এর অন্তর্গত বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি ছাপা হয় (মার্চ, ১৮৮০ খিস্টাব্দে)। 'বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতটি *আনন্দমঠ* উপন্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে *বঙ্গদর্শন*-এ প্রথম প্রকাশিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গীতটি রচনা করেন কিন্তু এর অনেক আগেই। অন্তত পাঁচ ছয় বছর আগে। তখন তিনি নিজে *বঙ্গদর্শন*-এর সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা *পূর্ণচন্দ্র* চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, *বঙ্গদর্শন* ছাপার সময় মাঝে মাঝে লেখা কম পড়লে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রকে উপস্থিত মতো কিছু কিছু লিখে দিতে হত। একবার প্রায় একশো পাতা লেখা কম পড়লে পাতা পূরণের জন্য ছাপাখানার পণ্ডিতমশায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে এলেন। ওই সময় বঙ্কিমচন্দ্র একটি কাগজে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি লিখে টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। একদিন ছাপাখানার পণ্ডিত মশায় 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি দেখে মন্দ হয়নি, ঐটাই দিন না' বললে বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হয়ে কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রেখে বললেন, 'উহা ভাল কী মন্দ, এখন তুমি বুঝতে পারবে না, কিছুকাল পরে বুঝবে, আমি তখন জীবিত না থাকাই—সম্ভব, তুমি থাকতে পার।'

বঙ্কিমচন্দ্রের পরম সুহৃদ দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিত মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। এই ললিত মিত্রও বলেছেন, 'বন্দে মাতরম্' রচনার পরে বঙ্কিমচন্দ্র যদুনাথ ভট্টাচার্য (ইনিই বিখ্যাত গায়ক যদুভট্ট, বঙ্কিমচন্দ্র এঁর কাছে গান শিখতেন) নামক একজন গায়ককে দিয়ে প্রথমে বন্দে মাতরম্-এর সুর দেওয়ান। ওই সময় বঙ্গদর্শন পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় গান শুনে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, ওতে *বঙ্গদর্শন*-এর পেট ভরবে না। বঙ্গদর্শনের জন্য অন্য কিছু লিখুন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত *বঙ্গদর্শন* সম্পাদনা করেন। এই চার বছরের মধ্যে দুবছর তিনি বহরমপুর থেকে, এক বছরের বেশি কিছু সময় বারাসত থেকে এবং শেষের আট মাস তিনি কাঁটালপাড়ার বাড়িতে থেকে

বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন। এই আট মাস তিনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ও বারাসতে থাকার সময় তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *বঙ্গদর্শন*-এর তত্ত্বাবধান করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৬ খিস্টাব্দের মার্চ মাসে হুগলিতে কাজে যোগ দেওয়ার আগে যে আটমাস ছুটি নিয়ে বাড়িতে ছিলেন, ওই সময়ের মধ্যেই কোনো একদিন তিনি 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। তা হলেই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ললিত মিত্র, *বঙ্গদর্শন*-এর কার্যাধ্যক্ষর কথা এবং গানটি রচনার কিছুদিন পরেই যদু ভট্টকে দিয়ে সুর দেওয়ানোর কথা যে উল্লেখ করেছেন, সেগুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি মেলে। যদুভট্ট ওই সময় কাঁটাল পাড়াতেই বাস করতেন। এ সম্বন্ধে আরও একটা প্রমাণ এই যে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে কিছুদিন পরে যখন তিনি চুঁচুড়ায় বাড়ি নিয়ে বসবাস শুরু করলেন (প্রথমে তিনি নৈহাটির বাড়ি থেকে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে হুগলি যাতায়াত করতেন) তখন বিশিষ্ট লেখক, নবজীবন সম্পাদক চুঁচুড়াবাসী অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বন্দে মাতরম্' গানের একটু আধটু অদল বদল করতেও দেখছেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, 'বন্দে মাতরম্' এই সময়ের খুব বেশিদিন আগে রচিত নয়, কারণ তখনও তাতে সুর দেওয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এ বিষয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারও বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর একটি প্রবন্ধে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি হুগলিতে আসার আগে কাঁটালপাড়ায় অবকাশ যাপনের সময় রচিত শুনেছেন বলে উল্লেখ করছেন। (দ্রষ্টব্য : বঙ্কিম প্রসঙ্গ—অক্ষয়চন্দ্র সরকার)।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ৫ নং প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনের বাড়িতে পরলোক গমন করেন। তার প্রায় আট বছর আগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি গীত হওয়ার কথা থাকলেও কোনো গূঢ় কারণবশত পরিত্যক্ত হয়। *আনন্দমঠ বঙ্গদর্শন*-এ ১২৮৭ সালের চৈত্র থেকে ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষের বছর ১২৮৯ সালেই (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ) আনন্দমঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *আনন্দমঠ* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল বটে, কিন্তু এর অন্তর্গত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটির প্রতি অনেক বছর পর্যন্ত লোকের তেমন দৃষ্টি পড়ল না। সভা-সমিতি বা অন্য কোথাও এ গান কেউ প্রকাশ্যে তেমন গাইল না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কিন্তু এই গানটি রচনা করে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষক স্বনামধন্য যদুভট্টকে দিয়ে এ গান গাওয়াতেন। পুর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও লিখেছেন—'এই গীতটির একটি সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত।'

আনন্দমঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার চোদ্দো বছর পরে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বিডন স্কোয়ার উদ্যানে (অধুনা রবীন্দ্রকানন) ডি. ওয়াচার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতেই দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এক মহতী সভায় 'বন্দে

মাতরম্' সঙ্গীতটি গাইছেন। সেদিনকার সেই সভায় উপস্থিতদের মধ্যে সাহিত্যিক-সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের এই 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়া সম্বন্ধে লিখেছেন :

> মনে আছে শ্রীযুক্ত ওয়াচারের সভাপতিত্বে বিডন উদ্যানে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গীত এই 'বন্দে মাতরম্ গান শুনিয়া একজন মদ্রদেশাগত প্রতিনিধির নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়াছিলাম। (দ্রষ্টব্য নারায়ণ—বৈশাখ, ১৩২২)।

আরো কয়েক বছর কেটে গেল। তারপর ১৯০৫ খিস্টাব্দে দেখা দিল 'বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন'। এই বঙ্গভঙ্গের সময়েই বাঙালি সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম' গান নিয়ে মেতে উঠল। তখন একদিকে তাদের মুখে যেমন কেবল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি শোনা গেল, অপর দিকে তেমনি সর্বত্র তাদের এই গান গেয়ে বেড়াতেও দেখা গেল। এই সময় 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে মিশ্র সুর সহযোগে কোরাসে গাইবার জন্য 'বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়' বলে একটা দলও তৈরি হয়েছিল। এরা দিকে দিকে এই গান গেয়ে বেড়াতে লাগল। এই দলের অন্যতম গায়ক নরেন্দ্রনাথ শেঠ লিখেছেন :

> আমরা বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায় বাঙালীর দ্বারে দ্বারে এই গান গাহিয়াছি—বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নয়নে জ্যোতি দেখিয়াছি, অশ্রু দেখিয়াছি, মস্তক অবনত দেখিয়াছি। এই গানের স্নিগ্ধ গভীর তরঙ্গে তারা আত্মহারা হইয়াছে দেখিয়াছি। (দ্রষ্টব্য প্রবর্তক, শ্রাবণ ১৩৪৫)।

এই বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায় ছাড়াও তখন যে, যে সুরে পারত, সে সেইসুরে এই গান গাইত। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন :

> আজ আমার সেই দিনের কথাই মনে পড়িতেছে—তখন সমগ্র বঙ্গদেশ 'বন্দে মাতরম্' গানে মুখরিত। বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ের উদাত্ত সুর হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণবের কীর্তনের সুর পর্যন্ত কত সুরে কতজন এই গান গাহিতেছে। (দ্রষ্টব্য : নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২)।

একদিকে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত, অন্যদিকে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে লোকের মুখে মুখে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। তখন এই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে, সভা-সমিতি, রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতিতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ বলে আদেশ জারি পর্যন্ত করেছিল। বাঙালি সেদিন এই সরকারি আদেশ অমান্য করে শত নির্যাতন সহ্য করেছে। কিন্তু তবুও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ছাড়েনি।

বাংলায় বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন যখন পুরোদমে চলেছে, সেই সময় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। কংগ্রেসের এই

অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী-দুহিতা সরলা দেবী ও তাঁর মহিলা সহশিল্পীবৃন্দ সমস্বরে 'বন্দে মাতরম্' গানটি করেন। এই গান শুনে সমবেত সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবধারাও প্রবাহিত হল।

এদিকে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বলে প্রচার করলেন। অরবিন্দ ঘোষও (পরে শ্রীঅরবিন্দ) লিখে এবং বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিত্বের ও 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন প্রেসের পণ্ডিত মহাশয়, বৈবাহিক ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিদের কাছে একাধিকবার বলেছিলেন যে, 'এই বন্দেমাতরম্ গান নিয়ে বাঙালী একদিন মেতে উঠবে।' এতদিনে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলল।

বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন চলেছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্গবাসী বঙ্গভঙ্গ রদ করতে সক্ষমও হয়েছিল। এই বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দালনের সময়েই বাঙালি 'বন্দে মাতরম্' শব্দকে দেশাত্মবোধের বীজমন্ত্র হিসাবে এবং বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এই সময় থেকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি এবং 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গ্রহণ করল। তবে বঙ্গভঙ্গের সময় বাঙালি যেমন 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে মেতে উঠেছিল, কংগ্রেসও তেমনি মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল তখনই সমগ্র ভারত 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ও সঙ্গীত নিয়ে মেতে উঠেছিল।

স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র হিসাবে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি এবং জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত বহু বছর ধরে কংগ্রেসে চলে আসতে লাগল। হঠাৎ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন স্বার্থান্বেষী মুসলিম লিগপন্থী মুসলমান ধূয়া তুলল যে, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত পৌত্তলিকতাগন্ধী।

কংগ্রেসের মধ্যে অনেক মুসলমান থাকায় তাঁদের প্রতি লক্ষ করেই, সত্যিই বন্দে মাতরমে্র মধ্যে কোথাও পৌত্তলিকতার ইঙ্গিত আছে কিনা, সে সম্বন্ধে কংগ্রেসও বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিল। কংগ্রেসের মধ্যে কেউ কেউ 'বন্দে মাতরম্'কে পৌত্তলিকতা গন্ধী বলে স্বীকারও করলেন। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতকে পৌত্তলিকতাগন্ধী বলে অভিমত দিলেন। সেই সময় বাংলার অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মধ্যে যে পৌত্তলিকতার গন্ধ নেই এমত প্রকাশ করেছিলেন। যাইহোক কংগ্রেসের বিচারে শেষ পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্' পৌত্তলিকতাগন্ধী বলে স্বীকৃত হয়। অবশেষে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে হরিপুর কংগ্রেসে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের সমস্ত শেষাংশ বাদ দিয়ে মাত্র প্রথমাংশটাকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা হবে স্থির হল। এতদিন 'সপ্তকোটি' ও 'দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈ' এর বদলে সর্বভারতীয়-র উপযোগী করে 'ত্রিংশকোটি কণ্ঠ ও দ্বিত্রিংশকোটি ভুজৈ' করা

হল। এই কাটছাঁট ও অদলবদল করে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে শেষ পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্' এর যে রূপ দাঁড়াল তা এইরকম :

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনী সুমধুর ভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।
ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কল-কল নিনাদ করালে
দ্বিত্রিংশকোটি ভুজৈধৃত খরকর বালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং মাতরম্।।

হরিপুরা কংগ্রেসের (১৯৩৮, সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু) পর থেকে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই ছিল আমাদের জাতীয় সঙ্গীত।

বলাবাহুল্য, স্বাধীনতার পরই বন্দে মাতরম্-এর স্থলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'জন-গন-মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা' গানটি ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হলেও 'বন্দে মাতরম্' অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতরূপে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গীত হয়।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত *আনন্দমঠ* উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম্' দুটি শব্দ হিসাবে লিখেছেন এবং মাতরং লিখেছেন। এমনকি গ্রন্থবদ্ধ প্রথম থেকে পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত এভাবেই লেখা হয়। পরে এক সঙ্গে ছাপা হতে দেখা যায়। এটা মুদ্রণ প্রমাদ বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিম গ্রন্থাবলির সম্পাদক ও বঙ্কিম আলোচকরা দুটি শব্দকে এক করে 'বন্দে মাতরম্' ছাপিয়েছেন।

জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরমের মতোই মাদাম কামা পরিকল্পিত ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকায়ও স্থান দেওয়া হয়েছিল 'বন্দে মাতরম'-এর। তাই দেখা যায় পতাকায় সমান্তরালভাবে ওপর থেকে নীচের দিকে পর্যায়ক্রমে গাঢ় সবুজ, গাঢ় পীত এবং গাঢ় লাল জমির ওপর প্রথমে সবুজ অংশে আটটি শ্বেত পদ্ম, দ্বিতীয় পীত অংশে নীলবর্ণে দেবনাগরী অক্ষরে 'বন্দে মাতরম' এবং সর্বনিম্নে লাল অংশের বাঁ দিকে একটি শ্বেত সূর্য ও দক্ষিণ দিকে একটি অর্ধচন্দ্র বিরাজ করতে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট কলকাতার পার্শীবাগানে (গ্রীয়ার পার্কে) রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সেই পতাকা উত্তোলন

করেন। ভাষা ও বৈচিত্র্যে ভরা তৎকালের আটটি অঞ্চলে (প্রদেশে) বিভক্ত হিন্দু-মুসলমানের স্বপ্নের স্বাধীন ভারতভূমির জাতীয় পতাকায় লেখা ছিল 'বন্দে মাতরম্'। আর সঙ্গে ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় প্রতীকরূপে সূর্য ও অর্ধচন্দ্র। কী সঙ্গীতে কী পতাকায় বন্দে মাতরম কোনো সাম্প্রদায়িক অপব্যাখ্যার শিকার হয়নি তখনও। বাংলার পরই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই, লাহোর, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অধিবেশনে উত্তোলিত হয় এই পতাকা। এমন কি ওই বছরেই লন্ডনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক বক্তৃতা সভায়মঞ্চে এই পতাকা রাখা হয়েছিল বলে সমকালীন সংবাদপত্র থেকে জানা যায়। তারপর নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে-হানাহানিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শুধু দীর্ঘায়িতই হয়নি, বিভিন্ন সময়ে এসেছে পতাকায়ও পরিবর্তন, সে আর এক ইতিহাস। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারত দ্বিখন্ডিত হয়ে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলেও রাষ্ট্রীয় পতাকায় 'বন্দে মাতরম্' আর ফিরে আসে নি সত্য তবে পতাকা উত্তোলিত হলে আজও 'জয়হিন্দ', 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিত হয়।

পরিশিষ্ট অংশে বিশিষ্টজনের দ্বারা 'বন্দে মাতরম্'-এর ইংরেজি অনুবাদ সংগ্রহ করে দেওয়া হল। দেওয়া হল রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিভা দেবী কৃত সুরে বন্দেমাতরমের স্বরলিপি এবং একটি 'বন্দে মাতরম্' তথ্য ও আলোচনাপঞ্জি। যার সাহায্যে গবেষক ও কৌতূহলী পাঠক জ্ঞাতব্য তথ্য না হোক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের বিচার তথা ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করতে পারবেন।

এই গ্রন্থ সংকলনে যাঁদের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত বাসুদেব মোশেল (বরিষ্ঠ গবেষক, বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ চৌধুরী (ডিরেক্টর, বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি), শ্রীযুক্ত গৌতম সরকার (কিউরেটর, বঙ্কিম সংগ্রহশালা, বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি), শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদক 'প্রতি')। আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

সবশেষে যে কথা বলতেই হবে তা হল গ্রন্থের পরিকল্পনায় ও শেষ করার জন্য নিরন্তর তাগাদায় এবং উদ্যোগে পারুল প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত গৌরদাস সাহা মহাশয়ের নেপথ্য ভূমিকাই সম্ভব করেছে পাঠক সমাজের কাছে এই দুষ্প্রাপ্য সংকলনটিকে পৌঁছে দিতে।

অশোককুমার রায়

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেকালের পল্লিগ্রাম মাত্রেই পাঠশালা থাকত। আমাদের গ্রামেও পাঠশালা ছিল, আমাদের বাটির সন্নিকটে একটি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে তো নয়। হুগলি কলেজে ভরতি হইবার পূর্বে তাঁহাকে একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক, উপনয়ন হয় নাই। এই অবস্থায় তিনি মধ্যে মধ্যে ওই পাঠশালায় উপস্থিত হইতেন। গুরুমহাশয় কায়স্থ-সন্তান, বড়ো রাসভারি লোক, ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। যখন তিনি ভূমিতে বেত আছড়াইয়া, 'লেখ্ লেখ্ শূয়াররা' বলিয়া চীৎকার করিতেন, তখন ছাত্রেরা থরহরি কাঁপিতে থাকিত। বালক বঙ্কিম. একদিন বৈকালে এই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাস্বরূপ গুরুমহাশয় হাসিয়া তাঁহার হস্তে বেতগাছটি তুলিয়া দিতেন। বালক বঙ্কিম বেত লইয়া কোনো কোনো ছাত্রের নিকট গিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রেরা কেহ বা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ সমবয়স্ক, কেহ বা বয়ঃকনিষ্ঠ। অধিকাংশ ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুই তিন জন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত দুলাইয়া বলিতেন :

> মারি মারি? আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ি তাস খেলতে যাও নাই?' বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন, দুই প্রহরের সময় ঐ কয়জন বালকের সহিত কোনো কোনো দিন তাস খেলিতেন। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা—যাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভালো লাগিত না, সেইজন্য দুর্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বালকদিগের পরীক্ষা করাতে তাহাদের উৎসাহ হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁষিত পারিত না। তিনি কাহাকেও ভালো বলিলে তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধিত হইত। স্কুলে, কলেজে তাঁহার সমধ্যায়ীদিগের উপরও ঐরূপ প্রভাব ছিল, ইহা তাঁহার অমান্য প্রতিভারই মহিমা। লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন যৌবনে একজন বিখ্যাত বাংলা লেখক হইলেন, তখন অনেকগুলি সুশিক্ষিত যুবককে উৎসাহ দিয়া লেখক করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক একজন বিখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র না জন্মাইলে রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কখনও বাংলা ভাষার লেখক

হইতেন না, চিরকাল ইংরেজি লেখক থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় ও অনুপ্রাণনে তাঁহারা বাংলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পৌষ কি মাঘ মাসে একদিন সূর্যোদয়ে পাঠশালায় যাইয়া গুরুমহাশয় দত্ত বেত লইয়া, বালক বঙ্কিম কোনো একটি বালকের নিকট বসিয়া তাহার লেখাপড়া দেখিতেছিলেন, এমন সময় একটা গোল উঠিল যে, গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর লাগিয়াছে। এই সংবাদে চারিদিকের লোকজন কী পুরুষ, কী স্ত্রীলোক, কী বালক ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পাততাড়ি ফেলিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় চটি জুতা পায়ে ফটফট শব্দে পলাইলেন। এক ব্যক্তি এক ঝুড়ি বেগুন লইয়া নৈহাটির বাজারে বিক্রি করিতে যাইতেছিল, সে উহা আমাদের ঠাকুর বাড়ির দরজার নিকট ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তাঘাট নির্জন হইল। সকল বাটির দরজা বন্ধ হইল, কেবল বালক বঙ্কিমের জন্য আমাদের বাড়ির দরজা খোলা রহিল, তিনি গুরুমহাশয়-প্রদত্ত বেত হাতে করিয়া আমাদের বাটির দরজার নিকট রাস্তার ধারে দাঁড়াইলেন, সুতরাং আমাদের যত লোকজন ছিল, তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। পিতৃদেব তখন তাঁহার কর্মস্থলে, অগ্রজদ্বয়ও তাহার নিকটে। গ্রামে গোরার বহর লাগিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা বিপদের ভয়ে পলায় কেন! সেকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরারা দলবদ্ধভাবে কলিকাতায় আসিত, কিন্তু পীড়িত গোরারা নৌকাযোগে আসিত। যে স্থানে সূর্যোদয় হইত, সেই স্থানে ঐ সকল গোরা প্রাতঃক্রিয়ার জন্য ডাঙায় উঠিত, এবং গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকারে উৎপাত করিত। দুই তিন বৎসর পূর্বে একবার গ্রামে নামিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার বহর শুনিলে আমাদের গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুমহাশয়-প্রদত্ত বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় একদল গোরা আসিতেছে, দেখা গেল। তাহারা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কী কথা কহিতে লাগিল, একজন বেতটি লইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপ দলে দলে গোরা আসিতে লাগিল। বালক বঙ্কিম স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আধ-ঘণ্টার মধ্যে তাহারা ফিরিয়া গেল, বহর ছাড়িয়া দিল, গ্রাম আবার সজীব হইল। কথাটা অতি সামান্য বটে, কিন্তু যে গ্রামের লোকেরা গোরার ভয়ে পলাইল, সকল দরজা বন্ধ হইল, বালক বঙ্কিম সেই গ্রামেই পাতিপালিত, আকাশ হইতে পড়েন নাই। তিনি নির্ভয়ে বেত্রহস্তে গোরার সম্মুখে দাঁড়ান কেন, এই তেজটুকু বালকের পক্ষে অসামান্য বোধ হওয়াতেই এই স্থলে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। তিনি নিজেই চন্দ্রশেখরের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙালির ছেলে মাত্রেই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখতে চায়।

যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতদের ভয় করেন নাই ; কৈশোরে নদীবক্ষে ঝড় তুফানের ভয় করিতেন না, আর যৌবনে গুলিভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দশ কী এগারো বৎসর, তখন একদিন সংবাদ আসিল যে, একদল ডাকাত আমাদের বাটিতে ডাকাতি করিবে। পিতৃদেব তখন বাটিতে ছিলেন না, জেঠামহাশয়, খুড়ামহাশয়, পিসেমহাশয় প্রভৃতি মুরুব্বিগণ বন্দোবস্ত করিলেন যে, স্ত্রীলোকেরা ও আমার চার ভ্রাতা কয়েক রাত্রের জন্য প্রতিবাসীর গৃহে বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র বালক বঙ্কিম বাঁকিয়া বসিলেন, কুঞ্চিত কেশরাশি দুলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'তাহা কখনই হইতে পারে না, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাইব না।' পিসেমহাশয় বলিলেন, 'তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক।' বঙ্কিম বলিলেন, 'কেন কেটে যাবে? আমাদের বাড়ীতে ত অনেক লোক আছে, আর গ্রামের তেওর বাগদি যাহারা এক একজন লাঠিয়াল ও বোম্বেটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন, সাধ্য কি যে ডাকাতরা আমাদের কেটে খায়।' তাঁহার অগ্রজদ্বয়েরও ঐ মতে মত হওয়াতে, বালক বঙ্কিমেরই পরামর্শ মতে কার্য হইল। কয় রাত্রি ধরিয়া অনেক লোক আমাদের বাড়ি পাহারা দিত। ডাকাত আসিয়া ফিরিয়া গেল। ওই দিন হইতে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বাঁকা' বলিয়া ডাকিতেন।

আমাদের গ্রামের অপর পারে হুগলি কলেজ, প্রায় সাত আট বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা চড়িয়া ওই কলেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই এক এক দিন ছুটির সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কেমন রে, নৌকা ছাড়বি?' মাঝি নৈহাটির পাটনী কখনও 'না' বলিত না, নৌকা খুলিয়া দিত। কোনো কোনো দিন ঝড় উঠিবার পূর্বে নৌকা ঘাটে গিয়া পৌঁছিত, আর কোনো কোনো দিন মাঝ গঙ্গায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কালো মেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কালো হইত। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রবল বেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গ সকলের মাথাগুলি ভাঙিয়া ফেনার রাশিতে যেন নদীর বক্ষে তুলার মাড় ভাসিত। যাঁহারা নদীবক্ষে ঝড়ে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন কী ভয়ানক দৃশ্য! বঙ্কিমচন্দ্র একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেন। যিনি ষাঁড় গোরু দেখিয়া ভয় পাইতেন, তিনি প্রকৃতির এই সর্বসংহারিণী মূর্তি অজ্ঞান হইয়া দেখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলেজ পরিত্যাগ করিবার তিন-চার বৎসর পূর্বে, আমি ওই কলেজে ভরতি হই, সুতরাং আমাকেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত এই বিপদে পড়িতে হইত।

বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এই সময় একজন নীলকর সাহেব, হাতীর শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তখন বেঙ্গল পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই, ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পুলিশ কাজ করিত। দারোগাগণ ওই সাহেবটিকে কোনোমতে ধরিতে পারিল না, কেন না তাঁহাদের নিকট

সর্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন। সাহেবটি British-born-subject, সুতরাং হাইকোর্টে সোপর্দ হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ওই আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল ; কেন-না তিনি উহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম চরিত্রে এইরূপ বিচিত্র অসামঞ্জস্য মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইত।

এই সঙ্গে একটা রহস্যের কথা মনে পড়িল, উহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিবস এরূপ কুয়াশা চারিদিক ব্যাপিয়া ছিল যে, কোলের মানুষ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। আমার জীবনে কখনও ঐরূপ কুয়াশা দেখি নাই ; উহা প্রায় ১০/১১টা অবধি ছিল। আমরা কলেজে যাইবার সময় নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িতে বিশেষ আপত্তি করিল, বলিল, দিক ঠিক করিতে পারিব না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা শুনিলেন না, নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিলেন। তখন ভাঁটা, নৌকা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের নৌকা দশ-পনেরো মিনিটে কলেজ ঘাটে পৌছিত, কিন্তু প্রায় একঘণ্টা হইল, নৌকা চলিতেছে, কোথায় কলেজ ঘাট ! নৌকা কেবল চলিতেছে, চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?' মাঝি বলিল, 'আজ্ঞে তা জানি না।' 'সে কি রে?' 'আজ্ঞে বোধহয় ভাটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।' মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে, নৌকা ক্রমাগত স্রোতে ভাসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকা আপনা-আপনি এক স্থানে তীরলগ্ন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কোন্ জায়গা?' মাঝি বলিল, 'বুঝি মুলাজোড়।'

কপালকুণ্ডলা গল্পটি যে কুজ্ঝটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই এই দিনের ঘটনাবলম্বনে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে এবং কৈশোরে গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু যে সে লোকের নিকট নহে, কিংবা যা তা গল্প নহে—সেকালের লোকের নিকট সেকালের গল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একখানি উপন্যাস কোনো কোনো ঘটনা অথবা কোনো কোনো গল্প অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। গত চৈত্রমাসের *ভারতীতে বঙ্কিমচন্দ্র* ও *দীনবন্ধু* প্রবন্ধে কী ঘটনা অবলম্বনে *কপালকুণ্ডলা* রচিত ইয়াছিল, তাহা লিখিয়াছি. এই প্রবন্ধে আরও দুইখানির কথা লিখিব। আমাদের খুল্লপিতামহ একশত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা, তাঁহাকে আমরা মেজঠাকুরদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম তাহা বাঙালার ইতিহাসের অন্তর্গত ; উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসানকালের কথা। ইনি গল্প করিতে ভালবাসিতেন ও গল্প করিতে জানিতেন। আধুনিক কোনো কোনো বিদেশি গল্প লেখকেরা যেমন নায়ককে মিস্টার এবং নায়িকাকে মিস লিখিয়া থাকেন, এই বর্ষীয়ান তেমনি তাঁহার নায়ককে মির্জা এবং নায়িকাকে বিবি বলিতেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছিলেন ; যদিও ওই ঘটনা আকবর শাহ

বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, অথচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম, জাহানবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ওই অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিংবদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ওই স্থানে শুনিয়াছিলেন, মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুতকুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠারো-উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে *দুর্গেশনন্দিনী* রচিত হইল। সরকারি কার্যোপলক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তখন বোধ হয় *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশিত হইয়াছিল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের 'মতিবিবি' বোধ হয় একটা গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। কোনো দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবনারম্ভে কুলত্যাগিনী হইয়া কোনো ধনাঢ্য সুবার রক্ষিতা হয়। প্রায় পাঁচ -ছয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন তাহার স্বামীকে দেখিয়া তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে কান্না আর থামিল না। কিছুদিন পরে প্রভুর অতুল ঐশ্বর্য তাহার যাহা কিছু সঞ্চিত ধন ছিল, তাহা লইয়া স্বামীদর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিল। এমত স্থানে বাসা লইল, যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিতে পায়। প্রতিদিন তাহাকে দেখিত আর কাঁদিত। এইরূপ দিবানিশি কাঁদিত। কুলত্যাগিনী হইলেও তাহার প্রতিবেশিনীগণ তাহার দুঃখ শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিত। এইরূপে কিছুদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই চির অভাগিনীর যৌবনেই জীবনান্ত হইল।

ইহার চরিত্রের সঙ্গে মতিবিবির কোনা সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য আছে।

বর্ষীয়ান খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইঁহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেরূপে বই সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমার বোধ হয় একজন লেখকও পারিত কিনা সন্দেহ। সেকালের লোক 'ফসল অজন্মা' এই সকল কথার সর্বদা আন্দোলন করিতে ভালবাসিত। মেজঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন। পরে কী প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন। তিন-চার বৎসর পূর্ব হইতে অজন্মা হইল, আর ওই বৎসর (১২৭৬ সালে) ফসল হইল না ; এই কয় বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণির লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্যশ্রেণির গৃহস্থের, পরে ধনবানদেরও আহার বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণির লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা মাটিতে পোতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেন না টাকা খাইতে পারে না, টাকাতে ধানচাল

কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এইরূপ অবস্থাতে বঙ্গে নানাপ্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইয়া, অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাকা পোতা ছিল, তাহারাও অন্নাভাবে চোর ডাকাত হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল ; কেন না, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে ওই গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোনো উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে *আনন্দমঠ* লিখিলেন।

'বন্দে মাতরম্' গীতটি উহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎবাক্য আছে। কয়েক বৎসর হইল শ্রীমান ললিতচন্দ্র মিত্র 'সাহিত্যে' উহা সবিস্তারে লিখিয়াছেন বটে তথাপি আমার যতটুকু স্মরণ আছে, আমিও লিখিলাম। *বঙ্গদর্শন*-এ মধ্যে মধ্যে দুই এক পাতা matter কম পড়িলে পণ্ডিতমশায় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ওই দিনেই লিখিয়া দিতেন। ওই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একটি *লোকরহস্যে* প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। 'বন্দে মাতরম্' গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় একপাতা matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা আজই পাবে।" একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল বোধ হয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে 'বন্দে মাতরম্' গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, 'বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে,—উহা মন্দ নয় ত—ওটাই দিন না কেন।' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'ওটা ভাল কী মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।' এই গীতিটির সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত। একজন গায়ক প্রথমে উহা গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায় কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়াছিলেন ; পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী আর একটি সুর বসাইয়াছিলেন। বেহাগ সুরে ভালো লাগিলে লাগিতে পারে।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

'বৎসরে কী কালের মাপ ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।' আজ 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাই আমার মনে পড়িতেছে। বৎসরের হিসাবে সে ত সেদিনের কথা—এখনও দশ বৎসর হয় নাই—কাল-সমুদ্রের একটি তরঙ্গও উঠিয়া মিলায় নাই। কিন্তু তাহার পর যেন 'লাখ লাখ যুগ' চলিয়া গিয়াছে। যেদিন বাঙলার ঘাটে, বাটে, তটে, মাঠে 'বন্দে মাতরম্' গীত শুনা যাইত। পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্বে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি গীতে বাঙালি, কেবল বাঙালি নহে, সমগ্র ভারতের অধিবাসীরা, মা'র স্বরূপ দেখিয়াছিল। সেই, অবজ্ঞাত না হউক, অল্পপরিচিত গান পবন-সহায় দাবানলের মত দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেদিন আর আজ—ইহার মধ্যে কত যুগ বহিয়া গিয়াছে ! সেদিন জড়ত্বশাপমুক্ত বাঙালির জাতীয় জীবনে যে উৎসাহ, যে উদ্যম, যে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস , যে জাতীয়-জীবন গঠন চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সেসব কী কেবল বিদ্যুতেরই মতো বাঙালির অদৃষ্টাকাশে দেখা দিয়া অন্ধকার ঘনীভূত করিয়া গিয়াছে? সে ভাব কী উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণতি লাভ করিয়া উৎপীড়নে নিঃশেষ হইয়াছে? আজ আমার সেইদিনের কথাই মনে পড়িতেছে। তখন সমগ্র বঙ্গ 'বন্দেমাতরম' গানে মুখরিত। 'বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ে'র উদাত্তসুর হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণবের কীর্তনের সুর পর্যন্ত কত সুরে কত জন এই গান গাহিতেছে ! তখন ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া স্বধর্মত্যাগী কর্মযোগী ব্রহ্মবান্ধব স্বজাতিকে সরল ভাবে তাঁহার জাতীয় ধর্মের ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন—'সন্ধ্যা' তাঁহার প্রচারবেদী ; আর বিদেশি শিক্ষার মুকুটময়ূখে স্বদেশি ভাবের স্বরূপ নির্ণীত করিয়া ধ্যানযোগী অরবিন্দ ইংরেজি-শিক্ষিত স্বদেশবাসীকে সে ভাব বুঝাইতেছেন—'বন্দে মাতরম্' তাঁহার বক্তৃতামণ্ডপ। ব্রহ্মবান্ধব বঙ্কিম-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে 'বন্দে মাতরম্' পাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার কথা হইল। স্থির হইল, একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা বিবৃত হইবে—সে প্রবন্ধ আমি লিখিব ; আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন—অরবিন্দ। ইহার কিছুদিন পূর্বে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোনো সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের ঋষি বলিয়াছিলেন। সে কথা আমি অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম। অরবিন্দ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার নাম—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। সংবাদপত্রে অনেক সময় সংরক্ষণযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সংবাদপত্র প্রায় কেহ রাখে না—রাখিতে পারে না। আবার

'বন্দে মাতরম্' যাঁহারা রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেকে সকারণ বা অকারণ ভয় হেতু তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই আজ এতদিন পরে আবার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বুঝাইতে লেখনী ধরিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি। তাঁহার ঋষিত্ব কীসে?

অনেকে এই প্রাচীন জাতির প্রনষ্ট গৌরবের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলেন, বর্তমানকালে এই অধঃপতিত জাতির মধ্যে আর অমানুষ শক্তিশালী চিন্তার ও সভ্যতার নিয়ন্তা, ঋষির আবির্ভাব সম্ভব নহে। তাঁহাদের এই বিশ্বাস ভ্রান্ত—এ আক্ষেপ ভিত্তিহীন। যে দেশ সনাতন, সে দেশের, সে জাতি সনাতন সে জাতির, আর যে ধর্ম সনাতন সে ধর্মের শক্তি, জ্যোতিঃ ও পুতপ্রভাব কিছুকালের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইতে পারে, কিন্তু চিরতরে অন্তর্হিত, অস্তমিত, অদৃশ্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষ বহু বীরের, বহু ঋষির ও বহু সাধু পুরুষের আবির্ভাবে পবিত্র হইয়াছে; ভারতবর্ষ তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র—লীলাভূমি। এই দেশেই তাঁহাদের আবির্ভাব স্বাভাবিক, যুগে যুগে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন। বর্তমান যুগে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিত্বে কে সন্দেহ করিতে পারে?

ঋষিতে ও সাধুতে প্রভেদ স্বপ্রকাশ। ঋষির জীবনে অসাধারণ পূতাচার বা চরিত্রে অদর্শ-সৌন্দর্য্য না-ও লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহার গৌরব তাঁহার জীবনে নহে; পরন্তু তিনি যে ভাবে অভিব্যক্ত করেন তাহার সেই অভিব্যক্তিতে। কোনো জাতিকে বা সমগ্র মানবসমাজকে যে কথা জানাইতে হয়—ভগবান তাহা ঋষিমুখে ব্যক্ত করান। মানবকে যদি কোনো অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখাইতে হয়, তবে ঈশ্বরানুগৃহীত ঋষির নয়নে সে দৃশ্য প্রতিভাত হয়। তিনি তাহা দেখিয়া জগতে সে সংবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার কথার অবিশ্বাসী বিশ্বাস না করিয়া পারে না, সংশয়ান্দোলিত হৃদয় স্থির হয়, সন্দেহের অন্ধকার দূর হয়। তাই জগতে অঘটন সংঘটিত হয়। যে কথা ব্যক্ত করাই তাঁহার বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য, সেই কথাই তাঁহার মন্ত্র,—তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি।

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সমগ্রদেশে সম্পূজিত কেন? তিনি আমাদিগকে কোন্ মন্ত্র দিয়াছেন—কোনরূপ দেখাইয়াছেন? তিনি কবি, তিনি সাহিত্যিক, কল্পনালোকে কমনীয় মূর্তির রচনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার গৌরব যত অধিকই হউক না কেন, তাহা তাঁহারই ঋষিত্ব-গৌরবের নিকট ম্লান, 'শুষ্ক বদরীর মত তুচ্ছ'। সাহিত্য-সমালোচক শিল্পের মানদণ্ডে মাপিয়া তাঁহার *কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল* প্রভৃতির স্থান, *দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব* প্রভৃতির স্থান অপেক্ষা উচ্চে নির্দিষ্ট করিবেন। কিন্তু *কপালকুণ্ডলা*-দির বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক ও কবি, আর *দেবীচৌধুরাণী* প্রভৃতির বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি ও জাতিসংগঠক। কবিকীর্ত্তি—ঋষিকীর্ত্তি কল্পান্তস্থায়িনী।

কবি ও সাহিত্যিকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতেও জাতীয় কল্যাণ সংসাধিত হইআছিল। সত্য বটে তাঁহার সাহিত্যিক কার্য্যের ফল মুখ্যভাবে বাঙালিই সম্ভোগ করিয়াছিল ; কিন্তু গৌণভাবে জগতের অন্যান্য প্রদেশেও তাহাতে বঞ্চিত হয় না। কারণ, জাতীয় জীবন গঠনে বাংলাই ভারতের পথপ্রদর্শক। কোনো জাতি যখন তাহার স্বতন্ত্র জাতীয় স্বত্বা অনুভব করে, তখন তাহার হৃদয় সে নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন কল্পনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সে সকলের প্রকাশোপযোগী ভাষা না পাইলে সে জাতির উন্নতির গতি প্রহত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে সেইরূপ ভাষা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম দানের মূল্য সামান্য নহে। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের ভাষা রক্ষণশীল, গতিহীন বাংলার ভাবপ্রকাশেরই উপযোগী ছিল। পরিবর্তিত ও উন্নতির পথারূঢ় জাতির ভাবপ্রকাশের জন্য পরিবর্তিত উন্নততর ভাষার প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে তাহার অভাব অনুভব করিতে দেন নাই ; প্রয়োজনের পূর্বে তিনি বাঙালিকে সে ভাষা যোগাইয়াছেন। তিনি পণ্ডিতদিগের ব্যবহৃত ভাষার সহিত জনসাধারণের চলিত ভাষা মিশ্রিত করিয়াছেন বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতদিগের ব্যবহৃত বিস্তারবিহীন নিয়ম-নিগড়বদ্ধ ভাষায় নূতন বাংলার বিচিত্র, সুন্দর, সরস ও সতেজ ভাব বিকশিত হইতে পারিত না। আধুনিক বাঙালির ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষার প্রয়োজন হইয়াছিল, সে ভাষার সংগতের শক্তি, গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সহজবোধ্য সাধারণ ভাষার তেজ ও বৈচিত্র্য মিশ্রিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই অভাব পূর্বেই বুঝিয়া বাঙালিকে তাহার নবভাব প্রকাশোপযোগী ভাষা দিয়াছিলেন। আজ যে বাংলা ভাষা হর্ষে উদ্বেলিত, উৎসাহে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, ক্রোধে বিকম্পিত, ঘৃণায় সঙ্কুচিত, করুণায় বিগলিত হয়, সে বঙ্গভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সর্বাগ্রে দেশের সাহিত্যিক অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তেমনই সর্বাগ্রে দেশের রাজনীতিক অভাবও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন দেশে রাজনীতিক আন্দোলন যে প্রণালীতে পরিচালিত হইত তাহার অনুপযোগিতা এদেশের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। *লোকরহস্যে* ও *কমলাকান্তের দপ্তর*-এ তিনি বিদ্রূপের কশাঘাতে লোককে ইহা বুঝাইয়াছিলেন। বিদ্রূপ প্রতিভাবান লোকদিগের অস্ত্র হইলে প্রতিপক্ষ পরাজয়ে বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব সংহারে নহে—সৃষ্টিতে, বিসর্জনে নহে—প্রতিষ্ঠায়। সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন অযোগ্যকে নির্দয়ভাবে উন্মুলিত করিয়া যোগ্যকে সাদরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রেও তেমনই অযোগ্যকে বিদ্রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া যোগ্যকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রেম স্বার্থসংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না ; ত্যাগে তাহার প্রতিষ্ঠা—সাধনায় তাহার বিকাশ। তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে ভয়-ভীত

শ্ববৃত্তি, ত্যাগ করিয়া গাম্ভীর্য-গৌরবান্বিত সিংহবৃত্তি অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার মার হস্তে ভণ্ডের ভিক্ষাভাণ্ডও নাই, আর বিদ্রোহীর আত্মবিস্মৃত তরিবারি নাই। তিনি *আনন্দমঠ*-এ ও *দেবীচৌধুরাণী*তে বুঝাইয়াছেন শারীরিক বলের সাধনা করিতে হইবে ; কিন্তু নৈতিক বল—সংযম ব্যতীত শারীরিক বল স্থায়ীকার্য করিতে পারে না। *সীতারাম*-এ তিনি দেখাইয়াছেন, অনাচারের স্পর্শে শারীরিক বলের দুর্গচূড়া বজ্রাহত গিরিশিখরের মতো ধূলিবিলুণ্ঠিত হয় ; উচ্ছৃঙ্খলতা সাধনার অন্তরায়, সিদ্ধির বৈরী। তিনি বুঝাইয়াছেন, নৈতিক শক্তিসাধনার প্রথম সোপান ত্যাগ, কর্মে আত্মসমর্পণ। তাই তাঁহার "সন্তানগণ" সন্ন্যাসী, মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগ্নী-দারা-সুত সর্বত্যাগী। তাহারা সংসারত্যাগী ও ইন্দ্রিয়জয়ী। তাহাদের ব্রতভঙ্গের, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত, 'জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ।' যে ধনজন, দ্বারা-সুত, এইসকলকে ভালোবাসে, যে আপনাকে ভালোবাসে, তাহার স্বদেশভক্তি অসম্পূর্ণ। এই সাধনায় "*জীবন তুচ্ছ*" ; সাধককে দিতে *হইবে—'ভক্তি*।' তাঁহার 'সন্তানগন' দুর্দান্ত দস্যু নহে; নিষ্ঠুর নরহন্তা নহে; তাঁহারা সন্ন্যাসী ও সাধক। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, নৈতিক শক্তিসাধনার দ্বিতীয় সোপান সংযম ও পদ্ধতিবদ্ধতা। দেবীর কঠোর শিক্ষায়, সন্তানগণের পুরুষ প্রতিজ্ঞায় এবং *দেবীচৌধুরাণী* ও *আনন্দমঠ* পুস্তকদ্বয়ে বর্ণিত পদ্ধতিবদ্ধ কার্যে তিনি ইহাই বুঝাইয়াছেন। নৈতিক শক্তি সাধনার তৃতীয় সোপান স্বদেশপ্রেমে, ধর্মভাবে সমাজ-সংস্কার। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে স্বদেশপ্রেমধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। *দেবীচৌধুরাণী*তে ইহার আভাস—*আনন্দমঠ*-এ ইহার বিকাশ। *ধর্মতত্ত্বে* কর্মযোগের বিচিত্র ভাব বিবৃত। *কৃষ্ণচরিত্র*-এ মূর্ত কর্মযোগের চিত্র চিত্রিত। স্বদেশপ্রেমে এই কর্ম্মযোগের পূর্ণ বিকাশ। 'বন্দেমাতরম্' গীতে এই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নব্য-ভারতের রাজনীতিক গুরু। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য তাঁহার স্বদেশবাসীকে 'নবীন-কিরণে জ্যোতির্ময়ী' মাতৃমূর্তি প্রদর্শন। স্বদেশপ্রেম যত দিন কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য, তত দিন তাহা শক্তিহীন ; যখন হৃদয়ে তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়, তখনই তাহা মানুষকে চালিত করে, তখনই মানুষ তাহার জন্য জগতে আর সব তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখে। যতদিন মাতৃভূমি পর্বত-কিরীটিনী, সাগর সুশোভিতা ভূমিখণ্ড মাত্র, যতদিন দেশবাসী কেবল মনুষ্যমণ্ডলী মাত্র, ততদিন স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। যখন মৃণ্ময়ী মা চিন্ময়ীরূপে দেখা দেন, তখন সেই মাতৃমূর্তির দর্শনপুণ্যে মানবের জাড্য-দ্বিধা-সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থান্ধতা অরুণোদয়ে রজনীর অন্ধকারের মতো দূর হয়। বঙ্কিম বাঙালিকে ও ভারতবাসীকে সেই মাতৃমূর্তি দেখাইয়াছিলেন। তাই যেদিন বাঙালি জাগিল, সেদিন একজনের মুখে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারিত হইতে না হইতে সমগ্র ভারতবর্ষ সেই মন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই মন্ত্রে ভারতবাসীর ভাব প্রকাশর ভাষা পাইল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই জাগরণের বহু পূর্বে মাতৃমূর্তি দেখিয়াছিলেন। 'কমলাকান্ত' রূপে তিনি মার এই মূর্তি দেখিয়াছেন। 'এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা' দেখিয়া, কাঁদিয়া বাঙালিকে বলিয়াছিলেন :

> এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কাল-স্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে এই প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কী? ওই যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—এই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কী? না হয় ডুবিব ; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কী?

সেই মূর্তিই 'সন্তানগণে'র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'দশভূজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত. দিগ্‌ভুজা—নানা-প্রহরণধারিণী, শত্রু-বিমর্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী ; দক্ষিণে লক্ষ্মী, ভাগ্যরূপিণী ; বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী ; সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয় ; কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।'

এই মূর্তি দেখিয়াই তিনি যুক্ত করে ঊর্ধ্বমুখে ডাকিয়াছিলেন :

> সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থকসাধিকে।
> শরণ্যে ত্র্যাম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে।।

আর এই মূর্তি দেখিয়া পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে ভারতবাসী গাহিয়াছে, 'বন্দে মাতরম্।'

এই নবজাগরণ কীরূপে আসিবে তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছিলেন। সনাতন ধর্ম জ্ঞানাত্মক—কর্মাত্মক নহে।

> সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কী, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কী তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই, শিখায় এমন লোক নাই ; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড়ো সুপটু। ইংরাজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম প্রচারে

আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা-আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে। প্রতীচ্য শিক্ষার বহির্বিষয়ক জ্ঞানের তড়িৎসঞ্চারে প্রাচীর জড়ত্ব দূর হইয়াছে। ভগীরথানীত গঙ্গার স্পর্শে যেমন সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল, ইংরেজের আনীত বহির্বিষয়ক জ্ঞানে তেমনই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। দেশ নবজীবনে জাগ্রত হইয়াছিল—নবারুণ কিরণে চক্ষু মেলিয়াছিল। লর্ড মিণ্টোর মতো যাঁহারা ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছিলেন, সমগ্র প্রাচ্য নব্যভাবচূড় জাগরণ-তরঙ্গে প্লাবিত হইতেছে; তাঁহাতে প্রাচীর প্রাচীন সংস্কার বিধৌত হইয়া যাইতেছে। জাপানে, চীনে, ভারতে—সমগ্র প্রাচীতে এই জাগরণের লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে। এ জাগরণ প্রতীচীর সভ্যতার সহিত পরিচয়-প্রসূত, প্রতীচ্য শিক্ষার ফল, বহির্বিষয়ক জ্ঞানলাভের অবশ্যসম্ভাবী পরিণাম।

দেশে এই নবভাবের আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। মা যে মূর্তিতে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন, একদিন যে মার সেই মূর্তি তাঁহার স্বদেশবাসী সকলেই প্রত্যক্ষ করিবে তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। সমগ্র দেশের জাগরণের পূর্বেও কেহ কেহ তিমিরাবৃত প্রাচীর তোরণে অরুণকিরণ বিকাশ-সূচনা লক্ষ্য করিতেন। কাহারও কাহারও শ্রবেণ বিহঙ্গের প্রভাতী সঙ্গীতে দিবসের আহ্বান শ্রুত হইত। মনে আছে, কলিকাতায় শ্রীযুত ওয়াচার সভাপতিত্বে বিডন উদ্যানে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গীত এই 'বন্দেমাতরম্' গান শুনিয়া একজন মদ্রদেশাগত প্রতিনিধির নয়ন হইতে অশ্রু করিতে দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্ত্ররচনাকালেই দেশের জাগরণের অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই গান উপন্যাসখানির পূর্বে রচিত হয়। তিনি যখন এই গান রচনা করিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করিতেছিলেন তখন *বঙ্গদর্শন*-এর কার্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে গান রচনা না করিয়া উপন্যাস রচনা করিতে বলেন—গানে *বঙ্গদর্শন*-এর ক্ষুধা মিটিবে না। শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—যদি পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়া থাক তবে তখন এ গানের মর্ম বুঝিবে। পঞ্চবিংশ বর্ষের ব্যবধানে কার্যাধ্যক্ষ মহাশয় ভারতের নব-জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, সেই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে ভারতবর্ষ মুখরিত। সুদুর মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধি-তোরণে বাঙালী কবি, বাঙালি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মন্ত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে, 'বন্দেমাতরম্।'

বন্দে মাতরম্

বিপিনচন্দ্র পাল

'বন্দে মাতরম্' গান নহে, মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রের একজন ঋষি ও এক বা ততোধিক দেবতা থাকেন। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি সন্তান সম্প্রদায় প্রবর্তক মহাপুরুষ, পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্র, দেবতা জন্মভূমি। মন্ত্র অনেক সময়েই স্বল্পবর্ণাত্মক হয়। বিশেষ করে যে মন্ত্র সাধনা করিতে হয়, সে মন্ত্র সাধকের জপমন্ত্র হইবে, সাধক যাহা নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, শয়নে স্বপনে জপিবেন,—জপিতে জপিতে তন্ময় হইয়া, আপনাকে সেই মন্ত্রের অগাধ রসে একেবারে ডুবাইয়া রাখিবেন, এমন স্নিগ্ধ মন্ত্র প্রায়ই অতি সংক্ষিপ্ত, অতি গল্প পরিসর হওয়া আবশ্যক। 'বন্দে মাতরম্' এই শব্দ দুইটিই এজন্য প্রকৃত মন্ত্র। 'বন্দে মাতরম্'—মন্ত্র, কারণ এই মন্ত্র ভক্তিভরে জপ করিলে, মায়ের স্বরূপ চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই মন্ত্র জপিতে জপিতে যে মাতৃরূপ সাধকের মানসচক্ষে মন্ত্রশক্তি প্রভাবে, গুরুকৃপায়, আপনি স্ফুরিত হইয়াছিল,—বঙ্কিমচন্দ্র এই সঞ্জীবনী সঙ্গীতে তারই বর্ণনা করিয়াছেন। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত মায়ের সাধক মন্ত্র নহে, মায়ের স্তব। 'বন্দে মাতরম্' মায়ের সাধন মন্ত্র, সুজলাং সুফলাং ইত্যাদি মায়ের স্তব।...'বন্দে মাতরম্' জপিতে জপিতে জপিতে, সাধকের চক্ষে 'মা' প্রকট হইলেন, তখনই তাঁহার বন্দনা আরম্ভ হইল। তখনই সাধক মায়ের অরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া, ভক্তিগদগদ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।'

'বন্দে মাতরম্'—মন্ত্র। ইহার প্রকৃত অর্থ, রূঢ়। যৌগিক নহে। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ মা। এই মন্ত্র জপিতে জপিতে মায়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বরূপ অদ্বৈত বস্তু। ...দেবতাকে বিগ্রহ হইতে পৃথক করা যায় না, দেবতা শূন্য বিগ্রহ নহে, পুত্তলিকা। সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্যশ্যামলা এই যে বসুন্ধরা দেখিতেছ, এই যে শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী, ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী প্রকৃতিকে দেখিতেছ—এ মায়ের বিগ্রহ। মাকে পৃথক করিয়া দাও, ইহার বিগ্রহত্ব অমনি লুপ্ত হইবে, ইহা প্রাকৃত জল, প্রাকৃত ফল, প্রাকৃত শস্য, প্রাকৃত বায়ু, প্রাকৃত জ্যোৎস্না, প্রাকৃত বৃক্ষরাজিতে পরিণত হইবে। দেবতার অন্তর্ধানে বিগ্রহ যেমন পুত্তলিকা হয়, মাকে পৃথক করিলে এ সকল যেমনি পঞ্চভূতাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চে পরিণত হইবে। ইহার প্রাণতা, ইহার শক্তি, ইহার উদ্দীপনা, ইহার পবিত্রতা কিছুই আর থাকিবে না। তখন গঙ্গায় ও গোষ্পদে কোনও প্রভেদ থাকিবে না।—মানসপটে এই অপূর্ব চিত্র সম্যক ফুটিয়া উঠিলে, ভক্ত তখন চক্ষু খুলিয়া, এই বাহিরের

জল স্থলে, বন উপবনে, এই শস্যভরা মাঠে, এই গ্রাম্য বধূগণের বলয়কিঙ্কিনী মুখরিত ঘাটে, এই লোক কোলাহলপূর্ণ হাটে—এই সকলের ভিতরে অন্তরস্থ মায়ের অপূর্ব রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারই বন্দনা করেন—কিন্তু মায়ের যে রূপের বর্ণনা 'বন্দে মাতরমে' দেখিতে পাই, তাহা তো এরূপ মিথ্যা নহে। এ রূপ তে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে, আকাশ কুসুমবৎ রচিত হয় নাই। মায়ের এই ধ্যানে যে রূপের বর্ণনা আছে, তাহা মায়ের স্বরূপ, মায়েতে অধ্যাসিত বা কল্পিত রূপ নহে। (১৩১৬)

স্বদেশবাদ ও 'বন্দে মাতরম্'

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনছি। স্বদেশি আন্দোলনের সময় দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির এতটা প্রভাব ছিল না। আজকাল সেই সংবাদপত্রগুলির প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। আজ দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি সুস্পষ্ট ভাষায়ই অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাদের যে ঝোঁক আছে তা প্রকাশ করছে। কিন্তু যা সত্য ঘটনা, তা অস্বীকার করা যায় না। তা হচ্ছে এই যে, স্বদেশবাদ আমাদের বাসভূমিতেও গার্হস্থ্য জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় যে, নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন তার কাছে দাঁড়াতেই পারে না। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন, এমন কী তার সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী কেন্দ্রগুলিতেও (বাংলায় অবশ্য সে কেন্দ্রের সংখ্যা বেশি নেই) একটা সামাজিক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলন তার কার্যকালে যে শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করেছিল তা একটা সমাজ শক্তি হয়ে উঠেছিল। এই বাংলাদেশেই অসংখ্য গ্রাম আছে যেখানে চরকা ও খদ্দর লোকের কাছে অপরিচিত থেকে গেছে। আমি অবশ্য এমনটি না হওয়াই কামনা করি। কিন্তু সত্য যা তা বলতেই হবে। কোনো শিল্প-আন্দোলন যদি কোনো বিরোধমূলক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলে তবে তা সাময়িকভাবে একটা হুজুক প্রেরণা লাভ করতে পারে এবং তার ফলে সে আন্দোলন অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে ; কিন্তু পরিণামে এই রাজনীতির সঙ্গে একত্রে চলার ফলে তাকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। শিল্পকে পরিচালিত করতে হবে ব্যবসায়িক পন্থায়। এই ব্যবসাবুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত এই শিল্পের গতিপথ ও উন্নতির ধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করবে। পুঁজি, সংগঠন ও বিশেষজ্ঞের জ্ঞান—এই তিনটিই হচ্ছে শিল্পোদ্যোগের মূল ভিত্তি। স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা এ কাজে নিশ্চিতভাবেই সহায়তা করবে। কিন্তু তা করবে সাময়িকভাবে। কারণ সে প্রেরণা দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে আর থাকবে না।

সময় সময় একথা বলা হয়ে থাকে যে আমাদের গণ-আন্দোলনগুলি প্রাণহীন। এই প্রাণহীনতার কারণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে আমরা সব সময় জনসাধারণকে আমাদের সঙ্গে নিচ্ছি না। এই প্রশ্নটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সময় বা স্থান এটা নয়। জনসাধারণ তাদের বিশেষ কোনো স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয় এমন কোনো আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে না। সমস্ত বড়ো বড়ো আন্দোলনই বুদ্ধিজীবী নেতাদের

দ্বারাই সৃষ্ট হয় ; তারাই তা পরিচালনা করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন। জনসাধারণ যা করে, তা হল কম-বেশি পরিমাণে সেই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও নৈতিক সমর্থন। কোনো কোনো বড়ো বড়ো ঘটনার সময় তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে যখন তাদের অন্তরে কোনো গভীর অনুভূতির আলোবন সৃষ্টি হয়। যখন তাদের প্রতি অতীতের কোনো অন্যায় অত্যাচারের স্মৃতি কিংবা বর্তমানের কোনো অত্যাচারবোধ জেগে ওঠে। এই অবস্থায় তারা বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেমে পড়ে যা সময় সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। 'স্বদেশী' আন্দোলন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের প্রতি সার্থক আবেদন করেছিল। তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণের এরূপ বিচার বোধ ছিল যে তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই আন্দোলন যদি সফল হয় তাহলে তা তাদের বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা লাভের এক নব যুগের আবির্ভাব ঘোষণা করবে।

পঞ্চাশ বছর আগে আমি যখন দেশের কাজে নেমেছিলাম তখন আমার তিনটি লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্য আমাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎসাহিত করে রেখেছে এবং আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের নানা বৈচিত্রের মধ্যে সে লক্ষ্য অনুযায়ী আমার সাধ্যমত কাজ করার প্রয়াস পেয়েছি। আমার লক্ষ্যগুলি ছিল এই :

১. আমাদের একটি সার্বজনীন সাধারণ স্বার্থের উন্নয়ন বিধানের জন্য ভারতের সর্বশ্রেণির মানুষকে একটিমাত্র মঞ্চে এনে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা।
২. তাদের উন্নতি বিধানের জন্য প্রথম অপরিহার্য সর্ত হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করা
৩. সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধন করে তাদের আমাদের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা।

এর মধ্যে প্রথম দুটি লক্ষ্য সাধনের জন্য আমি ১৮৭৬ এবং ১৮৭৭ সালে সারা ভারতে ভ্রমণ করেছি। অসংখ্য জনসভায় ভারতীয়দের মধ্যে একতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা করেছি এবং আমাদের জাতির একটি বড়ো বকমের অভিযোগের প্রতিকার আদায়ের জন্য সার্বজনীন দাবি উত্থাপন করে সারা ভারতে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছি। স্বদেশি আন্দোলন আমার জীবনের এই তিনটি লক্ষ্যের মধ্যে একটি লক্ষ্যে পৌঁছোবার এক মহান সুযোগ এনে দিয়েছিল এবং আমি সেই আন্দোলনকে সানন্দে তৎপরতা ও উৎসাহের সহিত আঁকড়ে ধরলাম।

দেশের সর্বত্র স্বদেশী সভার আয়োজন করা হল। আমাদের প্রদেশের সীমা ছাড়িয়েও অনেক জায়গায় সেই সভার অনুষ্ঠান হতে লাগল। আমার স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থ্য নিয়ে যতগুলি স্থানে সম্ভব আমি উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেছি। এই সমস্ত বক্তৃতা প্রায়ই বাংলা ভাষায় করেছি। এই সময়টা ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং কাজও করতে হত

দুর্দান্ত পরিশ্রম করে। কাজ করতে কেউই পিছপা হননি। সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত কাজ করেছেন। আমরা অনেক অজানা এবং অদ্ভুত জায়গায় ঘুরেছি। কোনো কোনো স্থানে যাওয়াও ছিল একটা কঠিন কাজ। অদ্ভুত অদ্ভুত খাওয়াও আমরা খেয়েছি। কিন্তু তাতে আমরা কেউ কিছুই মনে করিনি। কোনোকিছু সম্পর্কেই আমরা কোনো আপত্তি বা অভিযোগ করিনি। দূর দূর অঞ্চলে আমাদের যেতে আসতে নিদারুণ কষ্ট ও অসুবিধা হয়েছে. ম্যালেরিয়া ও কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও আমরা ঘুরেছি। আমাদের উৎসাহই ছিল আমাদেব রক্ষাকবচ। কোনো রোগেই আমরা আক্রান্ত হব না কোনো বিপদই আমাদের স্পর্শ করবে না—কাজের উৎসাহের মধ্যে এই বিশ্বাসই আমাদের নৈতিক টীকা নেওয়ার মত কাজ করেছে। সে টীকা কখনও বিফল হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একজন সাথীর কথা উল্লেখ না করে পারছি না এবং বলতে কী তা এক্ষুণি করছি ; কারণ তাকে আমরা চিরদিনের মত হারিয়েছি। আমি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কথা বলছি। তিনি ছিলেন *হিতবাদী* পত্রিকার সম্পাদক। এক মারাত্মক ব্যাধিতে তিনি ভুগছিলেন, যে ব্যাধির নাম ব্রাইটস্ ডিজিজ। তা সত্ত্বেও আমন্ত্রণ পেলেই তিনি যে-কোনও স্বদেশী সভায় উপস্থিত থাকতেন। তিনি সভাগুলিতে একটি নতুন রীতির প্রচলন করেন। সেই রীতিটি আজও আমাদের সভা-সমিতি ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। রীতিটি হচ্ছে এই সমস্ত অনুষ্ঠান একটি সময়োপযোগী দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের দ্বারা শুরু করা। কাব্য বিশারদের অতি সুন্দর সঙ্গীত প্রতিভা ছিল। নিজে তিনি গান করতে পারতেন না, কিন্তু তিনি অতি চমৎকার সঙ্গীত রচনা করতেন। এই সঙ্গীতগুলি স্বদেশি সভায় গাওয়া হত। শ্রোতাদের হৃদয়ে তা গভীরভাবে রেখাপাত করতে কখনোই ব্যর্থ হয়নি। সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা ছিল তার একটি প্রকৃতি দত্ত স্বাভাবিক গুণ। হিন্দী ভাষায় তার সে রকম খুব পাকা দখল না থাকা সত্ত্বেও তার রচিত 'দেশকি ইয়ে ক্যা হালত' হিন্দি সঙ্গীতটি ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত। দেশি জিনিস ফেলে বিদেশি জিনিস গ্রহণের প্রতি যে মোহ আছে, তাকে প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করা হয়েছে এই সঙ্গীতে। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে হাজার হাজার লোকের সমক্ষে যখন এই গানটি গাওয়া হয় তখন সেই বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকে তা এক প্রবল অশান্ত উত্তেজনার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

কাব্য বিশারদের সঙ্গে সর্বদাই দুজন ওস্তাদ সঙ্গীত শিল্পী থাকতেন। তারা স্বদেশি সভাগুলিতে উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত গান করে শুনাতেন। কাব্য বিশারদ নিজেই তাদের শিক্ষা দিতেন ও বেতন দিয়ে ভরণপোষণ করতেন। নিজে ধনী ব্যক্তি না হলেও বাইরের কারো কাছে তিনি তাদের ভরণপোষণের জন্য কোনও সাহায্য চাইতেন না। একজন বড়ো ধরনের বক্তা তিনি ছিলেন না ; কিন্তু একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখে ভারতের প্রগতি বিরোধী শক্তিগুলির উপর তীব্র ও নির্মমভাবে আক্রমণ চালাতেন। স্বদেশের কাজে আত্মনিবেদিত-প্রাণ কাব্য বিশারদ দেশ-মাতার সেবার কাজে

কখনোই কুণ্ঠিত ছিলেন না। মনে আছে, ১৮৯৯ সালে গায়ে জ্বর নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। সে সময় তার ওপর একটি মানহানির মামলার পরোয়ানাও ঝুলছিল। নিজের স্বাস্থ্য বা শরীর সম্পর্কে তার কোনো রকম ভ্রূক্ষেপই ছিল না। নিজের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়েই চলতেন ; এমনকি সে ব্যাপারে তার ছিল একটা একগুয়েমী ভাব। কারো উপদেশ বা বাদপ্রতিবাদের ওপরে ছিল তার নিজের ইচ্ছা। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি দ্রুত মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবগণ ভাবলেন যে তার স্বাস্থ্যের যদি উন্নতি সাধন করতে হয়, যদি তাকে তার এই স্বদেশ প্রেমোন্মাদনার পরিণতি থেকে বাঁচতে হয়, তাহলে তাকে তার স্বদেশ প্রেমের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরাতে হবে। একজন বন্ধু ডাক্তার হিসাবে এক যাত্রীবাহী জাহাজে জাপান যাচ্ছিলেন ; তার আত্মীয় স্বজনেরা কাব্য বিশারদকে তার সঙ্গে জাপানে যেতে বলেন। তারা মনে করেছিলেন যে সমুদ্র যাত্রা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর হবে। যে-কোনো কারণেই হোক এই প্রস্তাবটি আমার কাছে কখনোই ভালো মনে হয়নি। এর মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবী অমঙ্গলের পূর্বাভাস আমার মনে বারে বারে উঁকি দিচ্ছিল। এটা হয়ত বা এজন্যও হতে পারে যে আমার মনের গভীরে দেশের কাজের চিন্তা বড়ো হয়ে দেখা দেওয়ায় আমার বিচারবুদ্ধির উপরে রঙিন ছোপ লেগে গিয়েছিল। সে যাই হোক, আমি কাব্য-বিশারদকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। তিনি আমাকে তার রাজনৈতিক গুরু বলতেন। এরকম আরো অনেকে আমাকে তাদের রাজনৈতিক গুরু বলে মনে করতেন। তবে কাব্য বিশারদের মত এতখানি উদ্দীপনা ও শ্রদ্ধা আর কারো মধ্যে ছিল না। তারা অনেকে তাদের গুরুর প্রতি কাদা ছুঁড়ে মারতেও প্রস্তুত ছিল। কাব্য বিশারদ এক সময় জাপান যাবেন না বলে মনস্থির করে ফেললেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপের কাছে নতি স্বীকার করে যেতে রাজি হলেন। হাওড়া স্টেশনের কাছে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমরা তখন কলকাতা থেকে অল্প কিছু দূরে বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইনের পথে মুগকল্যাণে একটি স্বদেশি সভা করে ফিরে আসছিলাম। তিনি আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন ; আমি আশীর্বাদ জানালাম ! কিন্তু হায়! আর আমাদের ভাগ্যে পুনর্মিলন ঘটল না। ফেরার পথে সমুদ্রে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এইভাবে বাংলা তার এমন একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক সাংবাদিককে হারাল যিনি আমাদের ভাষা সম্পদকে তার শক্তিশালী লেখনী মুখে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন যাতে তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুদের এবং জাতির শত্রুদের নিকট তিনি একটা আতঙ্ক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাবাদের উর্ধ্বে ছিলেন না। এই ব্যক্তিগত আক্রমণটা ছিল আমাদের দেশীয় ভাষায় এক ধরনের সাংবাদিকতার এক মারাত্মক বিষের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আজও পর্যন্ত তা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। তার কোনো কোনো রচনায় গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতাকে লঘু ও বিদ্রূপ করা হয়েছে; সেগুলি আমাদের সকলের কাছে অবশ্যই নিন্দনীয় ও পরিতাপের বিষয়। কিন্তু তার

কঠোরতম ব্যক্তিগত আক্রমণগুলি হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা ভারতের উন্নতির পথে শত্রুতা করছে এবং তাও আবার অনেক সময় করা হয়েছে ছদ্মবেশী বন্ধুরূপে, হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো। কলকাতায় তাঁর মৃত্যু সংবাদটি পাওয়া যায় ১৯০৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে। এই পনেরো দিন পরে বারাসতে ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন হল। তাঁর রচিত স্বদেশি সঙ্গীত দিয়ে যখন সেই সম্মেলন শুরু হল, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি চোখের জলে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করেছেন। দোষ-ত্রুটি তাঁর অনেক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে দেশসেবা করে গেছেন। দেশসেবার মধ্যে যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন, কোনও সময়েই তার একটুও নড়চড় হয়নি।

তবে একজন মহান 'স্বদেশি' কর্মী চলে গেলেও 'স্বদেশি'র কাজকর্ম ব্যাহত হয়নি। সমস্ত বড়ো বড়ো আন্দোলনই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রতিভার কাছে যতই ঋণী হউক না কেন, কোনো কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি-পুরুষের উপরও তা খুব বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল নয়। তারা যে বীজ বপন করেন, সে বীজ নতুন মানুষ সৃষ্টির জন্যে ফল ধারণ করে, সেই নতুন মানুষেরা হয়ত সর্বদা বীজ বপনকারীদের সমকক্ষ না হতে পারেন; তারা তাদের কাজের ভার গ্রহণ করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কাব্য বিশারদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে যে যুগের স্বদেশিভাব যে প্রবল ও ব্যাপক উত্তাপের সৃষ্টি করেছিল তারই এক প্রতিফলন ঘটেছিল।

জনমতের এই উত্তাল জাগরণে সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ালেন, তারা দমন নীতির প্রয়োগ করতে লেগে গেলেন। ফলে জনমত আরো বেশি করে জেগে উঠতে থাকে। ট্যকিটাসের বিবরণে জানা যায় যে এগ্রিকোলা এই রকম একটি সূক্ষ্ম মন্তব্য করেছিলেন যে একটি সাম্রাজ্যকে শাসনে রাখার চেয়ে একটি গৃহ-পরিবারকে শাসনে রাখা বেশি কঠিন কাজ। কোনো পরিবারে বিপর্যয় দেখা দিলে তা কালেরও শুভবুদ্ধির নিরাময়কারী প্রভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ উপদেশের সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সাধারণতঃ কাল অতিক্রমণ ও শুভবুদ্ধি এসব ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। কিন্তু আমলাতন্ত্রের ধরনই আলাদা। তাদের আছে অসীম ক্ষমতা ; সে ক্ষমতায় তারা বলীয়ান। কোনো অভাবিত-পূর্ব ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে তারা তাদের সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সহজ পন্থায় সেই ঘটনার মোকাবিলা করতে প্রলুব্ধ হয়। দমন-নীতির প্রয়োগ অতি সহজ ব্যাপার এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ নেই। এজন্য যে অত্যধিক মূল্য দিতে হয় এবং পরিণামে যে তা নৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে খুব তাড়াতাড়ি, কাজ করার উৎসাহে সে কথা তাদের মনেই আসে না। সাময়িকভাবে হয়ত দমন-নীতি সাফল্য লাভ করে; কিন্তু তা স্থায়ীভাবে অনিষ্ট ঘটায় এবং ভবিষ্যতের অশান্তির বীজ বপন করে রাখে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে ছাত্রগণ এবং ছাত্র নয় এমন তরুণেরা স্বদেশি আন্দোলনে এক প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। তাদের উৎসাহ সমস্ত সমাজ জীবনকেই উজ্জীবিত করে

তোলে। তারা এই স্বদেশি আন্দোলনের স্বেচ্ছাব্রতী মিশনারীরূপে আত্মপ্রকাশ করল। কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যাবলীকে খর্ব করা ও শাসনে আনা প্রয়োজন বোধ করলেন। জেলায় জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটরা ফতোয়া জারি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানদের জানিয়ে দিলেন যে যদি স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রদের স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বয়কট ও পিকেটিং এবং অন্যান্য অপকর্ম থেকে প্রতিনিবৃত্ত না করেন তাহলে তাদের স্কুল ও কলেজগুলিকে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে না, স্কলারশিপের জন্য প্রতিযোগিতা করার যে সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া হয়েছে, তা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। মফঃস্বলের স্কুলগুলিকে এই সার্কুলার পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সার্কুলারে কলকাতার ছাত্র ও মফঃস্বলের ছাত্রদের মধ্যে একটা পার্থক্য করা হল। কিন্তু কলকাতার ছাত্ররা তাদের মফঃস্বলের ছাত্র-বন্ধুদের মতোই স্বদেশি আন্দোলনে সমান উৎসাহী। দিনের পর দিন স্বদেশি আন্দোলনের উত্তেজনার সময় বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র ময়দানের কোণে দাঁড়িয়ে দেখত কারা 'হোয়াইটওয়ে লেডেল'-এর বাড়িতে বিদেশি জিনিস কিনতে যাচ্ছে। ভারতীয় ক্রেতাদের তারা অনুরোধ করত বিদেশি দ্রব্য না কিনতে; আর কেউ যদি ইতিমধ্যেই কিছু কিনে ফেলে থাকেন তা হলে আর যেন কখনও এ রকম অন্যায় কাজ না করে। আমার কাছে সে সময়ে এরকম একটা সংবাদ পৌঁছে যে, এই সমস্ত যুবকদের মধ্যে কয়েকজন একজন ফ্যাসান দুরস্ত বাঙালি মহিলা যখন হোয়াইটওয়ে লেডেল'-এর দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, তখন তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে এবং তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে প্রার্থনা জানায় যে তিনি দেশে তৈরি সেইরকম জিনিস থাকতে আর যেন বিদেশি জিনিস না কেনেন।

এই সার্কুলার উত্তেজনাকে আরো বাড়িয়ে তুলল। সবদিক থেকেই এর নিন্দাবাদ হল ' এমনকি যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা সাধারণতঃ সরকারি নীতি ও কার্যাবলীর সমর্থন করে থাকে, তারাও এই সার্কুলারের নিন্দায় এগিয়ে এল। স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা এই সার্কুলারের ওপর মন্তব্য করে এমন ভাষা প্রয়োগ করল যে ভাষা সেই থেকে প্রকৃত কোনো খারাপ কাজের নিন্দা করা ছাড়া স্টেটস্‌ম্যান তার স্তম্ভে বর্জন করে আসছে। স্টেটস্‌ম্যান ঘোষণা করল :

> সত্যি আমাদের নাম জানা প্রয়োজন, এই নপুংসক অফিসারটি কে যার পরামর্শ মতো লেফ্‌ট্যান্যান্ট গভর্ণর এই আদেশে সম্মতি দিয়েছেন। পত্রিকাটি আরো বলে, 'এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এমন কোনো লোক গভর্ণমেন্টকে ভুল পথে চালিত করছে যে, হয় প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ নতুবা গত কয়েক সপ্তাহের অলীক ভীতি প্রদর্শনের মুখে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

এই মন্তব্য করে পত্রিকাটি তার বক্তব্যের উপসংহার টেনে বলল, 'স্পষ্টতঃ গভর্ণমেন্ট এক ছেলেমানুষী নিষ্ফল নীতি গ্রহণ করে ভুল পথে চলেছে। এ নীতির ফল হবে একদল শহিদের সৃষ্টি করা।'

এই হল ছাত্রদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে প্রথম সে সার্কুলার জারি করা হয় তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ একটি প্রধান ইংরেজি সংবাদপত্রের ভাষ্য। কিন্তু ফতোয়ার পর ফতোয়া জারি করা চলতে থাকে প্রত্যেকটি সার্কুলারই চলমান উত্তেজনায় ইন্ধন যোগাতে থাকে, এবং যে অশুভকে দূর করার জন্য স্থির করা হয় সেটা শুভকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

এইসব সার্কুলারের মধ্যে একটি ছিল 'বন্দে মাতরম্' সার্কুলার। এটি জারি করেছিল পূর্ববঙ্গ সরকার। এই সার্কুলার অনুযায়ী প্রকাশ্যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়াকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হল। একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীকে খুঁজে বার করা হল 'বন্দে মারতম্' ধ্বনিটির ব্যাখ্যা করার জন্য। এই কর্মচারীটিকে আমাদের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা হয়। তিনি ব্যাখ্যা করে জোর দিয়ে বললেন যে 'বন্দে মাতরম্' হচ্ছে প্রতিহিংসার জন্য কালীমায়ের নিকট প্রার্থনা। এই ধারণা তিনি কোথায় পেলেন তা খুঁজে বার করা কঠিন ব্যাপার। 'বন্দে মাতরম-এর' প্রথম কয়েকটি পঙ্ক্তি হল একটি সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের মধ্যে আছে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কথা। আর আছে জন্মভূমির রূপের বর্ণনা ও শক্তির বাণী। 'আমি মাতাকে বন্দনা করি যে মাতা সকলেরই জননী, আমার স্বদেশ জননী'—এই হল 'বন্দে মাতরম্' কথাটির সরল ও সহজ অর্থ। কিন্তু সরকারি কর্মচারী মহলে যে ক্রোধ ও উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেয়েছিল তারই মধ্যে এই নির্দোষ, পবিত্র সংক্ষিপ্ত ধ্বনির মধ্যে একটা কদর্থ খুঁজে বার করা হল এবং পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি বন্ধ করার জন্য এক সার্কুলার ঘোষণা করা হল। আমরা এ ব্যাপারে আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। কলকাতা বারের একজন খ্যাতনামা অ্যাডভোকেট মিঃ পুঘের অভিমত আমাদের পক্ষেই গেল ও ওই সার্কুলার যে আইনসম্মত নয়, তা সাব্যস্ত হল।

বরিশাল সম্মেলনে এই ধ্বনিটি একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। সে বিষয় পরে বলবো। ইত্যবসরে সকৃতজ্ঞ চিত্তে একথা বলতে চাই যে,এর পরে এ বিষয়ে সরকারি মহলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে এবং সঙ্গীতটি সম্পর্কে যে জাতীয় ধারণা গড়ে উঠেছে, তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। একবার আমি উত্তরবঙ্গে এক সৈন্য সংগ্রহের সভায় যোগদান করতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখলাম যে এই মহান জাতীয় সঙ্গীতটি গীত হচ্ছে। গান চলার সময় সমস্ত দর্শক ও শ্রোতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ অফিসারগণও দণ্ডায়মান হলেন। রাজকীয় সৈনিকের উর্দি-পরা বেঙ্গলী রেজিমেন্টের সৈন্যগণ যখন বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণে যায় তখন তাদের দেশবাসীগণ তাদের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করে সংবর্ধনা জানায়। তা ছাড়া সৈন্য সংগ্রহ সভায় তাদের মধ্যে যখন

কেউ কিছু বলেছে তখন কেউ কেউ অফিসারদের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে তাদের সমক্ষেই একথা ঘোষণা করেছে যে জার্মানদের পরিখা আক্রমণ করার সময় মুখে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তাদের যেমন আনন্দ ও স্বদেশ গৌরব বোধ দান করবে তেমন আর কিছুতেই করবে না।

একসময় নিষিদ্ধ অবাঞ্ছিত ও দলিত হলেও এই 'বন্দে মাতরম্' এখন সর্বভারতীয় জাতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এখন ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন কোনো গণ-অনুষ্ঠানে স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসবোধ করেন, তখন এই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করেই তাদের চিত্তের হর্ষভাব প্রকাশ করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে আরো একটি লক্ষ্য করবার মতো বিষয় হল এই যে বর্তমানে সরকারি কর্মচারীরা একথা মনে করে না যে 'বন্দে মাতরম্' হচ্ছে রাজদ্রোহীদের শান্তিভঙ্গ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য লোক জড় করার ধ্বনি।

'বন্দে মাতরম্' হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির সুপরিচিত উপন্যাস *আনন্দমঠ*-এর একটি সঙ্গীতের প্রারম্ভিক কয়েকটি কথা। এটি একটি বাংলা গান। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে সঙ্গীতটি এমন সমৃদ্ধ যে সারা ভারতের প্রতি অংশেই শিক্ষিত লোকেরা এটি বুঝতে পারে। এর শব্দ প্রয়াগের সুঠাম ভঙ্গী, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, এর আকুল স্বদেশপ্রেম সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীতের মহিমায় ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বড়ো বড়ো জাতীয় সমাবেশে সভার কাজের প্রারম্ভে এই সঙ্গীতটি গেয়েই সভার কাজের উদ্বোধন হয়ে থাকে। স্বদেশি আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের বিরাট ভূমিকা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির হয়ত সে রকম কোনো পূর্ব ধারণা ছিল না। যে সুনিশ্চিত স্থান সমস্ত জাতীয় সভ্য-সমিতি, বিক্ষোভ শোভাযাত্রায় এই সঙ্গীতটি অর্জন করছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সে সম্পর্কে কোনো চিন্তাও হয়ত ছিল না। দান্তে যখন ইটালীর ঐক্য সঙ্গীত গেয়েছেন, তখন তাঁরও কোনো ধারণা ছিল না যে তাঁর সঙ্গীতকে ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি কোনো ব্যবহারিক কাজে লাগাবেন, অথবা ইটালির লোকদের রাজনৈতিক বিবর্তনে ইহা কোনো ভূমিকা পালন করবে। প্রতিভাশালী লোকেরা তাদের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যান। তার কিছু কিছু উপযুক্ত জমিতে পতিত হয়। মহাকাল তার শক্তি দিয়ে তাকে পালনপোষণ করেন। পরে তা সুপরিপক্ক হয় এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন করে ভবিষ্যৎ মানুষের অবর্ণনীয় মঙ্গলসাধন করে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় জীবন দ্বিতীয় প্রস্তাব : বন্দে মাতরম্ ও আনন্দমঠ

রমাপ্রসাদ চন্দ

বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে হিন্দুর স্বভাবে যে সকল অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন —স্বাধীনতার আকাঙক্ষার অভাব, সমাজে ঐক্যের অভাব, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার (national feeling-এর) অভাব,—এই সকল অভাবের মূল দেশভক্তির অভাব। দেশভক্তি অর্থ—কেবল দেশের মাটির প্রতি ভক্তি নহে, দেশের সকল অধিবাসীর প্রতি অনুরাগ। এই ভক্তি থাকিলেই দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য আসে, জাতি প্রতিষ্ঠা বা দেশগত জাতীয়তা উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেবল হিতবুদ্ধি এই ভক্তি উৎপাদন এবং পোষণ করিতে পারে না, বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের যোগ চাই ; ঈশ্বরভক্তির মতো এই ভক্তিরও সাধন চাই। সাধনের উপায় ধ্যানধারণা। জননী জন্মভূমিকে কী রূপে ধ্যান করিতে হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির জন্য বিধান করিয়া গিয়াছেন, জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে ধ্যান করিতে হইবে আরাধ্যা দেবীরূপে। এই বিধির প্রথম আভাস তিনি দিয়াছেন *কমলাকান্তের দপ্তর*-এর একাদশ সংখ্যায় (১২৮১ সনে = ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের *বঙ্গদর্শন*-এ প্রথম প্রকাশিত)। এই সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দুর্গোৎসব বর্ণনা করিয়াছেন। কমলাকান্তের দুর্গোৎসব মহিষমর্দিনীর উপাসনা নহে,— স্বদেশপ্রেমের নেশায় মত্ত স্বদেশসেবকের বঙ্গমাতার উপাসনা। শারদীয় উৎসবের সপ্তমী পূজার দিন কমলাকান্ত আফিম একটু বেশি মাত্রায় খাইয়া প্রতিমা দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে প্রতিমা দেখা ঘটিল না। তিনি আফিমের নেশার ঘোরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, অনুভব করিলেন, তিনি যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাত্যাবিক্ষুব্ধ, দিগন্তব্যাপী, অনন্ত, অকূল প্রবল কালস্রোতে একাকী ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। এই কাল সমুদ্রে কমলাকান্ত তাঁহার প্রসূতি জননী বঙ্গভূমির সন্ধানে আসিয়াছিলেন—ভাসিতেছিলেন। একা বলিয়া তাঁহার বড়ো ভয় করিতে লাগিল,— তিনি, কোথা মা, কই মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন প্রাতঃসূর্যের লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির দূরপ্রান্তে সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা আবির্ভূতা হইলেন। কমলাকান্ত মাকে চিনিতে পারিলেন।

এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা ; এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত ; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নান শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী

শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত!...দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতো মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী 'বঙ্গ-প্রতিমা।' কমলাকান্ত মায়ের পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। মায়ের স্তুতি পাঠ করিলেন। বলিলেন, "এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এস মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কী?

দেখিতে দেখিতে প্রতিমা অনন্ত কাল-সমুদ্রে ডুবিল। কমলাকান্ত 'উঠ মা! উঠ মা!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই প্রতিমা আর উঠিল না। তখন কমলাকান্ত স্বদেশবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :

> এস ভাই সকল ! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ওই প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কী? ওই যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল ! চল ! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কী? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কী?

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে, কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিরূপে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে, তাঁহার অভিভাষণের উপসংহারে, কমলাকান্তের স্বপ্ন বিবরণের এই কয় পঙ্ক্তি আবৃত্তি করিতে শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। সম্মিলনের পরই অল-ইন্ডিয়া-কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য দেশবন্ধুর আহম্মদাবাদে যাইবার কথা ছিল এবং সেই কমিটিতে কয়েকটি প্রস্তাব লইয়া স্বয়ং মহাত্মা গান্ধির সহিত তাঁহার গুরুতর বিরোধের আশঙ্কা ছিল। * দেশবন্ধুর তখনকার মনের অবস্থার প্রভাবে *তাঁহার মুখে বঙ্কিমের শব্দময়ী চিত্র শ্রোতার নিকট জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছিল।*

কমলাকান্তের স্বপ্নদৃষ্ট মাতৃমূর্তি ক্রমশ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। জননী জন্মভূমি নানা মূর্তি ধারণ করিয়া ক্রমশ তাঁহার মানসদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি মূর্তি 'বন্দে মাতরম্' গীতে চিত্রিত হইয়াছে।

১২৮৭ সনের চৈত্র (১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল) মাসের *বঙ্গদর্শন*-এ *আনন্দমঠ* উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে এই গীত প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বন্দে মাতরম্' গীতের সহিত *আনন্দমঠ*-এর আখ্যান ভাগের বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নাই। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মহেন্দ্র এবং ভবানন্দ নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিয়াছিলেন। *এমন সময় ভবানন্দ কথাবার্তার জন্য বড়ো ব্যগ্র হইলেন।* ভবানন্দ কথোপকথনের জন্য

অনেকউদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন :

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

ইত্যাদি।

যে প্রকারে গীতটি *আনন্দমঠ*-এ উদ্ধৃত ইহয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয়, গীতটি স্বতন্ত্র রচিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত গীতি কবির মতো স্বীয় অনুভূতি এবং ভাব-বিভূতি ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করিতেন না, তাঁহার ব্রত ছিল বাহিরের উপাদান সংগ্রহ করিয়া নতুন জগৎ সৃষ্টি। *আনন্দমঠ*-এর অনেক পূর্বে প্রকাশিত *মৃণালিনী* উপন্যাসে দুইটি সঙ্গীত আছে বটে। 'বন্দেমাতরম'-এর সহিত সেই দুইটি গীতের তুলনা হয় না। এই সকল গীত সুকবির রচিত, বন্দে মাতরম্ যেন স্বয়ম্ভূত ; আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের বা বনের ফুলের মতো আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বন্দে মাতরম্ গীতে জন্মভূমির যে চিত্র আছে, তাহা দেবীর বা মানবীর আদর্শে অঙ্কিত হয় নাই, তাহা জন্মভূমির নৈসর্গিক আকৃতির আংশিক প্রতিবিম্ব। কবির কল্পনা-দর্পণে প্রতিফলিত এই প্রতিবিম্বে সুহাসিনী জন্মভূমির সুখদ-বরদ রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেবী এবং মানবীয় তুলনায় জন্মভূমি সপ্তকোটি আননা, দ্বিসপ্তকোটি ভুজা। সন্তানের জননী জন্মভূমিই সর্বস্ব। সুতরাং তাঁহার এই প্রতিমা গড়িয়া মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে হইবে। কিন্তু সপ্তকোটি আননা দিসপ্তকোটি-ভুজা সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা জননীর প্রতিমা গড়িয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং এই প্রতিমা পৌত্তলিকের প্রতিমা নহে, এবং সেই মন্দির পৌত্তিলিকের মন্দির নহে। তার পর জন্মভূমির মহিমা কীর্তন করিবার জন্য কবি গাইয়াছেন, দুর্গা উপাসকের দুর্গা যেমন, লক্ষ্মী-সরস্বতীর উপাসকের লক্ষ্মী-সরস্বতী যেমন, জন্মভূমি আমার তেমনই উপাসনার বস্তু। এই উপাসনা অবশ্য পত্র-পুষ্প-ফল-জল দিয়া উপাসনা নহে।

বন্দে মাতরম্ গীতে জননী-জন্মভূমির সার্বজনীন প্রতিমা চিত্রিত এবং কীর্তিত করিয়া নিপুণ চিত্রকর আনন্দমঠের আনন্দ কাননের আনন্দ মন্দিরে দেবীর আদর্শে জন্মভূমির বিভিন্ন অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যে রাত্রে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বন্দে মাতরম্ গীত শুনাইয়াছিলেন এবং শিখাইয়াছিলেন, সেই রাত্রি প্রভাতে ভবান্দে মহেন্দ্রকে আনন্দ মন্দিরে সত্যানন্দ ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। দেবালয়ে মহেন্দ্র প্রথম দেখিলেন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাধারী এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তি। সম্মুখে মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্ন-মস্তা মূর্তি চিত্রিত রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে সরস্বতী। তারপর ১২৮৮ সালের বৈশাখের *বঙ্গদর্শন*-এর পাঠ আছে :

> সর্বোপরি বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুলরত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিত। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে উনি?' সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, 'মা।' *আনন্দমঠ*-এর বর্তমান সংস্করণে মাতৃমূর্তি আর বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে নাই, 'অঙ্কোপরি' নামিয়া আসিয়াছেন।

সত্যানন্দ কক্ষান্তরে মহেন্দ্রকে জগদ্ধাত্রী মূর্তি দেখাইয়া বলিলেন, 'মা—যা ছিলেন।' 'ইনি কুঞ্জর, কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাস স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।'

সত্যানন্দ তার পরে মহেন্দ্রকে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে এক ভূগর্ভস্থ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। মহেন্দ্র সেখানে এক কালী মূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী (সত্যানন্দ) বলিলেন, 'দেখ মা যা হইয়াছেন।'

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন, 'কালী!'

ব্রহ্মচারী, 'কালী অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী! হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা।'

সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ-পথে লইয়া গেলেন। সহসা মহেন্দ্রের চক্ষে প্রাতঃসূর্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। মর্মর-প্রস্তরনির্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্মিত দশভুজা প্রতিমা দেখিতে পাইলেন। সত্যানন্দ বলিলেন :

> এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে শক্তি শোভিত,—পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়ন নিযুক্ত।

কমলাকান্তের স্বপ্নদৃষ্ট জন্মভূমির মূর্তি।

জন্মাভূমির মূর্তি কল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রান্তি নাই।

মহেন্দ্র *আনন্দমঠ*-এর বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেবীরূপে জন্মভূমির ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া স্ত্রী কল্যাণীর সহিত মিলিত হইলেন। কল্যাণীর নিকট শুনিলেন, সেও পূর্ব রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সে দেখিয়াছিল, সে এক অপূর্ব স্থানে গিয়াছে। সেখানে যেন সকলের উপরে কে বসিয়া আছেন :

> যেন নীল পর্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার

> মাথায়। তাঁহার যেন চারি হাত। তাহার দুইদিকে কি, আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধহয় স্ত্রীমূর্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ...যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রী-মূর্তি। সে-ও জ্যোতির্ময়ী কিন্তু চারিদিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতি শীর্ণা কিন্তু অতি রূপবতী মর্মপীড়িতা কোন স্ত্রী মূর্তি কাঁদিতেছে।

এই মেঘমণ্ডিতা স্ত্রী-মূর্তি কল্যাণীকে দেখাইয়া বলিল, 'এই যে—ইহারই জন্যে মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' চতুর্ভুজ কল্যাণীকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে।'

কল্যাণী চতুর্ভুজকেও চিনিলেন না, শীর্ণা স্ত্রীলোককেও চিনিলেন না। আমরা উভয় মূর্তিই চিনিতে পারি। আমরা উভয় মূর্তিই মহেন্দ্রের সঙ্গে আনন্দমঠের দেবালয়ে দেখিয়াছি।

বঙ্গদর্শন-এর যখন 'বন্দে মাতরম্' গীত প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন রাগিণী, তাল ইত্যাদি এইরূপে সূচিত হইয়াছিল :

০ ১×১

মল্লার—কাওয়ালী, তাল যথা—বন্দে মাতরম্ ইত্যাদি।

এই গীত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে এত দূর প্রভাবিত করিয়াছে, এবং এমন সকল সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব হিসাব করিতে হইলে এই গীতের পরবর্তী ইতিহাস স্মরণ করা আবশ্যক।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে (1287 সনের চৈত্র) 'বন্দে মাতরম্' গীত প্রকাশিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে, কলিকাতায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরোজী, এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন :

> ইহার (১২৯১ সনের) এক বৎসর পরে, কলিকাতায় চতুর্থ (?) 'কংগ্রেস' উপলক্ষ্য করিয়া 'রাখী বন্ধন' প্রকাশিত হইল ; তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গীতি, ভারতের ঐক্যতানরূপে হেমচন্দ্র ঘোষিত করিলেন" (৪৮ পৃঃ)

'রাখীবন্ধন' কবিতায় হেমচন্দ্র এই প্রকারে 'বন্দে মাতরম্' গীতের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন :

প্রণয়-বিহ্বল ধরে গলে গলে

গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল 'বন্দে মাতরম্'
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত—দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্'।
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগৎ মাতিল।

কংগ্রসের এই অধিবেশনের আরম্ভে 'বন্দে মাতরম্'। গীত গাওয়া হইয়াছিল, এবং তার পর বাঙ্গালার সভা-সমিতিতে এই সঙ্গীত গীত হইতে আরম্ভ হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবিভাগ আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি (slogan) এবং গীত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সকলেই জানেন, সরকারের বঙ্গবিভাগ রদ করিবার জন্য এই আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছিল, সুতরাং সরকারের বিরুদ্ধাচরণের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল 'বন্দে মাতরম্'। বাঙ্গালা বাঁটোয়ারা সম্বন্ধীয় আন্দোলনে অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান সরকারি অভিমত সমর্থন করিয়াছিলেন। সুতরাং অনেক মুসলমান 'বন্দে মাতরম্'কে মুসলমানবিরোধী ধ্বনি মনে করিয়াছিলেন। *আনন্দমঠ* উপন্যাসের আখ্যান বস্তু এই প্রকার সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ যোগাইয়াছিল।

'বন্দে মাতরম্'-এর উৎস সন্ধানে

দীনেশচন্দ্র সিংহ

'বন্দে মাতরম্' গানের রচয়িতা এবং *আনন্দমঠ* উপন্যাসের লেখক বলেই অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের উদ্‌গাতা বলে মনে করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট, ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র সমাবেশ এবং তাদের কথোপকথন সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে যে স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রীতি অন্তঃসলীলা ফল্গুধারার মতো নিরন্তর প্রবহমান ছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাসগুলিতে বহিরাগত মুসলমান শাসকদের শাসনকালে অসহায় মাতৃভূমি ও মাতৃজাতির করুণচিত্র বারে বারে ঘুরেফিরে এসেছে। যবনে যবনে অর্থাৎ পাঠানে পাঠানে, মোগলে পাঠানে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে হিন্দু উলুখাগড়ার যে প্রাণান্ত ঘটছিল তা বলার অপেক্ষ রাখে না। তাদের জাতধর্ম যে শুধু বিপন্ন হচ্ছিল তা নয়, হিন্দু নারীজাতির মানসম্ভ্রম কুলমর্যাদাও পরদেশী মুসলমান আক্রমণকারী ও লুঠেরাদের লুণ্ঠন ও উপভোগের সামগ্রী হয়ে পড়েছিল। *দুর্গেশনন্দিনী*তে ক্ষুদ্রভূস্বামী বীরেন্দ্র সিং-এর গড় মান্দারণ দলনের পরবর্তী অবস্থা থেকেই মুসলমান শাসনে হিন্দুদের বাস্তব অবস্থার পরিচয় মেলে। উক্ত উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে পাঠান সেনাপতি ওসমান, রাজপুত সেনাপতি জগৎসিংহ ও ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ গজপতির কথোপকথনে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করছি :

জগৎসিংহ...কহিলেন, 'আপনার হাতে ও কি পুঁতি?'

গজপতি, 'আজ্ঞা মাণিকপীরের পুতি।'

'সে কি? ব্রাহ্মণের হাতে মাণিকপীরের পুঁতি।'

'...আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, এখন তো আর ব্রাহ্মণ নই। ...আমি মোছলমান হইয়াছি।'

রাজপুত্র কহিলেন, 'সে কী?'

গজপতি কহিলেন, 'যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমাকে কহিলেন যে, আয় বামন্ তোর জাতি মারিব। এই বলিয়া তাঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া মুরগীর পালো রাঁধিয়া খাওয়াইলেন।...তারপর আমাকে বলিলেন, তুই মুসলমান হইয়াছিস ;

সেই অবধি আমি মোছলমান।'

রাজপুত্র, 'আর সকলের কী হইয়াছে?'

'আর আর ব্রাহ্মণ অনেকেই ঐরূপ মোছলমান হইয়াছে।' রাজপুত্র ওসমানের মুখপানে দৃষ্টি করিলেন। ওসমান রাজপুত্রকৃত নির্বাক তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 'রাজপুত্র, ইহাতে দোষ কী? মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্মই সত্য ধর্ম, বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্মপ্রসারে আমাদের মতে অধর্ম নাই, ধর্ম আছে।'

একেবারে খাঁটি কথা। চারশত বৎসর পরে অনুষ্ঠিত নোয়াখালীর হিন্দুবিরোধী দাঙ্গাতেও এই একই মনোভাব কাজ করেছিল। বলাই বাহুল্য, এই সময় বীরেন্দ্র সিং-এর পত্নী বিমলা এবং কন্যা তিলোত্তমাকে যে নবাব কতলু খাঁ বিলাসসঙ্গিনী করবার মানসে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রেখেছে তার সবিস্তার উল্লেখ রয়েছে। প্রথম মুসলমান আক্রমণকাল থেকেই হিন্দু নারীজাতির এই ধরনের লাঞ্ছনা সর্বযুগে, সর্বকালে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস *কপালকুণ্ডলা*। বাংলার শুধু বাংলার, কেন, সারা ভারতের, বিশেষত উত্তর ভারতের হিন্দু নারীকুল সে সময় যেমন মোগল-পাঠানদের সহজভোগ্যের উপকরণে পর্যবসিত হয়েছিল, তেমনি নিম্নবঙ্গের খ্রিস্টিয়ান হারমাদদের অত্যাচারেও তাদের মানসম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল। স্বয়ং কপালকুণ্ডলা যে এরকমই এক অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যা তা তার পালকপিতা সদৃশ অধিকারী মহাশয়ের বক্তব্যে প্রকাশ। নবকুমারের নিকট কপালকুণ্ডলার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রিস্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ-প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।...কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধি মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

নবকুমারের প্রথমাপত্নী পদ্মাবতী কীভাবে মতিবিবি তথা লুৎফ-উন্নিসায় রূপান্তরিত হলেন সে বৃত্তান্ত নিম্নরূপ :

> তিনি (নবকুমার) রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছুদিন পিত্রালয়ে রহিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন।...যখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন মোগল-পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আগমনকালে তিনি পথিমধ্যে পাঠান সেনার হস্তে পতিত হয়েন। পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র বিচারশূন্য, তাহারা নিরপরাধী পথিকের প্রতি (অবশ্যই হিন্দু, কারণ তখনও বাংলায় পথেঘাটে মুসলমান বিরলদৃষ্ট ছিল ; আর মুসলমান পাঠান

সৈন্য নিশ্চয় স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ওপর জুলুম করত না) অর্থের জন্য বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামগোবিন্দ কিছু উগ্রস্বভাব ; পাঠানদিগকে কটু কহিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন ; পরিশেষে জাতীয় ধর্ম বিসর্জনপূর্বক সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

বঙ্গদেশে মুসলমান ধর্মপ্রচারের এই তো নমুনা। অবশ্য ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী নামধারী পেশাকারের দল প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে হিন্দুরা নাকি গো-গোস্ত খাবার এবং চাচাত বোনকে সাদি করার লোভে ইসলামী প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নেচে নেচে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। পেট্রোডলারখোরদের বিচারবুদ্ধিই আলাদা।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস, *মৃণালিনী*। এটি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এবং বখ্‌তিয়ার খিলজীর বাংলা জয়ের পটভূমিতে রচিত। বঙ্গাধীপ পরাজয় এবং গৌড়ে যবনাধিকারের প্রেক্ষাপটে রচিত এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে একদিকে ছল বল বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কময় কাহিনি, অপরদিকে বিধর্মীর হাতে স্বদেশ ও স্বজাতির নিদারুণ নিগ্রহ নির্যাতনে মর্মান্তিক ব্যথাতুর বঙ্কিমচন্দ্রের রক্তের অক্ষরে লেখা কাহিনিতে পরিপূর্ণ। বাংলার তৎকালীন রাজধানী নবদ্বীপ অধিকারের পর নবদ্বীপের কী শোচনীয় অবস্থা ঘটেছিল তা দেখা যাক।

যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া মুক্তদ্বারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্বাগ্রে একজন খর্বকায়, দীর্ঘকায়, কুরূপ যবন। দুর্ভাগ্যবশত দৌবারিক তাহার গতিরোধ জন্য শূলহস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, 'ফের—নচেৎ এখনই মারিব।'

'আপনিই তবে মর।' এই বলিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন দৌবারিককে নিজকরস্থিত তরবারে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, 'এক্ষণে আপন আপন কার্য কর।...যেখানে যাহাকে পাও বধ করো। পূরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ করো।'

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বালবৃদ্ধ বনিতা পৌরজন যেখানে যাহাকে দেখিল, তাহাকে অসিদ্বারা ছিন্নমস্তক অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল।

* * * * *

সেই নিশীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্মত্ত যবনসেনার নিষ্পীড়নে বাত্যাসন্তারিত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগরসদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথ ভুরি ভুরি অশ্বারোহীগণে, ভুরি ভুরি পদাতিদলে, ভুরি ভুরি খড়গী, ধানুকী, শূলীসমূহসমারোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেনাবলহীন রাজধানীর নাগরিকেরা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, দ্বার রুদ্ধ করিয়া সভয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

যবনেরা রাজপথে যে দুই একজন হতভাগ্য আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে

শূলবিদ্ধ করিয়া বুদ্ধদ্বার ভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল। কোথাও বা দ্বারভগ্ন করিয়া কোথাও বা প্রাচীন উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোথাও বা শঠতাপূর্বক গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, গৃহস্থের সর্বস্বাপহরণ পশ্চাৎ স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক সকলেরই শিরচ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্বক করিতে লাগিল।

শোণিতে গৃহস্থের গৃহ সকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শোণিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল। শোণিতে যবনসেনা রক্তচিত্রময় হইল। অপহৃত দ্রব্যজাতের ভারে অশ্বের পৃষ্ঠ ও মনুষ্যের স্কন্ধ পীড়িত হইতে লাগিল। শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ডসকল ভীষণভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অশ্বের গলদেশে দুলিতে লাগিল। সিংহাসনস্থ শালগ্রামশিলাসকল যবন-পদাঘাতে গড়াইতে লাগিল।

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অশ্বের পদধ্বনি, সৈনিকের কোলাহল, হস্তীর বৃংহিত, যবনের জয়শব্দ, তদুপরি পীড়িতের আর্তনাদ। মাতার রোদন, শিশুর রোদন, বৃদ্ধের করুণাকাঙ্ক্ষা, যুবতীর কণ্ঠবিদার।'

বিশ্বাসঘাতক পশুপতি যখন যবন কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে নিজ গৃহাভিমুখে ধাবিত হচ্ছিলেন, তখন, '...প্রতিপদে মৃত নাগরিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল ; প্রতিপদে শোণিতসিক্ত কর্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে—গৃহাবলী জনশূন্য—বহু গৃহ ভস্মীভূত ; কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভগ্ন—গবাক্ষ ভগ্ন—প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—তদুপরি মৃতদেহ ! এখনও কোনো হতভাগ্য মরণ-যন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল'

বঙ্কিমচন্দ্র সত্যিই সত্যদ্রষ্টা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁর এই লোমহর্ষক বর্ণনার হুবহু প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল পঁচাত্তর বছর পরে কলকাতা, ঢাকা, নোয়াখালী বরিশাল ও পূর্ব বাংলার অসংখ্য শহর বন্দর গ্রাম-গ্রামান্তরে—1946/47, 1949/50, 1954 খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে এবং 1992 খ্রিস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশে। তফাৎ শুধু একটি—উপন্যাসোক্ত কাহিনিগুলি সংঘটিত হয়েছিল পাঁচ সাতশ' বছর পূর্বে বিদেশি মুসলমানের দ্বারা, আর নিকট অতীতে সংঘটিত ঘটনাগুলি আমাদের জীবদ্দশায় অনেকের চোখের সামনে স্বদেশি মুসলমানের হাতে। সর্বক্ষেত্রেই অত্যাচারিত বাংলাভাষী হিন্দুরা। অথচ বঙ্কিচন্দ্র একই সঙ্গে হাসিম সেখ ও রামা কৈবর্তের দুর্দশায় অশ্রুপাত করেছেন।

এরপরে বঙ্কিমচন্দ্র পরপর কয়খানা সামাজিক উপন্যাস ও বড়ো গল্প রচনা করেন। বেশির ভাগ সামাজিক ও পারিবারিক কাহিনিভিত্তিক এবং ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা-পরবর্তীকালের পটভূমিকায় রচিত। *চন্দ্রশেখর*-এর উপন্যাসের পটভূমিরূপে তিনি আবার রাজনীতি আশ্রয় করলেন। তাঁর পূর্বেকার ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ছিল পাঠান বা মোগল আমলে বাংলার হিন্দুদের গ্লানিময় জীবনযাত্রার ছাপ, চন্দ্রশেখর উপন্যাসের

মুসলমান ও ইংরেজের ক্ষমতা কাড়াকাড়ির প্রতিচ্ছবি। *চন্দ্রশেখর* বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের সন্ধিক্ষণের চিত্র, বাংলার রাজনীতির সন্ধিক্ষণের চিত্র, মুসলমানের হাত থেকে ইংরেজের হাতে শাসনভার হস্তান্তরের সন্ধিক্ষণের চিত্র, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরী জীবনের সন্ধিক্ষণের চিত্রও বটে। এ সম্পর্কে একটু পূর্বানুবৃত্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি।

২

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। 1858 খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাস করেন। এবং সাড়ে তিন মাসের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট ডেপুটি।

বঙ্কিচন্দ্রের, শুধু বঙ্কিমচন্দ্রেরই বলি কেন, বাংলার সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশিত হয়, 1865 খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় উপন্যাস *কপালকুণ্ডলা*-র প্রকাশ 1866 খ্রিস্টাব্দে। তৃতীয় উপন্যাস *মৃণালিনী*-র আত্মপ্রকাশ 1869 খ্রিস্টাব্দে। এগুলি রোমান্সধর্মী উপন্যাস, কোনো কোনোটা ঐতিহাসিক ছায়াশ্রিত। তারপরের উপন্যাস *বিষবৃক্ষ*—পারিবারিক লক্ষণাক্রান্ত, সামাজিক পটভূমিকায় অঙ্কিত। প্রকাশিত হয় 1872 খ্রিস্টাব্দে বৈশাখ-ফাল্গুন সংখ্যা থেকে *বঙ্গদর্শন*-এ (এপ্রিল 1872/ বৈশাখ 1279) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসখানা শ্রাবণ 1280—ভাদ্র 1281 অর্থাৎ জুলাই 1873 থেকে আগস্ট 1874 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে *বঙ্গদর্শন*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 1875 খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসখানা প্রকাশকালে পরপর এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে যা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে, সাহিত্যজীবনে ও চাকুরিজীবনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায় ; এমনকী প্রকারান্তরে উপন্যাসেও ছায়াপাত ঘটায় বলা চলে। সে সময় তিনি ছিলেন মুরশিদাবাদ জেলার বহরমপুরে সরকারি কর্মে নিয়োজিত। তখন তিনি 'most obedient and faithful servant of the Government।' তিনি ব্রিটিশ শাসনের গুণমুগ্ধ আমলা। সার্ভিস রেকর্ডে তাঁর কার্য পরিচালনা পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা নথিভুক্ত হতে থাকে বছরের পর বছর। তিনিও বিদেশীয় শাসন ও বিচার বিভাগ সম্পর্কীয় যে-কোনো সরকারি সিদ্ধান্তেরই সোৎসাহ সমর্থন জানান। 'এই সময়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দিত হইয়াছিলেন। যে স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল্‌কে তিনি পরে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই যে কেন সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তখনকার অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

...According to his [Bunkim Chunder Chatterjee the Dy. Collector of

Berhampoor] opinion, "much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the comment, is due to the action of the native press. "...We are taken by surprise at the ramarks of an educated native like Bunkim Babu, who holds no inconsiderabe position in our society. Certainly in a free country such remarks from a person of Bunkim Babu's position would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country,—16 October, 1873.

...This mischievous remark of the Babu, as may be easily supposed, has met with the approval of his Honor...What Bunkim Babu said was simply silly in the extreme. He might have as well said that the native press seeks the interests of the people.... If Babu Bunkim and Sir George following mean to insinuate that the native press sows sadition, we can only say that there is a vague and indefinite law on the subject, which might be easily enforced if necessary.

....Babu Bunkim Chandra draws but only Rupees 600 per mensem and already his zeal has met with the approbation of his Honor, and it is to be expected that a promotion would increase his zeal tenfold. Before concluding this we would make the remark regarding Bunkim Baboo which the late Mr. Anstey made of Mr. Paul when eulogising Lord Mayo. "I hope my learned colleague will meet his reward in after life as surely as he is to received the reward here.—23 Oct. 1873.

(সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

দেখা যাচ্ছে অল্প ব্যবধানে পরপর দুই দিন বঙ্কিমচন্দ্রের রাজভক্তির বিরুদ্ধে অমৃতবাজার তিক্ত মন্তব্য করে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এই রাজানুগত্যের উপযুক্ত পুরস্কার দু'মাসের মধ্যেই হাতে হাতে পেলেন—আক্ষরিক অর্থেই। বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টের কম্যান্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিনের হাতে 1873 খ্রিস্টাব্দে 15 ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র বিনাপরাধে নিগৃহীত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সময়ে বহরমপুরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছিল। 8 জানুয়ারি ও 15 জানুয়ারি তারিখের *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

We are grieved to learn from the Moorshidabad Patrika that Babu Bunkim Chunder Chatterjee, the Dy. Magt. while returning home from office on the 15th December last, was assaulted by one Lt. Colonel Duffin of the Berhampore Cantonment, and received several violent pushes at his hands. It appears that the Babu was passing in a palkee across a cricket ground where Mr. Duffin and some Europeans were playing. This was deemed a great beadubee on the part of the Babu

> and Mr. Duffin felt himself fully justified in chastising him with blows. The Patrica says that the Babu has brought a criminal case against his aggressor and it has caused as it ought great sensation in Berhampore...—8 Jany. 1874.
> ...It appears that the Colonel and the Babu were perfect strangers to each other, and he did not know who he was when he affronted him. On being informed afterwards of the position of the Babu, Col. Duffin expressed deep contrition and a desire to apologise. The apology was made in due form in open Court where about a thousand spectators, native and European, were assembled— 15th Jany. 1874*(সাহিত্য সাধক চরিতমালা)*

এই দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় তিন মাস। কিন্তু তিন মাসেই বঙ্কিমের জীবনে যেন যুগান্তর ঘটে গেল। ইতিপূর্বেই বহিরাগত মুসলমানের শাসনাধীনে হিন্দুদের অসহায় জীবন-যাপনের ছবি তিনি উপন্যাসে কিছু কিছু তুলে ধরেছিলেন। বহরমপুরের ঘটনা তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল বহিরাগত ইংরেজশাসনাধীন দেশের দিকে। এই ঘটনায় যেন বঙ্কিমচন্দ্রের বোধোদয় হল। ডাফিন প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে বঙ্কিম যে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, সে অপমানের জ্বালা তো নির্বাপিত হয় না। তিনি বুঝলেন যে পদাঘাত পদাঘাতই, সে মুসলমান নবাব বাদশার পয়জার পরা পায়েই হোক, কিংবা সাহেবদের সবুট লাথিই হোক। পরাধীন জাতির কাছে দুটোই সমান। তাঁর সমকালীন ইংরেজদের কথা ছেড়ে দিলেও এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠাকালীন ইংরেজ কর্মচারীদের নারী-লোলুপতা এবং তাদের হাতে বাংলার নারীদের লাঞ্ছনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে। হিন্দু নারী-লোলুপতায় তারা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মতো পশুসুলভ প্রবৃত্তির দাস না হলেও প্রথম দিকে যে একেবারে ধোয়া তুলসী ছিলেন তাও নয়। *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই পরস্ত্রী অপহরণকারী লরেন্স পস্টরের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রথম ইংরেজ চরিত্রের প্রবেশ। কিন্তু প্রথম সৃষ্ট চরিত্রটি আদৌ শিষ্ট নয় ; তাঁর প্রথম উপন্যাসের ঘৃণ্য চরিত্র কতলু খাঁরই শ্বেতচর্মাকৃত কোট-প্যান্টালুন পরিহিত সংস্করণ বিশেষ। ফস্টরের প্রথম আবির্ভাবে 'শৈবলিনীর কাছে কতগুলি দেশি গালি খাইয়া স্বস্থানে' প্রস্থান। তার দ্বিতীয় আবির্ভাব তৃতীয় পরিচ্ছেদেই। রাত্রিবেলা চন্দ্রশেখরের অনুপস্থিতিতেই সে শৈবলিনীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কাল্পনিক ফস্টর চরিত্রের কুক্রিয়াসক্তির মাধ্যমেই শুধু নয়, উপন্যাসের অভ্যন্তরে স্বয়ং লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সেকালীন ইংরেজ চরিত্রের যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন:

> এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙলায় বাস করিতেন, তাহারা দুইটি মাত্র কার্যে অক্ষম

ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনোই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভালো। এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্যে অধর্ম আছে, অতএব অকর্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।
লরেন্স ফস্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সম্বরণ করিলেন না—বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম শব্দ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই উপন্যাসে ঘটনা পরম্পরায় দেখা গেল ফস্টর আহত ; আমিয়ট গলস্টন, জনসন প্রমুখ ইংরেজ পুরুষ এতদ্দেশীয় লোকের হাতে নিহত হয়েছে। চন্দ্রশেখর বাংলায় নবাবী আমলের এন্তেকালের পটভূমিতে রচিত। আগেই বলেছি এই উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম ইংরেজ চরিত্রের অবতারণা করেন—তাও কোনো উন্নত চরিত্র নয় ; দুশ্চরিত্র ইংরেজ লরেন্স ফস্টর রূপে। বাঙালি বীর প্রতাপ ও তার ভৃত্য বা সাকরেদ রামচন্দ্র প্রভৃতির হাত দিয়ে ফস্টর প্রমুখদের ঠ্যাঙানি খাইয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কলমের জোরে হাতের সুখ মিটিয়েছেন মনে হয়। ফস্টর প্রমুখদের ডাফিনের প্রতিভূ বলেই অনুমান করা যায়। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'—আত্ম শক্তির ওপর আস্থা এবং মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি তথা দেশপ্রেমের স্ফুরণ *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসেই প্রতিফলিত হল বলা চলে।

৩

কিন্তু পূর্বোক্ত সব কয়টি উপন্যাসই নবাবী ও বাদশাহী শাসনের প্রেক্ষাপটে বাংলা ও বাঙালি জীবনের আলেখ্যরূপে লিখিত। বৃহত্তর ভারতের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র যে উপন্যাসখানি রচনা করেছেন, তা হল রাজসিংহ। এই উপন্যাসের সময়কালীন ভারতীয় হিন্দুদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছেন :

কিন্তু ঔরঙ্গজেব কাহারও ওপর রাগ সহ্য করিবার লোক নহেন। হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ অসহ্য। একে হিন্দু মারহাট্টা পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আবার রাজপুত অপমান করিল। মারহাট্টার বড়ো কিছু করিতে পারেন নাই, রাজপুতের হঠাৎ কিছু করিতে পারিতেছেন না। অথচ বিষ উদগীরণ করিতে হইবে। অতএব রাজসিংহের অপরাধে সমস্ত হিন্দুজাতির পীড়নই অভিপ্রেত করিলেন।

আমরা এখন ইন্‌কম্ টেক্‌শকে অসহ্য মনে করি, তাহার অধিক অসহ্য একটা 'টেক্‌শ' মুসলমানি আমলে ছিল। তাহার অধিক অসহ্য—কেন না, এই 'টেক্‌শ' মুসলমানকে

দিতে হইত না ; কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত। ইহার নাম জেজেয়া। পরম রাজনীতিজ্ঞ আকবর বাদশাহ ; ইঁহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি উহা বন্ধ ছিল। এক্ষণে হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব তাহা পুনর্বার স্থাপন করিয়া হিন্দুর যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্বেই বাদশাহ্ জেজেয়ার পুনরাবির্ভাবের আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। হিন্দুরা ভীত, অত্যাচারগ্রস্ত, মর্মপীড়িত হইল। যুক্তকরে সহস্র সহস্র হিন্দু বাদশাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা ছিল না। শুক্রবারে যখন বাদশাহ্ মসজিদে ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। দুনিয়ার বাদশাহ্ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মতো আজ্ঞা দিলেন, 'হস্তিগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক।' সেই বিষম জনমর্দ্দ হস্তিপদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।

ঔরঙ্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ জেজেয়া দিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীর পর্যন্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তাহার স্থানে মুসলমানের মসজিদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির গেল ; মথুরায় কেশবের মন্দির গেল ; বাংলায় বাঙালির যাহা কিছু স্থাপত্যকীর্তি ছিল, চিরকালের জন্য তাহা অন্তর্হিত হইল।

ঔরঙ্গজেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতানার রাজপুতেরাও জেজেয়া দিবে। রাজপুতানার প্রজা তাঁহার প্রজা নহে, তথাপি হিন্দু বলিয়া তাহাদের ওপর এ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজপুতেরা প্রথমে অস্বীকৃত হইল ; কিন্তু উদয়পুর ভিন্ন আর সর্বত্র রাজপুতানা কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অচল। জয়পুরেব জয়সিংহ—যাঁহার বাহুবল মোগল সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, তিনি এক্ষণে গতাসু ;—বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহন্তা ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দিল্লীতে আবদ্ধ। সুতরাং জয়পুর জেজেয়া দিল।

যোধপুরের যশোবন্ত সিংহও লোকান্তরগত। তাঁহার রাণী এখন রাজপ্রতিনিধি। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি বাদশাহের কর্মচারীদিগকে হাঁকাইয়া দিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। স্ত্রীলোক যুদ্ধের ধমকে ভয় পাইলেন। রাণী জেজেয়া দিলেন না, কিন্তু তৎপরিবর্তে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন।

রাজসিংহ জেজেয়া দিলেন না। কিছুতেই দিবেন না ; সর্বস্ব পণ, করিলেন। জেজেয়া সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাজপুতানার ইতিহাসবেত্তা সেই পত্রসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

The Rana remontrated by letter, in the name of the nation of which

> he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate resolve, so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity with such pure philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of any age, clime or condition.*

পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিল।

বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন, জেজেয়া ত দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে, এবং দেবালয় সকল ভাঙিতে হইবে। রাজসিংহ যুদ্ধের উদ্যোগে করিতে লাগিলেন।'

চন্দ্রশেখর-এর পর বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠ* ও *দেবী চৌধুরাণী*-তেও যে সব সাহেব চরিত্র অঙ্কন করেছেন তার কোনোটিই-আদর্শ ও অনুকরণীয় নয়। আনন্দমঠ-এ-ই বঙ্কিম নবাবী ও বাদশাহী হারেম থেকে স্বপ্ন ও কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে নেমে এলেন। *চন্দ্রশেখর* রচনার প্রাক্কালে রচিত এবং *আনন্দমঠ*-এ গ্রথিত ও সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিই ইংরেজ শাসনের মৃত্যুঘণ্টা সূচিত করে। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদ এবং তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, লাঠি সড়কি বর্শাধারী সন্তানসেনার হাতে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত গোরা সৈনিকগণ কেমন অপদস্থ হয়েছিল :

> ক. এমন সময় হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন।
>
> খ. কাপ্তেন (টমাস) একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কিনা, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার ওপর পড়িয়া হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল।

এই উপন্যাসে প্রথমেই গোরা সৈন্যের মুণ্ডচ্ছেদ। তারপর ক্রমান্বয়ে কাপ্তেন টমাসের পরাজয় ও বন্ধন এবং লেফ্‌টেনান্ট ওয়াটসন, কাপ্তেন হে, মেজর এডওয়ার্ডস, লিণ্ডলে প্রভৃতি সৈনিক প্রবরের সন্তানদলের হাতে নাস্তানাবুদদের নাশ কাহিনিতে পরিপূর্ণ। সে সঙ্গে মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। বিশ পঁচিশ বছর না পেরোতেই বাংলার বিপ্লবীরা যে এ গ্রন্থকে স্বদেশপ্রেমের গীতারূপে গ্রহণ করবে তাতে অবাক হবার কী আছে। বাঙালি যুবকদের সাহেব ঠ্যাঙানোর সাহস বঙ্কিমচন্দ্রই জুগিয়েছেন।

* *Tod's Rajasthan, Vol. I*, P 381

৪

বহরমপুরের ঘটনায় ডাফিন সাহেবের হাতে নিজের নির্যাতন, আর *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে কাল্পনিক চরিত্র প্রতাপের হাতে লরেন্স ফস্টরের নির্যাতন বাস্তব ও কল্পনার কাকতালীয় ঘটনাসন্নিবেশ বলা চলে। 1874-এর জানুয়ারি মাসে বহরমপুরের ঘটনাটি ঘটে। আগস্ট মাস নাগাদ *বঙ্গদর্শন*-এ ধারাবাহিকভাবে *চন্দ্রশেখর*-এর প্রকাশ শুরু। সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 1875-এর জুন মাসে। ওই 1875 খ্রিস্টাব্দেই 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত রচিত হয়। 1875-এর জুন মাসে। ওই 1875 খ্রিস্টাব্দেই 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত রচিত হয়। সাত বৎসর পর 1882 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে বক্ষে ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে *আনন্দমঠ*।

একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করলে বিষয়টি স্পষ্টরূপেই ধরা পড়বে যে বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎই খেয়ালের বশে 'বন্দে মাতরম্' রচনা করেননি। তাঁর অন্তরে স্বদেশপ্রেমের আগুন জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই ধিকি ধিকি জ্বলছিল। গড় মান্দারনের পথেই হোক, আর গঙ্গাসাগরের বক্ষেই হোক, কিংবা আরাবল্লী পর্বতমালার সানুদেশেই হোক এদেশের সভ্যতা সংস্কৃতি, আকাশ মাটি, দেবদেবী, মানবমানবী তাঁর হৃদয়ে স্থায়ী আসন দখল করেছিল। জাতীয় অবমাননা ও লাঞ্ছনার জ্বালা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। হাজার বছরের বিদেশি শাসনে জাতির অন্তরাত্মা শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ খাঁ খাঁ হাহাকারে পরিপূর্ণ। তার ধর্ম আক্রান্ত, সংস্কৃতি বিপন্ন, সাহিত্য বিলুপ্ত, মর্যাদা লুণ্ঠিত। তাই প্রথম উপন্যাস থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কলমের মুখে ঝরে পড়েছে বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর হাতে স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনা নির্যাতনের কাহিনি। তাঁর অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো দেশপ্রেমের ধারা প্রবাহিত রয়েছে প্রত্যেকটি রচনায়। 'বন্দে মাতরম্'-এর বীজ নিহিত রয়েছে। সব রচনারই পাতায়। ডাফিন ঘটনায় তা আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণের মতো স্বতোৎসারিত লাভাকারে বেরিয়ে আসে, সমগ্র জাতিকে অনন্ত নিদ্রালসতা থেকে জাগিয়ে তোলে।

এই একটি গান রচনা কাল থেকেই জাতিকে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত' বলে প্ররোচনা দিতে থাকে। শত সহস্র স্বাধীনতা সৈনিক এই গান এই রণধ্বনি মুখে নিয়ে অম্লানবদনে পুলিশি নির্যাতন সহ্য করেছে। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য মনে করে ফাঁসিকাষ্ঠে-জীবনের জয়গান গেয়েছে। নিষিদ্ধ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণের অপরাধে বেত্রাঘাতে জর্জরিত বরিশালের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ছাড়েনি। সেই ঐতিহাসিক ঘটনা উপলক্ষ করে চারণকবি মুকুন্দদাস গাইলেন :

ফুলার তুমি কি দেখাও ভয়!
বেত মেরে ভুলাবে মাকে—
আমরা মায়ের তেমন ছেলেই নয় ॥

রচনাকাল থেকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হওয়া পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্'কে কেন্দ্র করে যে সব স্মরণীয় ঘটনা ঘটে তা নিম্নোক্তরূপে সাজানো যায় :

'বন্দে মাতরম্'-এর রচনাকাল : 1875 খ্রিস্টাব্দ

আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রকাশ : 1882 খ্রিস্টাব্দ

জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে পরিবেশন : 1886 খ্রিস্টাব্দ

প্রথম 'বন্দে মাতরম্' পতাকা (বরিশাল) : মে, 1905 খ্রিস্টাব্দ

বরিশালে 'বন্দে মাতরম্' মিছিল : 20 মে, 1905 খ্রিস্টাব্দ

কলকাতায় 'বন্দে মাতরম্' মিছিল : 7 আগস্ট, 1905 খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা : 16 অক্টোবর, 1905 খ্রিস্টাব্দ

'বন্দে মাতরম্' নিষিদ্ধ সার্কুলার : 8 নভেম্বর, 1905 খ্রিস্টাব্দ

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা প্রকাশ (অরবিন্দ) : 8 জুন, 1906 খ্রিস্টাব্দ।

জার্মানিতে 'বন্দে মাতরম্' পতাকা উত্তোলন (মাদাম কামা) : 8 আগস্ট, 1907 খ্রিস্টাব্দ

প্যারিসে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা প্রকাশ : 1907/08 খ্রিস্টাব্দ

'বন্দে মাতরম্' রেকর্ড নিষিদ্ধ : ডিসেম্বর, 1908 খ্রিস্টাব্দ

'বন্দে মাতরম্'-এর ইংরেজি অনুবাদ (অরবিন্দ) : 1909 খ্রিস্টাব্দ (কর্মযোগীন)

কলকাতা কংগ্রেসে 'জাতীয় সংগীত' হিসাবে স্বীকৃতিদান : 28 অক্টোবর, 1937 খ্রিস্টাব্দ

ভারতের জাতীয় 'গান' হিসাবে ঘোষণা : 24 জানুয়ারি, 1950 খ্রিস্টাব্দ।

'বন্দে মাতরম্'কে জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণের ইতিহাস কিন্তু অত্যন্ত ন্যক্কারজনক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। 1937 খ্রিস্টাব্দ থেকেই বাংলার আকাশ বাতাস মুসলিম লিগের উদগারিত সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে দূষিত হতে থাকে। জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে মিলিত হবার তাদের কোনোই আগ্রহ ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো পর্যায়েই অংশগ্রহণে তাদের সামিল করা যাচ্ছে না। হঠাৎ তারা 'বন্দে মাতরম্'-এ পৌত্তলিকতার গন্ধ পেয়ে মহাসোরগোল তুলল। বঙ্গীয় আইন সভায় অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার 'বন্দে মাতরম্' বলে তার বাজেট বক্তৃতা শেষ করলে, তাকে তারা গোনাহ্গার মনে করে চেঁচাতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতীক চিহ্নে 'শ্রী' ও 'পদ্ম' নিয়ে তাদের লম্পঝম্পে সারা বাংলা টালমাটাল হয়ে ওঠে। বেকুব ও বেসামাল কংগ্রেসী নেতারা ভাবলেন 'বন্দে মাতরম্' সংশোধন করলেই মুসলমান নেতা ও জনতা মহরমের মিছিলের মতো দলে দলে এসে কংগ্রেস মণ্ডপ ভরে তুলবে। তাদের সন্তুষ্টির জন্য কংগ্রেস নেতারা 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদ করতে মনস্থ করেন। একাজে

তারা রবীন্দ্রনাথকে শিখণ্ডী খাড়া করালেন এবং খোদার ওপর খোদকারি করে তিনি সঙ্গীতের শেষ দুই প্যারা বাদ দিলেন। সংখ্যালঘু তোষণের এর চেয়ে জঘন্য দৃষ্টান্ত তখন পর্যন্ত আর একটিও ছিল না।

কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। মুসলমান নেতারা 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদ করিয়েও জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরেই সরে রইল। বরং দশ বছর পরে 1947 খ্রিস্টাব্দে গান ভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশ ভাগও করে ছাড়ল। কংগ্রেসী নেতারা নাকের বদলে নরুণ পেয়ে তাক্ ডুমাডুম বাজালেন। কিন্তু ভারতে বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারকবাহক জওহরলাল নেহরু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কর্তিত 'বন্দে মাতরম্'-কে জাতীয় সংগীতের আসনচ্যুত করে রবীন্দ্রনাথের জন-গণ-মন'কে তার স্থলাভিষিক্ত করে তাঁর ব্রিটিশ প্রভুদের এবং সে সঙ্গে মুসলিম ভোটারদেরও মনোরঞ্জন করলেন। কারণ, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করলেই ব্রিটিশের গায়ে বিছুটি ফুটতো যেন। সেই গান তাদের সাম্রাজ্য হারা করেছে, তাই স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে বিলাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে, রাজারাণীর কর্ণে তা নিশ্চয়ই মধু বর্ষণ করবে না। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আপত্তিতেই নেহরু নানা মিথ্যা ওজর আপত্তি তুলে 'বন্দে মাতরম্'কে স্থানচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং রবীন্দ্রনাথের জন-গণ-মন'কে তার স্থলে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেন। আজীবন ব্রিটিশের ধামাধরা নেহরুর এই চাপল্যে ও হটকারী সিদ্ধান্তে মর্মাহত শ্রীঅরবিন্দ 'Mother India'য় লেখেন :

> The revolutionary vision and the mantric vibration distinguishing Vande Mataram thow Gana Mana entirely into the shade. And it is no wonder that not Tagore but Bankim's song has been the motive force of the whole struggle of Bharat's freedom.

অরবিন্দকে রবীন্দ্রনাথ নমস্কার জানালেও অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের এই অবিমৃষ্যকারিতা মোটেই ভালো চোখে দেখেননি তা অরবিন্দের ক্ষুদ্র মন্তব্যে অপ্রকট থাকেনি।

'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র

নারায়ণ চৌধুরী

স্বদেশপ্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের শতবর্ষপূর্তির বৎসর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। গানটি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লেখা হয়েছিল বলে ইতিহাসকারদের অনুমান। অনুমানের পিছনে যাকে বলে 'পাথুরে প্রমাণ তার পোষকতা না থাকলেও অভ্যন্তর প্রমাণ থেকে এই অনুমান সমর্থিত হয়। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত-স্রষ্টা অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র এবং *নীলদর্পণ* নাটকের প্রণেতা দীবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র দুজনেই এই অনুমানের পক্ষে লিখে গেছেন। পূর্ণচন্দ্রের ধারণা, ১৮৭৫ খ্রিঃ কোনো এক সময় এই গানটি রচিত হয়েছিল এবং রচনাকাল *কমলাকান্তের দপ্তর* প্রবন্ধমালার অন্তর্গত '*আমার দুর্গোৎসব*' নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের রচনাকালের অব্যহিত পরে হওয়াই সম্ভব। কেননা দুটি রচনার ভিতর গদ্য-পদ্যের মাধ্যমগত মৌলিক পার্থক্য থাকলেও বিশেষ ভাবগত মিল আছে। 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে হিন্দুর আরাধ্যা শক্তিস্বরূপিণী মাতৃমূর্তির যে ধ্যান অনুপম গদ্যভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উচ্চারণ তা-ই কবিতায় ছন্দিত ও সুরে বন্দিত হয়েছে। দুইয়ের ভাবের পটটিতে আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। *কমলাকান্তের দপ্তর* *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১৮৭৫ খ্রিঃ ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত হচ্ছিল, তা থেকে 'আমার দুর্গোৎসব' আর 'বন্দে মাতরম্'-এর ভিতর ভাবসূত্র প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়েছে।

কিন্তু রচনার উপলক্ষটি নাকি বড়োই সামান্য! প্রায় অবিশ্বাস্য বললেও চলে। পূর্ণচন্দ্রের *বঙ্কিম-প্রসঙ্গ* বইয়ের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তাঁর দাদা এই গানটি আদিতে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার শূন্য পৃষ্ঠার পাদপূরণের অভিপ্রায়ে রচনা করেছিলেন। *সাময়িক পত্র* পত্রিকা সম্পাদনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে, কোনো রচনার শেষ পৃষ্ঠার পাঠ্যবস্তু যদি অল্পেই শেষ হয়ে যায় তাহলে সেই পৃষ্ঠার শূন্যস্থান পরিপূরণের জন্য সম্পাদক মশাইকে ক্ষুদ্র কবিতা বা সংক্ষিপ্ত গদ্যাংশ বা কোনো উদ্ধৃতি হাতের কাছে সর্বদাই মজুত রাখতে হয়, যাতে অপূরণ অংশ পূরণ করতে কোনো অসুবিধা না হয়। তেমন কোনো আপাত-তুচ্ছ অভিপ্রায় থেকেই নাকি এই গানের জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্র গানটি লিখে টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। তারপর কী ঘটেছিল তা পূর্ণচন্দ্রের জবানীতেই শোনা যাক :

ছাপাখানার পণ্ডিত মহাশয় পাতা পূরণের জন্য, এটি দেখিয়া মন্দ নয় বলিয়া কহিলে,

সম্পাদক, বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, উহা ভাল কী মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছিল। কিন্তু তিনিও বোধ করি তখন এই গানের অন্তহীন সম্ভাবনার প্রকৃত ধারণা করে উঠতে পারেননি। সূচনাতে এই গানের যথার্থ মূল্যাবধারণ হয়নি, ইতিহাসের সরণি বেয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন যত এগিয়ে গেছে তত এই মন্ত্রতুল্য গানটিকে ঘিরে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বদেশ প্রেম, সংগ্রামী চেতনা, শৌর্য-বীর্য-সাহস, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, আত্মোৎসর্গের কামনা ক্রমশ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। গানটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সেই ইতিহাসেরও আবার শীর্ষবিন্দু স্পষ্ট হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে—১৯০৫ খ্রিঃ সমেত তার আগের ও পরের বৎসরগুলিতে। এই বছর কয়টিতে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের কলি কণ্ঠে ধারণ করে কত কত বীর বাঙালি যুবক যে পুলিশের লাঠি ও গুলির মুখে অকুতোভয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে, আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে তবু হাতের মুঠোয় সজোরে চেপে ধরা জাতীয় পতাকা হস্তচ্যুত করেনি, মৃত্যুঞ্জয়ী শৌর্যের অমিত আধার রূপে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছে, তার সীমা-সংখ্যা নেই।

বস্তুত, 'বন্দে মাতরম্' নিছক একটি গান নয়, নিছক একটি মাতৃস্তোত্র নয়, তার সঙ্গে বাংলার স্বদেশি যুগের গোটা ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক—তার স্বাধীনতা সংগ্রামের নিত্যপ্রেরণাস্থল এই অবিস্মরণীয় সঙ্গীত। আর শুধু বাংলার কথাই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তিকামনা এই গানটিকে অবলম্বন করে একদা শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশের উপায় খুঁজে পেয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবা যায় না।

গানটি রচিত হওয়ার সাত বৎসর পরে এটি *আনন্দমঠ* (১৮৮২ খ্রিঃ) উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রথম সাধারণের গোচর হয়। *আনন্দমঠ*-এর বিষয়বস্তু, পরিবেশ, চরিত্র-পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য—যেদিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন—গানটি উপন্যাসের আবহের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেছে। *আনন্দমঠ* উপন্যাসের আর 'বন্দে মাতরম্' গান এই দুই-ই এক অপরের পরিপূরক—দুইয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য বলা যায়। 'বন্দে মাতরম্' সন্তানদলের সন্ন্যাসীদের মাতৃমন্ত্র, সন্তানদের স্বদেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষায় নিত্যউদ্দীপক প্রেরণা। উপন্যাসের অনুষঙ্গে, এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর অরণ্যানীসমাকুল এক নির্জন প্রান্তরের বিস্তার মধ্যে এই গানটি প্রথম গীত ও শ্রুত হয়। গায়ক সন্তানদলের অন্যতম সন্ন্যাসী ভবানন্দ, শ্রোতা মহেন্দ্র। আমরা *আনন্দমঠ* উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

'ভবানন্দ—আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন :

বন্দেমাতরম্।
সুজলাম, সুফলাম মলয়জশীতলাম্
শস্য-শ্যামলাম্ মাতরম্।

'মহেন্দ্র গীতি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শশ্যশ্যামলা মাতা কে? জিজ্ঞাসা করিল, 'মাতা কে?'

'উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগিলেন :

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীম্ সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাম, বরদাম, মাতরম্।

'মহেন্দ্র বলিলেন, 'এ ত' দেশ, 'এ ত' মা নয়।'

'ভবানন্দ বলিলেন, 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই না, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশামলা,—'

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, 'তবে আবার গাও।'

'ভবানন্দ আবার গাইলেন—বন্দে মাতরম্...।'

পরিষ্কার বোঝা যায় এ গান মাতৃস্তোত্র হলেও সাধারণ মাতৃস্তোত্র নয়। এ মৃত্তিকাময়ী জননীর স্তব নয়, চিন্ময়ী জননীর ধ্যান। কতকগুলো মাটির ঢেলা গাছপালা পাহাড়-পর্বত নদীনালা সাগর পাথারের সমাহারকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেশজননী বলে অভিহিত করলেও যতক্ষণ না ওই মৃত্তিকা প্রস্তর তরুলতা জলসমষ্টির ভিতর চিৎশক্তির আবাহন করা হচ্ছে, ততক্ষণ তা যথার্থ স্বদেশজননীর ধ্যান মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃষ্টিতেই স্বদেশজননীকে দেখেছিলেন এবং ওই দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই 'বন্দে মাতরম্' গানটি লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষ (উত্তর জীবনে শ্রীঅরবিন্দ) এবং তাঁর বিপ্লবী সহযোগিবৃন্দ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতধৃত মাতৃকামূর্তির ভিতর ওই চৈতন্যস্বরূপিণী মায়ের রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করে উদ্ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁদের বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দে মাতরম্' গানটির দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি এটিকে বঙ্কিমের শিল্পীসত্তা থেকে ক্রান্তদর্শী সত্তায় উত্তরিত হওয়ার মূল কারক ব'লে মনে করেন এবং এখান থেকেই

তাঁর ঋষিত্বের পর্বের সূচনা হয়েছিল বলে ধারণা করেন। অরবিন্দের মতে *আনন্দমঠ*-এর আগে পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের যে রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তা হ'লে তাঁর কবিস্বরূপ, শিল্পীস্বরূপ, কিন্তু *আনন্দমঠ*-এর সময় থেকে যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হল তাঁর 'দ্রষ্টা ও জাতি-সংগঠক' স্বরূপ। অরবিন্দ *আনন্দমঠ* উপন্যাস ও তদন্তর্গত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে বড়ো দায় থাকাকালে তাঁর প্রসিদ্ধ 'ভবানীমন্দির' সংগঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আরব্ধ অগ্নিমন্ত্রশুদ্ধ বিপ্লব আন্দোলনের পদ্ধতি-প্রকরণ, ধারা-ধরনের মধ্যে ভবানীমন্দিরের আদর্শের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' গানের গদ্য ও পদ্য ইংরেজি অনুবাদ করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, তিনি এই নামেই তাঁর যুগান্তর দলের ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার নামকরণ করেন এবং পত্রিকাটিকে বিপ্লবী ভাবপ্রচারের মুখ্য বাহনে পরিণত করেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রাকশিত অরবিন্দের লিখিত কিন্তু অস্বাক্ষরিত দু-তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্যই অরবিন্দকে আলিপুর বোমার মামলায় জড়ানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এই অজুহাতে যে, ওই অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধগুলো তাঁর রচনা এবং সেগুলোর ভিতর তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের প্ররোচনা যুগিয়েছেন, অর্থাৎ হিংসার প্রচার করেছেন। সকলেই জানেন যে, তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু) এই মামলায় অরবিন্দের পক্ষে দাঁড়ান এবং তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতার প্রভাবে ও সুযুক্তিজাল-বিস্তারের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত অরবিন্দকে অভিযোগমুক্ত করতে সমর্থ হন। অরবিন্দ কারাগার থেকে ছাড়া পান।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় (১৯০৭-০৮ খ্রীঃ) অরবিন্দ তাঁর অন্যতম সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, রাক্ষস যদি দেশজননীর বুকের উপর চেপে বসে তাঁর রক্তপানে উদ্যত হয় তাহলে মাতৃভক্ত সন্তান মাত্রেরই কর্তব্য হল রাক্ষসকে আক্রমণ করে তার প্রাণ বন্ধ করা। ইংরেজ সরকার এই কথাগুলোর মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, অস্ত্রধারণেরও প্ররোচনা আবিষ্কার করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন সুকৌশলে এই অভিযোগের খণ্ডন করেন। যে সওয়ালের সাহায্যে চিত্তরঞ্জন এই কাজটি সুসম্পন্ন করেন তার ভিতর শুধু সুদক্ষ ব্যারিস্টারসুলভ ক্ষুরধার তর্কনৈপুণ্যশক্তিরই পরিচয় ছিল না, ছিল কবিপ্রাণতারও পরিচয়। চিত্তরঞ্জন সরকারের অভিযোগ খণ্ডনে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের নিহিত ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন—দেশজননী যে কেবলমাত্র মৃত্তিকাময়ী মা-ই নন, চিন্ময়ী মাও বটেন, একজন সংবেদনশীল কবির কবিদৃষ্টির দ্বারা এই ভাবটিকে তাঁর সেওয়ালের কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সম্পাদকীয়তে উল্লেখিত মা সত্যিকারের মা। মায়ের অপমান কোনো সন্তানই সহ্য করতে পারে না, করা উচিত নয়। রাজদ্রোহের অভিযোগে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত অরবিন্দ দেশজননীর উপমায় সত্যিকার মায়ের দুঃখের কথাই লিখেছিলেন। তিনি মৃণ্ময়ী

মায়ের দেহে চিন্ময়ী সত্তার আরোপ করেছিলেন।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার অন্যতম এক সম্পাদকীয়তে অরবিন্দ লেখেন :

> It was thirty-two years ago that Bankim wrote his great song....The Mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of partriotism. The Mother had revealed herself.....A great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conqueror.

অর্থাৎ বত্রিশ বছর আগে বঙ্কিম তাঁর মহান সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। ...মন্ত্র উচ্চারিত হল আর দেখতে দেখতে একটা গোটা জাতি দেশপ্রেমের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়ল। জননী আত্মপ্রকাশ করলেন।...যে বিরাট জাতির এমনতর ধ্যানদৃষ্টি খুলে গেছে, সেই জাতি আর কখনও বিজেতার পায়ের তলায় পড়ে থাকতে পারে না।

পড়ে থাকেওনি, এই ছত্রগুলো লিখিত হওয়ার ঠিক চল্লিশ বছর পরে ভারতবর্ষ ইংরেজের নাগপাশমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

সর্বশেষে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সম্পর্কে কী লিখেছিলেন তা উৎকলন করার লোভ সামলাতে পারছি না :

> বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কিছু করিয়াছেন....সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালোবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করেন নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র—বন্দে মাতরম্।

তবে ভিন্ন এক দৃষ্টিতে দেখলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে বুঝি সাম্প্রদায়িকতার কিছু দ্যোতনা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক মন্ত্র-সঙ্গীতটিতে যে মাতৃমূর্তির ধ্যান ও বন্দনা করেছেন তিনি একান্ত ভাবেই হিন্দু সম্প্রদায়ের আরাধ্য মাতৃমূর্তি। এর সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীদের ভাবাবেগ জড়ানো নেই। তাছাড়া এই গানে পৌত্তলিকতার সংস্কারও বড়ো প্রকট যেজন্য একদা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এই স্তবটিকে তাঁদের স্তব বলে গ্রহণ করতে অন্তরের বাধা অনুভব করেছিলেন। আর শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসাধারণ কেন, আপত্তি উঠেছিল অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও। আবাল্য মূর্তিপূজার বিরোধী সংস্কারে লালিত-বর্ধিত কবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত গানটির অংশবিশেষের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুর্গাস্তবের অন্তর্নিহিত পৌত্তলিক মাতৃধ্যানের কল্পনার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী কবি ১৯৩৭ সালে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তাঁর দ্ব্যর্থহীন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

ওই বিতর্কের আজও যে শেষ হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। কেননা এই সেদিনও *আনন্দমঠ* উপন্যাসের শতবর্ষপূর্তির বছরে (১৯৮২) এই নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। *আনন্দমঠ* উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিব্যক্ত মাত্রাহীন অসূয়ার মনোভাব ও ঘৃণা সেই সময় সম্যকদর্শী ও শুভ্রভাবাপূর্ণ অনেকেরই নিরপেক্ষ অন্তরে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাকে তাঁরা, সংগত সমালোচনার মধ্যে ভাষা দেন। সেই সূত্রে 'বন্দে মাতরম্' গীতিটিও রেহাই পায় না। দেশে যে হারে যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটছে তাতে মনে হয় এ বিতর্ক চলতেই থাকবে।

বন্দে মাতরম্ : জাতীয় জাগরণমন্ত্র

অলোকরঞ্জন বসুচৌধুরী

আরও প্রমাণ মেলে কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে কথাবার্তায়, যার বিবরণ পাওয়া যায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখের লেখায়। *আনন্দমঠ* প্রকাশিত হবার পর বঙ্কিমের কাছে নবীন নাকি একবার মন্তব্য করেন যে, তাঁর 'বন্দে মাতরম্' ভারতবর্ষের 'মারসেলেজ গীত' হবে। কিন্তু গানটি পুরোপুরি সংস্কৃত না করায় মাটি হয়েছে। মাঝে মাঝে বাংলা পঙ্ক্তিগুলো তাঁর মতে গানের গাম্ভীর্য ও প্রাণ নষ্ট করেছে। বঙ্কিম এর জবাবে বলেন, 'বাংলা লাইনগুলি তোমার ভালো না লাগে, উহাদের তুমি বাদ দিয়া পড়িও। 'নবীন তখন বলেন, আপনার ঐ দেমাকেই আমরা মারা গেলাম।' তখন বঙ্কিমচন্দ্র হেসে বলেন, 'তুমি গানটি গাইতে শুনেছ কি?' নবীন 'না' বলতে তিনি বলেন যে, শুনলে আর তিনি ওরকম বলবেন না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন :

> বঙ্কিমবাবু তাঁহার চেলাদের চেয়ে দেশের মতিগতি ঢের বেশি বুঝিতেন। তিনি 'বন্দে মাতরম্' গান লিখিয়া যেদিন শুনাইলেন, সকলেই আপত্তি করিল, কেহ ভাষার আপত্তি করিল। কেহ বলিল কটমট হইয়াছে, কেহ বলিল বাংলায় সংস্কৃত মিশিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস হইয়াছে কেহ বলিল বিটকেল হইয়াছে, কেহ বলিল মলয়জশীতলাংশ-এর ঈ-কারের জন্য শ্রুতিকটু হইয়াছে; কিন্তু বঙ্কিমবাবু কাহারও কথা শুনিলেন না, আপনার গোঁ-এ উহা ছাপাইয়া দিলেন।

'বন্দে মাতরম্' প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমের পূর্ববর্ণিত কথোপকথনের যে বিবরণ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের লেখায় পাই, সেখানে বঙ্কিমের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য : 'আমায় ভালো লেগেছে তাই ওরকম লিখেছি। লোকের ভালো লাগে কিনা ভেবে আমি লিখব?' এ ছাড়াও শোনা যায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কাছে বঙ্কিম নাকি বলেছিলেন যে তাঁর *আনন্দমঠ* দ্বারা একদিন উপকার হবেই। [জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিকথা] বড়ো মেয়ে শরৎ কুমারীকেও নাকি তিনি বলেছিলেন পঁচিশ বছর পরে বাংলাদেশ 'বন্দে মাতরম্' গান নিয়ে মেতে উঠবে।

এই মেতে ওঠার সময় বঙ্কিম তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জীবিত ছিলেন না ঠিকই, তবে মেতে ওঠার সূচনা তিনি দেখে গেছেন। যদুভট্ট বা রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ 'বন্দে

মাতরম্' সংগীতে সুর দিয়ে তাঁকে গেয়ে শুনিয়েছেন, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের পত্রিকায় 'বঙ্কিম বাবুর রচিত 'বন্দে মাতরম্' নামক বিখ্যাত গানটির স্বরলিপি ছাপা হচ্ছে, সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্'-এ বর্ণিত দেশজননীর শিল্পী অঙ্কিত চিত্রও [১৮৮৫]। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে কবি হেমচন্দ্র লিখেছেন :

> গাহিল সকলে মধুর কাকলি গাহিল—'বন্দেমাতরম্ / সুতরাং সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্। / ...' উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে / তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে / ভারত-জগৎ মাতিল।" [রাখিবন্ধন] এই বিপুল সম্মান যখন 'বন্দেমাতরম্' এর ওপর অর্পিত হয়, বঙ্কিম তখনও জীবিত।

বঙ্কিমের প্রয়াণের দু-বছর পরে কলকাতায় আয়োজিত কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর পরের অগ্নিগর্ভ বছরগুলোতে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের সেই দামাল দিনগুলোতে বাংলা তথা ভারতের জাতীয় ইতিহাসের প্রাণবাণী ছিল 'বন্দে মাতরম্'। বিনয়কুমার সরকার যথার্থই লিখেছেন :

> যুবক ভারত জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, একটি জিনিসের তাহার অভাব। একটা মন্ত্র তার দরকার। এই মন্ত্র হইতেছে 'বন্দে মাতরম্'। তখন জাতীয় ধ্বনি 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায় বা সঙ্ঘের নামে, এমনকি পত্রপত্রিকার নামেও 'বন্দে মাতরম্'। দেশে বিদেশে এই নামে কত গোষ্ঠী, ইস্তাহার মুখপত্র, যার পরিচালনায় শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা, মাদাম কামা, লাল হরদয়াল—কখনও বা অরবিন্দ ঘোষ! ভগিনী নিবেদিতার পরিকল্পিত জাতীয় পতাকায় (১৯০৬), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তোলিত পতাকায়ও (১৯০৭) কেন্দ্রবাণী 'বন্দে মাতরম্'। এরকমই একটি পতাকা ১৯০৭ সালে জার্মানিতে আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলনে মাদাম কামা যখন আন্দোলিত করেন, তখন দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন লেনিন ও রোজা লুকসেমবার্গের মতো বিপ্লবী। 'বন্দে মাতরম্' কাজেকাজেই যথার্থ মন্ত্র, আর এর স্রষ্টা বলেই বঙ্কিম ঋষি।

'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন আমরা দেখেছি। মদনমোহন মালবীয়ও গানটি শুনতে শুনতে নাকি ধ্যানতন্ময় হয়ে যেতেন। আবার *আনন্দমঠ* ও 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রভাবেই অরবিন্দ রচনা করেন তাঁর *ভবানীমন্দির* পুস্তিকা ও *বাজীপ্রভু* কবিতা। এই অরবিন্দের মাতামহ, ভারতীয় জাতীয়তার একজন আদিগুরু রাজনারায়ণ বসু 'অ্যান ওল্ড হিন্দুজ হোপ' নামে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তার শেষে 'বন্দে মাতরম' সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ সংযোজিত হয়েছিল (১৮৮৮ খ্রি.)। বঙ্কিমের জীবদ্দশায় প্রকাশিত এই ইংরেজি 'বন্দে মাতরম্' হয়তো রাজনায়ারণেরই রচনা। পরে তাঁর দুই বিপ্লবী দৌহিত্র অরবিন্দ-বারীন্দ্রকুমার একযোগে

ইংরেজিতে *আনন্দমঠ* অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া *আনন্দমঠ*-এর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কৃত 'অ্যাবে অব ব্লিস' (১৯০৬)।

নবভারতের রচনায় জাগরনী মন্ত্রের ঋষি হিসেবে বঙ্কিমের নাম অবশ্য গণনীয় বলে মনে করেছেন বিপিন পাল। তাঁর মতে স্বাজাত্যভিমানের সাথে বিশ্বপ্রীতির আবশ্যকতার কথাও বঙ্কিম বলে গেছেন :

> একদিকে আনন্দমঠ একটি অতি প্রবল স্বদেশ প্রীতি ও স্বাজাত্যভিমান জাগাইয়া দেয় কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে এই স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাজাত্যভিমান বিশ্বপ্রীতি এবং বিশ্বকল্যাণ কামনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আপনার সফলতা যে কিছুতেই আহরণ করিতে পারে না, আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য কুশলতা সহকারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিণাম দেখাইয়া এই কথাটাও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ... [বঙ্কিম সাহিত্য', নবযুগের বাংলা]।

সাহিত্যিক-রাজনীতিক রমেশচন্দ্র দত্ত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় *আনন্দমঠ*-কে এর 'বিস্ময়কর রাজনৈতিক তাৎপর্যের' জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মনে করেছেন বঙ্কিম শুধু দেশজননীর মূর্তি তৈরি করে দেশবাসীদের দানই করেন নি, প্রাণ দিয়ে এতে প্রেরণাও সঞ্চার করেছেন। তিনিই স্বদেশমাতাকে দেখলেন ও চিনতে পারলেন, দেশবাসীকে ডেকে বললেন—'দেখ, এই আমাদের মা, এঁর আরাধনা করো, স্বগৃহে এঁকে প্রতিষ্ঠা করো।' যে গান তিনি গাইলেন, তা এই সুজলাসুফলা শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা মাতৃকার বন্দনাগান কিন্তু আমরা বধির, সেই গান শুনতে পেলাম না, অন্ধ আমরা দেখতে পেলাম না তাঁর মাতৃমূর্তি! [১৯১৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ]।

পরবর্তীকালের আর একজন সর্বভারতীয় নেতা মোহনদাস গান্ধি স্বদেশি আন্দোলনে এই গানের প্রেরণা দেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, অচিরেই এই গান সারা ভারতের জাতীয় সংগীত হবে। 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ান'-এর পাতায় গান্ধি লেখেন, অন্যান্য দেশের জাতীয় সংগীতের চেয়ে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত বেশি মিষ্টি ও এর ভাব মহত্তর। অন্যের প্রতি অপমানের ভাব প্রচারের ত্রুটি থেকে এ গান মুক্ত, এর একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের স্বদেশপ্রেম জাগানো। 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ গান্ধি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে এ গানের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই। তিনি যখন বালক, *আনন্দমঠ* বা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, তখন থেকেই 'বন্দে মাতরম্' তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে আসছে। একবারও তাঁর মনে হয়নি যে এটি শুধু হিন্দুদের জন্য রচিত সংগীত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যতদিন জাতি থাকবে, 'বন্দে মাতরম্'-এর মৃত্যু হবে না। ধ্বনি হিসেবেও 'ভারতমাতা কী জয়' এর চেয়ে 'বন্দে মাতরম্'-ই গান্ধির কাছে বেশি পছন্দসই ছিল, কারণ তাঁর কাছে এটা ছিল বাংলার ভাবগত ও বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠতার স্বীকৃতি।

১৯০৬ সালে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনীতে জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত বলেন যে :

> যখন বঙ্গদেশ গভীর শোকে আচ্ছন্ন, তখন লাট ফুলার গোর্খা সৈন্য ও পিটুনি পুলিশ এনেছেন, প্রকাশ্যস্থানে পবিত্র 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছেন ; যার ধমনিতে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হয় সে কি এ অবস্থায় হৃদয়ভার চেপে রাখতে পারে?

এই বরিশাল সম্মিলনীতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিয়ে তুমুল কাণ্ড বাঁধে, কিশোর চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা পুলিশের লাঠিতে অবিচল থেকে 'বন্দে মাতরম্' শ্লোগান দিতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়। স্মরণীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের গান ঃ 'আমার যায় যাবে জীবন চলে / জগৎ মাঝে সবার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।' এ ছাড়াও 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি গানের মধ্যে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মুকুন্দ দাস। কে নয়? কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তো 'বন্দে মাতরম্' এর সংস্কৃত অংশ বাংলা কবিতায় অনুবাদও করেন।

বরিশাল সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম অরবিন্দ ঘোষ ইংরেজিতে 'বন্দে মাতরম্' অনুবাদ করেছিলেন *কর্মযোগিন্* পত্রিকায় ১৯১০ সালে। এই গদ্যানুবাদের সাথে অরবিন্দের টীকা : —'এই জাতীয় সংগীতের মধ্যে মাধুর্য, নিষ্কপট সরলতা ও বিরাট কবিত্বশক্তির যে অসাধারণ সম্মিলন ঘটেছে তাকে কবিতায় ভাষান্তরিত করার সব প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই গদ্যানুবাদ। বঙ্কিমের মহাপ্রয়াণের পর অরবিন্দ *ইন্দুপ্রকাশ* পত্রিকায় যে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশ করেন তাতেও ছিল 'বন্দে মাতরম্'-এর আদর্শেরই উল্লেখ :

> ... তাঁর দিব্যদর্শনে প্রতিভাত দেশমাতৃকার হাতে ভিক্ষাপাত্র ছিল না, তিনি তাঁর দ্বিসপ্তকোটি ভুজে ধরেছিলেন খরকরবাল। ... [১৮৯৪]।

এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের জন্যই অরবিন্দের চোখে বঙ্কিম 'নবজাগরণের প্রেরণাদাতা ও রাজনৈতিক গুরু' [বন্দে মাতরম্ পত্রিকার প্রবন্ধ ১৬.৪.১৯০৭]। তাঁর মতে এই দেশমাতার রূপকল্পনাই বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ দেশসেবা।

একটা সময় পর্যন্ত আমাদের দেশের রাজনীতিকরা যে সাধারণভাবে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সেটা আমাদের পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে বোঝা যায়। এমনকি বিদেশি মার্কুইস অব জেটল্যান্ড পর্যন্ত *আনন্দমঠ*-কে বলেছিলেন 'প্যারাবল অব প্যাট্রিয়টিজম'। আমাদের কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা অবশ্য এই সংগীত সম্পর্কে মিশ্রমতামত পোষণ করেছেন। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চোখেও বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃবন্দনার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি :

> বঙ্কিমবাবু যাহা করিয়াছেন ... সব গিয়া একপথে দাঁড়াইয়াছে সে পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালোবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। ... সুতরাং তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র বন্দেমাতরম্। [বঙ্কিমচন্দ্র]

১৯৩৭ সালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তাড়নায় 'বন্দে মাতরম্' বিরোধী প্রচার তুঙ্গে উঠেছিল, বিশেষ করে দেশজননীর দুর্গামূর্তিধ্যান একশ্রেণির মুসলিমের আপত্তির কারণ হয় ও এই আপত্তি অনেক অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ও নেতার সমর্থনও পায়। 'বন্দে মাতরম্' বিরোধিতার এই আন্দোলনে অবশ্যই মূল প্রেরণা ছিল মুসলিম লিগের রাজনীতি। মাদ্রাজ ব্যাবসা পরিষদে শেখ মহম্মদ লালজান নামে এক সদস্য বললেন, ইসলামকে অপমান করবার জন্যই ইসলাম বিরোধী হুংকাররূপে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হয়ে থাকে। মুসলিম লিগ লখনউতে 'বন্দে মাতরম্' ইসলাম বিরোধী, এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল, যা উত্থাপন করেন বাংলার মৌলানা আক্রাম খাঁ। আবার স্বদেশি আন্দোলনের সময় জনসভায় কোরান ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আলোচনা করে তিনিই বলেছিলেন 'বন্দে মাতরম্' ইসলামিক ধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এর কৈফিয়ৎ হিসেবে আক্রাম খান্ জানালেন, স্বদেশীযুগে উৎসাহের আবেগ এবং অবজ্ঞায় মুসলিমরাও হিন্দুদের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়েছে, বুদ্ধি ও চেতনাসম্পন্ন দায়িত্বশীল কোনো মুসলিমের পক্ষে আজ আর এ গানে যোগ দেওয়া অসম্ভব নয়।

মুসলিম রাজনীতির ভেতরের কথা জানা যায় জাতীয়তাবাদী লেখক ও দেশসেবী ডা. রেজাউল করিমের স্মৃতিচারণে :

> ... বেশ পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যেত, লিগ চায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা কাউন্টার মুভমেন্ট। আমার বেশ মনে পড়ছে এ কথাটা আমি মৌলনা আক্রাম খাঁর মুখেই শুনেছিলাম। ... তাঁরা সবাই জিন্নাসাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে ... নানা অভিযোগ লিখতে লাগলেন। ... একজন লিগ নেতা বলে উঠলেন, 'আর একটা আপত্তিকর জিনিস আছে—সেটা হল বন্দে মাতরম্।' তখন জিন্না সাহেব বলে উঠলেন—'বন্দে মাতরম্' কেয়া চিজ হ্যায়? তখন জিন্না সাহেবকে জানালেন 'বন্দেমাতরম্' এমন একটা গান যা মুসলমান সমাজকে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলবে। এ গানের কথা প্রচার করে আমরা দেশব্যাপী লিগের ঝান্ডা ওড়াব। ...

এসবেরই পরিণতিতে কংগ্রেস নেতারা জাতীয় সংগীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদে প্রস্তাব নিতে বাধ্য হন ও দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এসময় কংগ্রেস নেতারা রবীন্দ্রনাথেরও মতামত গ্রহণ করেন। এক সময় 'বন্দে মাতরম্'

দেশবিদেশে নানাস্থানে রবীন্দ্রনাথ নিজেই গেয়েছেন, বিপিন পালের মতোই মনে করতে চেয়েছেন 'বন্দে মাতরম্' বিশ্বমাতার বন্দনা, কিন্তু পরে তিনি ক্রমশ এই ভাবধারা থেকে সরে আসেন, অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বীকার করেন যে 'কর্তারা' বাঁশি ছেড়ে লাঠি ধরার হুকুম দিলেও সবার ওপরে এক 'বাঁশিওয়ালা মিতা' আছেন—"আমায় বন্দেমাতরং ভুলিয়েছেন ঐ তিনি। ...

১৯৩৭ সালে অবশ্য নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতার সঙ্গে আলোচনার পর বন্দে মাতরম্ জাতীয় সংগীত হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথ যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি এর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অভিযোগ স্বীকার করেননি। তবে তিনি বিশেষ ভাবে সুপারিশ করেন গানটির প্রথম স্তবকের ভক্তি ও কোমলতার ভাবের ও 'ভারতমাতার সুন্দর রূপ বর্ণনার'। তাঁর পিতৃদেবের এক-ব্রহ্মবাদের প্রভাবে সমগ্র সংগীতটির প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা ছিল না এ কথাও উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ মুক্তিসংগ্রামে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির ভূমিকা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করেন। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন অবশ্যই কর্তিত সংগীতটির প্রথম স্তবকের দিকেই :

> ... কিন্তু আমি অনায়াসে স্বীকার করি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি যদি উহার অন্যান্য ইতিহাসের সহিত পড়া যায় তাহা হইলে উহার এমন অর্থ করা যায় যাহার ফলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় সংগীত যদিও সমগ্র সংগীত হইতে গৃহীত দুইটি প্যারা মাত্র, তথাপি উহা যে-কেন সমগ্র সংগীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, তাহার যুক্তিসংগত কোনো কারণ নাই। উহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে এবং উহার নিজস্ব এমন একটা উদ্দীপনাময় বৈশিষ্ট্য আছে যাহা আমার মনে হয় কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মনে আঘাত করে না। [আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০.১০.১৯৩৭]

'বন্দে মাতরম্' সংগীত দুর্গামূর্তির রূপকল্পই যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আপত্তির কারণ সেটা বোঝা যায় সুভাষচন্দ্রকে লেখা তাঁর এইসব মন্তব্য থেকে :

> বন্দে মাতরম্ গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব এ কথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে তর্ক চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলাদেশের সঙ্গে দুর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশ-ভুজামূর্তিরূপের যে পূজা যে-কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারে না। ... আনন্দমঠ উপন্যাসটি সাহিত্যের বই, তার গানের সুসংগতি আছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সার্বজনীন ভাবে সংগত হতেই পারে না। ... (১৯.১০.৩৭)

এ সময় 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় লেখা একটি প্রবন্ধের সূত্রে এনিয়ে বুদ্ধদেব বসুর সাথে

রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন :

> ... বন্দে মাতরম্ ব্যাপারটা নিয়ে বাঙালি হিন্দুসমাজে যে উন্মত্ত বিক্ষোভের আলোড়ন উঠেছে আমার বুদ্ধিতে এ আমি কখনো কল্পনাও করিনি। ... স্লোগানের কথা উল্লেখ করেছে, ...তর্কটা হচ্ছে এ নিয়ে যে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন কোনো গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয় কিন্তু মুসলমান খ্রিস্টান—এমনকি ব্রাহ্মও—শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। তুমি কি বলতে চাও, 'ত্বংহি দুর্গা', 'কমলা কমলদল বিহারিণী' 'বাণীবিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি হিন্দু দেবীনাম ধারিণীদের স্তব, যাদের 'প্রতিমা পুজি মন্দিরে মন্দিরে,' সর্বজাতিক গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করতেই হবে? ... যাদের ধর্মে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোনো অর্থই নেই। ... (১৮.১২.৩৭)

এর জবাবে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে জানান যে, 'বন্দে মাতরম্' গানটি সমগ্রভাবে 'অহিন্দু ভারতের একেবারেই অযোগ্য', 'ত্বংহি দুর্গা' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি প্রগতিপন্থী হিন্দুরও গ্রহণযোগ্য নয়, সমস্ত রচনাটির মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' বাক্যটিই শুধু মূল্যবান ইত্যাদি। যাই হোক 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদ অনেককেই ব্যথিত করেছিল, দিলীপকুমার রায় লিখেছেন 'বন্দে মাতরম্'-এর এই অবমাননায় আমরা গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। ..." রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথেরই মতো ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেও, তিনি লেখেন :

> ... গানটি যে মুসলমান বিদ্বেষ প্রসূত বা মুসলমান বিদ্বেষজনক নহে সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, মুসলমানদের নিন্দা ইহাতে দূরে থাক ইহাতে মুসলমানদের উল্লেখ পর্যন্ত নাই। বরং ইহাতে মুসলমানদিগকেও মাতৃভূমির সন্তান বলিয়া ধরিয়া জন্মভূমি যে সংঘশক্তিতে বলিয়সী তাহাই বলা হইয়াছে। ... [অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪]

অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব নেবার পর কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশন উদ্‌বোধন করে জওহরলাল নেহরু বলেন, অনেক ভেবেচিন্তেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গানের শেষাংশে যেসব পৌরাণিক উপমা ও আদর্শ রয়েছে তা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী, 'বন্দে মাতরম্'-এর অন্যতম সুরকার দেশনেত্রী সরলাদেবী চৌধুরাণীরও কিন্তু 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গহানি পছন্দ হয়নি,—"আজ কংগ্রেস High Command থেকে কাটাছাঁটা 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার হুকুম বেরিয়েছে। তা হোক। হালফ্যাশানের ছাঁটা কুন্তলেও 'বন্দে মাতরম্' তার তেজ ও দীপ্তিরসে ঢলঢল করছে।" [জীবনের ঝরাপাতা]। এখানে বলে নেওয়া যায়, নানা যুগে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের সুরকার ও গায়কের তালিকায় আছে প্রিয়নাথ কথক, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী,

দিলীপ কুমার রায়, তিমিরবরণ প্রভৃতি অনেক ভাস্কর নাম।

'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম অবশ্য তত সচেতন নন, এটা তাদের কাছে অনেকটা ইতিহাসের সামগ্রী। তবু এদেশের সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা সম্ভবত কেউই আর 'বন্দে মাতরম্'কে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক গান বলে মনে করেন না। অতীত যুগের ড. রেজাউল করিম আজও আমাদের মধ্যে আছেন, তাঁর মতে দেশকে মাতারূপে বন্দনা করা কখনোই ইসলামবিরোধী ব্যাপার নয়, 'বন্দে মাতরম্' এর আদর্শ ও তাই ইসলামের কাছে দূষণীয় হতে পারে না। বরং দেশকে দুর্গারূপে কল্পনা করতে অনেক হিন্দুরই আপত্তি হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতে একজন প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিক, স্বদেশ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে একটা রূপক গ্রন্থ লিখেছেন, সেটা নিয়ে এত মাতামাতির কি কারণ থাকতে পারে? একটা গান গাইলেই কি কোনো ধর্মের আদর্শ নষ্ট হয়? তার মতে 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে আর কোনো বিরোধ নেই, একদা যে আন্দোলন হয়েছিল তা ছিল মুসলিম লিগের পরিকল্পিত ব্যাপার, যাতে ইন্ধন যুগিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক এ ডবলু মাহমুদ মনে করেন, পৌত্তলিকতা বড়ো আর্টের একটি উৎস, দেশকে দেবী হিসেবে বন্দনা করলে যে কারও ধর্মচেতনা আহত হতে পারে, তা তিনি ভাবতেই পারেন না। *আনন্দমঠ* বইটি পড়লে অবশ্য মুসলিম পাঠক ক্ষুব্ধ হতে পারেন এরকম মনে করলেও অধ্যাপক মাহমুদের মতে এটি একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস, যা ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'বন্দে মাতরম্'-এর কাব্যগুণ ও সংগীতময়তা অপূর্ব বলেই তিনি মনে করেন। আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে, অন্যতম আবদুল জাব্বার মনে করেছেন যে 'বন্দে মাতরম্' যদি 'নিপীড়িত হিন্দু চিত্তে' পরাধীনতার শৃঙ্খলছিন্ন করতে প্রেরণা জোগায়, তবে তার যে একটা মূল্য আছে, সেটা মুসলমানদের স্বীকার করতেই হবে। কবিরুল ইসলাম মনে করেন, *আনন্দমঠ*-এ 'যৎসামান্য ইন্ধন' ছিল, কিন্তু সেটা শুভবুদ্ধি নিরপেক্ষ পাঠককে ক্ষিপ্ত করার মতো যথেষ্ট নয়। মুসলিম লিগের রাজনৈতিক প্ররোচনাতেই স্পর্শকাতর মুসলিমরা ভুল বুঝেছিল। তিনি মনে করেন, ওই দুঃসময়ে মাথা ঠিক রেখে রেজাউল করিম যা ভেবেছিলেন, সম্ভবত তাই ঠিক :

> আনন্দমঠে স্বদেশপ্রীতির যে করুণ আবেদন রহিয়াছে, তাহা প্রত্যেক পাঠকের মর্মস্থল স্পর্শ করিবে। মুসলিম বিদ্বেষ তাহার নিকট বড়ো বলিয়া মনে হইবে না। ['বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ']

'বন্দে মাতরম্' সংগীতের কাব্যসুষমা সম্পর্কে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই আলোচনা করেছেন ও করবেন। ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের একটি ইতালীয় সংগীতের কথা মনে

হয়েছে বঙ্কিমের মাতৃকল্পনার পূর্ণ মাধুর্য উপলব্ধির জন্য। আবার সাধারণ মানুষের কাছে এর মূল্য অবশ্যই এর সঙ্গে জড়িত মুক্তি সংগ্রামের ভাস্বর অধ্যায়গুলোর জন্য। এ ছাড়া এর আলাদা আবেদন থাকতে পারে হয়তো আরও কিছু জনসমষ্টির কাছে লক্ষ্মী-সরস্বতী সহ মহিষমর্দিনী দশভুজা দুর্গার রাজসীরূপ যাঁদের চিত্তে ভক্তির তরঙ্গ তোলে। সব মিলিয়ে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের স্থান যে অনন্য তা অস্বীকার করা যায় না। এই 'বন্দে মাতরম্' সংগীত রচনার শতবর্ষে প্রয়াত মনীষী প্রবোধচন্দ্র সেন তাই সখেদে লিখেছিলেন যে এই শতবর্ষ পূর্তির কথা :

> আত্মকলহে মত্ত বাঙালি যেন ভুলেই গেছে। প্রতি বছর কত রকম শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এই জাতীয় জাগরণ মন্ত্রের শতবর্ষ পূর্ণ হল উপেক্ষা ও নীরবতার মধ্যে। ৮

উল্লেখপঞ্জি :

১. *মুক্তির সন্ধানে ভারত* : যোগেশচন্দ্র বাগল

২. *ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ* : প্রবোধচন্দ্র সেন

৩. *জীবনের ঝরাপাতা* : সরলাদেবী চৌধুরাণী

৪. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলি* : ২য় সম্ভার (বঙ্কিমচন্দ্র)

৫. *রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র* : নেপাল মজুমদার

৬. 'ভূমিকা' : সদানন্দ ভট্টাচার্য
আনন্দমঠ, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

৭. 'শতবর্ষের আলোয় বন্দে মাতরম্' : মানস ভট্টাচার্য,
যুগপত্র, ১৬ জুন, ১৯৮১

৮. 'আনন্দমঠ : শতবর্ষের আলোয়' : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়,
পরিবর্তন ; ১১ আগস্ট ১৯৮২

৯. 'শতবর্ষের আলোকে আনন্দমঠ' : গোপালচন্দ্র রায়
দেশ, ৩ জানুয়ারি ১৯৮৩

১০. 'বন্দে মাতরম্ : শতবর্ষ' : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
দেশ, ১৪ আগস্ট ১৯৭৬

১১. 'বন্দে মাতরম বিষয়ক রচনা'
আনন্দবাজার পত্রিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ক্রোড়পত্র, ১৯৭১

১২. 'হিন্দুত্ব নয়—মানবতা' : আবদুল জব্বার
পরিবর্তন, ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩

১৩. 'শেক্সপীয়র তা হলে ইহুদি বিদ্বেষী' : কবিরুল ইসলাম
পরিবর্তন, ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩
১৪. এ. ডবলু মাহমুদের সাক্ষাৎকার : লাডলীমোহন রায়চৌধুরী
পরিবর্তন, ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩
১৫. ড. রেজাউল করিমের সাক্ষাৎকার : শিখারাণী কুণ্ডু
পরিবর্তন, ১১-১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫
১৬. 'বন্দেমাতরমে'র ঢেউ বিদেশের তটে : শিশির কর
'রবিবাসরীয়', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৭
১৭. 'বাঙলা, বাঙালি ও গান্ধিজি' : ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
দেশ, ১৮ আশ্বিন ১৩৭৬
১৮. 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বুদ্ধদেব বসু পত্রাবলি'
দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮১
১৯. সংবাদ ও প্রবন্ধাবলি
অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৯-৩০ অক্টোবর, ১৯৩৭
২০. *তীর্থঙ্কর* : দিলীপকুমার রায়
২১. 'অরবিন্দের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র' : আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার
দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮১

বন্দে মাতরম্ ও আনন্দমঠ রচনার পটভূমি ও পরবর্তী পরিস্থিতি

সুমিত্রা পাল

১৫ আগস্ট, ২০০৭। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৬০ বছর পূর্ণ হয়েছে। দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে আজও আমরা বলে উঠি 'বন্দে মাতরম্' অর্থাৎ হে দেশমাতৃকা, তোমায় বন্দনা করি! এই ধ্বনি বা সংগীত যা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মুখ্য প্রেরণা ছিল, তা গাওয়া নিয়ে বিবাদ আজও চলে আসছে।

গত সাত সেপ্টেম্বর ২০০৬ ধুমধাম করে 'বন্দে মাতরম্' গানের শতবর্ষ পালন হয়। সারা দেশ জুড়ে অনেকেই গাইলেন এই গান। দেশভক্তির এক সুন্দর দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গান গাওয়া নিয়েও হয়েছিল এক বিবাদ, বিতর্ক। কেউ কেউ বলেন, সমস্ত স্কুলে বাচ্ছাদের দেশভক্তির এই গান গাওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। আবার অনেকে প্রশ্ন রেখেছিলেন, বাধ্যতামূলকভাবে এই গান গাওয়া কী সত্যিই এক পেট্রিওটিক ডিউটি?

এই গান গাওয়া নিয়ে আছে এক জটিল, বিতর্কমূলক ইতিহাস—১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের সুরারোপিত এই 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাইলেও, পরে তিনি লেখেন যে :

> The core of Vande Mataram is a hymn to the Goddess Durga ; this is so plain that there can be expected patrioticaly to worship the ten-handed deity as Swadesh.

এই গানের পদগুলি নিম্নরূপ :

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্।
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্।

সুখদাং বরদাং মাতরম্।।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কলনিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণীবিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং

নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।'

মুসলিম সমাজ এই গানের বিরদ্ধাচরণ করায় কংগ্রেস ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সিদ্ধান্ত নেয় যে শুধুমাত্র গানের প্রথম দুটি চরণ, যেখানে মাতৃভূমির প্রতি দেবী দুর্গার মহিমা আরোপণের প্রসঙ্গ নেই, সেই দুটি চরণই গাওয়া হবে জনসমক্ষে। তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ চলে আসছে অবিরাম। আর তাই গত বছর সাত সেপ্টেম্বর সরকার এই গানের শতবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নিলেও আবার ওঠে আলোড়ন। যদিও কালচারাল মিনিস্ট্রি থেকে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করায় আলোড়ন পরে স্তিমিত হয়ে যায়।

তবে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ 'বন্দে মাতরম্' গানের শতবর্ষ ছিল না। গানটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন ১৮৭০-এর পরে যে-কোনো এক সময়ে। ১৮৭৫ সনে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় কবিতা বা গানটি প্রথমবার ছাপা হয়েছিল। এর ছবছর পর থেকে এই একই পত্রিকায় *আনন্দমঠ* উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে

থাকে। এবং তারও এক বছর পরে *আনন্দমঠ* উপন্যাস যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন 'বন্দে মাতরম্' গানটি তাতে যুক্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাংলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর। ঔপনিবেশিক শাসনের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে তিনি বেশ অবহিতও ছিলেন। দেশের মানুষের মনে লেখনীর মাধ্যমে এক জাতীয়তাবাদের বোধ জাগ্রত করারও স্বপ্ন হয়তো দেখেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকেরা প্রাক্ ইসলামিক ভারতের স্বর্ণযুগ এবং প্রগতিশীল ব্রিটিশ শাসনের মাঝখানের মুসলিম শাসনকালকে এক 'অন্ধকার যুগ' বলে সাফল্যের সঙ্গে চিত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক মনে এই অন্ধকার যুগের একটা প্রভাব তো ছিলই ; আবার বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার শাসনের ঠিক পরবর্তী সময়ের মুসলিম শাসকদের অত্যাচার পর্বেরও ক্ষোভ ছিল। আর এই অত্যাচার পর্বের সময়টুকুই *আনন্দমঠ* রচনার পটভূমি।

তা ছাড়াও 'বন্দে মাতরম্' গান ও *আনন্দমঠ* উপন্যাস রচনার সরাসরি অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে ১২৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দের বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং পাবনা-সিরাজগঞ্জ জেলার য়ুসুফশাহি পরগনার 'কৃষক আন্দোলন', যা ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। কৃষকদের এই দুঃখদুর্দশা তাঁকে ইংরেজদের প্রতি ক্রোধান্বিত করে তুলেছিল। সমান্তরালভাবে ঠিক সেই সময় সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহও তাঁর মনে প্রচণ্ড রেখাপাত করে।

আনন্দমঠ উপন্যাসের মূল উপজীব্য ছিল দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ব্রিটিশ এবং মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল স্বদেশভূমির এবং স্বদেশবাসীর হৃতসম্মান ও হৃতগৌরব পুনরায় ফিরে পাওয়ার, অনাহুতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর, উঠে দাঁড়ানোর। যা উনিশ শতকের শেষের দিকে পরাধীন মানুষের মনে, বাঙালিদের মনে এক অসীম দেশপ্রেমের চেতনা সঞ্চার করেছে, এক একসূত্রীকরণের কাজ করেছে, তাদের চিন্তা-ধারণাকে অসীম বলে বলীয়ান করে তুলেছে। যাদেরকে সেই কিছুদিন আগেও Thomas Macaulay বর্ণনা করেছিলেন, 'effete, effeminate, vaporous, swooning Bengali' বলে।

আনন্দমঠ প্রকাশিত হওয়ার পরেই 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি হয়ে ওঠে এক অদ্ভুত মন্ত্র। এই মন্ত্রের তেজে বলীয়ান হয়ে ওঠে প্রতিটি বাঙালি। তারপরে প্রতিটি ভারতবাসী। শব্দটি ওঠে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অদ্ভুত প্রেরণা। বিশেষ করে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সময় এই গানটি আরও বিস্তৃতভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে টাউন হলের এক সভায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ মহান দেশনায়কদের উপস্থিতিতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলে তাঁরা স্বাধীনতার শপথ নেন, আর রাজনৈতিক

শ্লোগান হিসাবেও এই শব্দটিকে জনসমক্ষে প্রথমবার তুলে ধরা হয়।

জুলিয়াস লিপনার বঙ্কিমচন্দ্রের এই *আনন্দমঠ* উপন্যাসের অনুবাদ ('The Sacred Brotherhood') করতে গিয়ে ভূমিকায় লেখেন যে :

> The chanting (during the August 7, 1905, protest procession against the impending decision in Calcutta) was not confined to Hindus ; people of all communities were reported to have been involved.

উদ্দীপিত করে তুলেছিল এই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীকে যার অনেকখানি শ্রেয় আদায় করে নেয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ৬ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ দ্বারা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্'। একসূত্রে গ্রথিত হয় সমস্ত ভারতবাসী। দীক্ষিত হয় জাতীয়তাবাদের বোধে। আর এই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান-শিখ ... কত দেশভক্ত।

আজ তাই 'বন্দে মাতরম্'—এই ওজস্বী ধ্বনি বা সংগীতকে ঘৃণ্য দলাদলির মাঝখানে ঠেলে না দিয়ে, নিখাদ দেশবন্দনার মন্ত্র করে গুঞ্জিত হতে দিই আমাদের প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র : বহরমপুর

অরবিন্দ সরকার

চাকরি সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তখনকার বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অর্থাৎ এখনকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং অধুনা বাংলাদেশের একাধিক জেলায় অবস্থান করেন। এর মধ্যে মুরশিদাবাদ জেলার বহরমপুরে থাকেন চার চারটি বছর। এই সময়টি যেমন বঙ্কিম-জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চরম এবং পরম সন্ধিক্ষণ। আবহমানের বাংলা সাহিত্যধারার ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে গৌরবময় ওই চুয়ান্নমাস স্বর্ণখচিত সময়।

১৮৬৯-৭৪ খ্রি. পর্যন্ত তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বহরমপুরে পোস্টেড থাকাকালীন সময়ে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বহরমপুর থেকে মাসিক *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর গুছিয়ে বললে বলতে হয়—১নং পিপুলপট্টি লেন কলকাতায় 'সাধারণী যন্ত্র' হতে *বঙ্গদর্শন* ছাপা শুরু হয় এবং প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১২৭৯ (ইং. এপ্রিল ১৮৭২ খ্রি.) ব্রজমাধব বসু কর্তৃক বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নিবিষ্টতম এবং মধুরতম ঐতিহাসিক ঘটনা। একদিকে জোয়ার এল নিবন্ধ সাহিত্যে, সমালোচনা সাহিত্যে অন্যদিকে রস রচনা সাহিত্যে—সর্বোপরি দেশপ্রেম উন্মেষের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই পত্রিকার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বঙ্কিমের কলমে ফুটে ওঠে মানবমনেব অনন্ত ভাণ্ডার। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় ঃ সকলপ্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্যক স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি এবং বিশুদ্ধিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে আহ্বান রাখলেন বাঙালি সমাজে [বাঙালি কৃতবিদ্য সমাজ] বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। এই বহরমপুরে থাকাকালীন সময়ে *বঙ্গদর্শন*-এর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করলেন *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* (১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৪), *রহস্যপ্রবন্ধ* (১৮৭৪)। যশস্বী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র এক শুভপ্রাতে আলোকসামান্য সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র রূপে আবির্ভূত হলেন। চারিদিকে সাজ সাজ রব। তাঁর *বঙ্গদর্শন*-কে কেন্দ্র করে ওই সময়ে গণজাগরণের সৃষ্টি

হল। সারা বাংলায় শিক্ষিত মহলে সেই ঢেউ বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ল।

ওই সময়েই বহরমপুরে সেকালের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের মহামিলন উৎসব বর্ণাঢ্যভাবে শুরু হয়ে যায়। একদিকে রেভারেন্ড লালবিহারী দে, প্রত্নতাত্ত্বিক রামদাস সেন, রামগতি ন্যায়রত্ন, লোহারাম শিবরত্ন, এ্যাডভোকেট অক্ষয়কুমার সরকার, প্রিন্সিপ্যাল রবার্ট হ্যান্ড, অন্যদিকে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রমুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে চাকরিসূত্রে ছিলেন চার বছর ছয় মাস অর্থাৎ ১৮৬৯-এর ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৭৪-এর মে মাস অব্দি। এখন বহরমপুর শহরে যে রোডের নাম হয়েছে ১১৫ নং বনবিহারী সেন রোড, তার দোতলায় বিশাল হল ঘরে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রামদাস সেনের পাঠাগারটি ছিল যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাবিদ বঙ্কিমচন্দ্রের সারস্বত সাধনার কর্মস্থল। রামদাস সেনের পরম যত্নে গড়া লাইব্রেরি কক্ষটি বঙ্কিমচন্দ্রের উজ্জ্বল উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্রখ্যাত গুণিজনের সমাবেশে হয়ে উঠত মৌনমুখর সাহিত্যচর্চার একটি অমলিন মিলনকেন্দ্র। উল্লেখ্য যে, এই চর্চাকেন্দ্রটি সেই সময় বহরমপুর এমনকি বাংলার বিশিষ্ট একটি সাহিত্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সৃষ্টির যাবতীয় পরিকল্পনা এই লাইব্রেরিকে ঘিরে গড়ে ওঠে। ওই পাঠাগার ছাড়া বহরমপুরে আর দুটি জায়গায় তাঁকে কেন্দ্র করে সাহিত্যবাসর বসত (১) দীনবন্ধু সান্যাল-এর আবাস যেটিকে বঙ্কিমের গৃহ বলেই সকলে জানত। এবং (২) গ্রান্ট হল [বর্তমানে এই নামে পরিচিত]।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যে বাড়িতে থাকতেন তা হল রামদাস সেনের আবাসগৃহ ও পাঠাগারের কাছাকাছিই বলা যায়। এখনকার বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির ১২ নং ওয়ার্ড-এর অন্তর্গত রাধারঘাটে ভট্টাচার্যপাড়ার যোগমায়া বাড়ির [৬নং দীনু স্যানাল লেন] একটি ঘরে তিনি থাকতেন। এই ঘরটি দীনু সান্যালের বিরাট বাড়ির উত্তর দিকের একটি বড়োসড়ো ঘর। এই যোগমায়া বাড়ির দক্ষিণ দিকে অতিপ্রাচীন কাশীনাথ শিবের মন্দির এবং খোলামেলা একটি বিশাল উঠোন। পূর্বদিকে একটি পুকুর, এখনো বেড়াতে গেলে বোঝা যায় সেখানে পুকুরটির অবস্থান ছিল। ওরই একান্ত নিকটে ভাগীরথী-গঙ্গানদীর রাধার ঘাট যা সকলের বিশেষ পরিচিত।

এ ছাড়া আরও একটি বাড়িতে বঙ্কিমবাবু বেশ কিছুকাল থাকতেন বলে জানা যায়। তার অবস্থান হল বহরমপুর শহরের উত্তর দিকে। ঘাটবন্দর ও সৈদাবাদের মাঝামাঝি জায়গা, জোড়া শিবমন্দিরের খুবই কাছে। সেই গৃহের অস্তিত্ব এখন নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন চার বছর সম্পাদনার পর সরাসরি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন (১২৮২)। ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে মাঘ পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তেছিল শ্রীশচন্দ্র

মজুমদারের ওপর।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটে তাঁর মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সের সময়ে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সাহিত্যচর্চা অতুলনীয়। জন ও জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক ভাবনাচিন্তা সর্বত্রগামী। ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতে (দুর্গেশনন্দিনী ও রাজসিংহ) তিনিই পথ প্রদর্শক। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত ও আনন্দমঠ উপন্যাস রচনা তাঁর সৃষ্ট দেশপ্রেমের অত্যুজ্বল নিদর্শন। বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীরা 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করেই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক হাতে ছিল 'গীতা'—অন্যহাতে *আনন্দমঠ* এবং বন্দে মাতরম্ মন্ত্র। অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্'-কে 'vision of mother' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত এবং *আনন্দমঠ* উপন্যাস রচনার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষিত কী তা আজও অনুমান সাপেক্ষ বলে অনেকে মনে করেন।

প্রচলিত স্বীকৃত মতটি হল—'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের এক গৃহে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে এখন দ্বিমত দেখা দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন মুরশিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন—সেই সময় একদিন [১৮৭০ খ্রি. ১৫ ডিসেম্বর] পালকি চড়ে বহরমপুর স্কোয়ার ফিল্ড-এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যাচ্ছিলেন। তখন ওই মাঠে চলছিল ক্রিকেট খেলা। কর্নেল ডাফিন নামে এক ইংরেজ সাহেব [যিনি তখন ক্রিকেট খেলায় ব্যস্ত] চটে গিয়ে বঙ্কিমের পালকি আটকায় এবং চূড়ান্ত অপমান এমনকি প্রহার করে। তেজস্বী বঙ্কিম ওই ইংরেজ সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলার রায় বের হয় [১২ জানুয়ারি: ১৭৭৪] বঙ্কিমের সপক্ষে। বিচারক ন্যায্যভাবে কালা-আদমি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ওই ইংরেজ সাহেবকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে [বিপুল জন সমাবেশে] বাধ্য করেন।

আর এই মামলার সূত্র ধরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। তিনি তখন রাজ অতিথি হিসেবে লালগোলার রাজবাড়িতে অবস্থান করেন। সেই সময়ে একদিন তিনি দেখলেন, রাজবাড়ির উত্তরদিকের পথ স্পর্শ করে 'কলকলি' নামে একটি ছোটো নদী প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর দু-প্রান্তে দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্যরাজি। একটু দূরে পূর্বদিক দিয়ে বয়ে চলেছে পদ্মা আর ভৈরবী নদী। দুই নদীর মাঝে গভীর অরণ্য। আর অনন্ত প্রসারিত বালুকা খচিত তীরভূমি। এই অরণ্যভূমিতে অসংখ্য বট, পাকুড়, কদম, অশ্বত্থ, আম, জাম, আরও নানা প্রজাতির গাছ। এই নদীর তটে অবস্থান বহু সাধকের সাধনক্ষেত্র। ত্রিস্রোতার সঙ্গমস্থলেই ছিল তান্ত্রিকদের আড্ডা। বঙ্কিমচন্দ্র রাজবাড়ি-সংলগ্ন এই গভীর অরণ্যের মধ্যে দেবী জগদ্ধাত্রী মন্দির, ভয়ংকর শৃঙ্খলিত নগ্নিকা মহাকালী মন্দির এবং দশভুজা দেবী দুর্গার মন্দির দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। এখনও অবশ্য নীরব সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি দেওয়ালের ভগ্নস্তূপ।

বঙ্কিমচন্দ্র বনমধ্যস্থ রাজপথ ও কলকলি ক্ষেত্রটির হুবহু বর্ণনা দিয়েছেন *আনন্দমঠ* উপন্যাসে। তাঁর ভাষায় :

> আনন্দারণ্য হইতে বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষ প্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর একদিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ, একস্থানে অরণ্য, মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে, জল অতি পরিষ্কার নিবিড় মেঘের মতো কালো।

লালগোলার শৃঙ্খলিত আনন্দময়ী মা কালীর কোল ছুঁয়ে ক্ষুদ্র নদীটি 'কলকল' ধ্বনি তুলে প্রবাহিত হত। আজও এই নদীটি 'কলকলি' নামে পরিচিত। লালগোলার এই গভীর বনে সর্বালংকারভূষিতা দেবী জগদ্ধাত্রী মূর্তিটি নিঃসন্দেহে *আনন্দমঠ*-এর মা। এই বনের শৃঙ্খলিত নগ্নিকা কালীমূর্তিকে পরাধীন ও দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতের শৃঙ্খলিত মাতৃরূপে বঙ্কিম কল্পনা করেন এবং *আনন্দমঠ* উপন্যাসে কালীমূর্তির বর্ণনা—এর ভিত্তিতেই তিনি রচনা করেন।

এই শৃঙ্খলিত মার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশকে থাকতে দেখে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনবোধ দিয়ে উপলব্ধি করেন—এই কালীই হচ্ছেন দশপ্রহরণ ধারিণী দুর্গা। তাই তিনি 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে লিখেছিলেন—ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *আনন্দমঠ* মুখ্য যে তিনটি দেবী মূর্তির সঙ্গে বঙ্গজননীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ তুলনা করেছেন তা কোনো কাল্পনিক বা রূপক নয়, এই তিনটি মন্দির তিনি লালগোলার বনে তন্ত্র সাধনার সময় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, আজও এই তিনটি মন্দির কালের কবলে নষ্ট হয়ে যায় নি।

১২৮০ বঙ্গাব্দ। মাঘীপূর্ণিমা তিথি। প্রত্যেক বারের মতো এবারও লালগোলা রাজবাড়িতে সমবেত হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধুসন্তরা। সেই উপলক্ষ্যে রাজবাড়ির নাটমন্দিরে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। বহু সজ্জনমণ্ডলী উপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠ*-এ এই মাঘী পূর্ণিমা তিথিকেএক সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘীপূর্ণিমায় বিশালাক্ষি কালীমন্দিরের বেদীতলে ধ্যানে বসলেন শুদ্ধাচারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পূর্ণিমার আলোকে শোভিত স্নিগ্ধ দৃশ্য—ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মানসিক পটভূমিতে রচিত হল 'বন্দে মাতরম্' সংগীত। তাই এ বিষয়ে এখন নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে—১৮৭৬ এ চুঁচুড়া বা নৈহাটি নয়, ১২৮০ বঙ্গাব্দের (জানু-ফেব্রু ১৮৭৪) মাঘীপূর্ণিমার তিথিতে লাল গোলার এই বেদীতলে রচিত হয়েছে ভারতের জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্'। এ বিষয়ে অন্য একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে—তা হল এই, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত মূলত তাঁর মৌলিক রচনা নয়—এটি ওই সময়ের তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত

স্তোত্র থেকে নেওয়া—মূল রচনাকার কে তা এখনও জানা যায়নি। এ বিষয় নিয়ে এখনও গবেষণা করা যায়। তবে একটা কথা নিশ্চিত যে, মূল রচনাকার সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিলেও—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিবিষ্ট ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়ে ওই সংগীতের একটি সুসংস্কৃত রূপ দিয়েছেন—ভারতের সুমহান ঐতিহ্যকে মনে রেখে—সেখানেই আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকব।

আবার অন্য দিকে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে *আনন্দমঠ* উপন্যাসের জীবন্ত চরিত্রগুলি লালগোলা রাজবাড়ি সংলগ্ন গভীর বনের মধ্যে সাধুসন্তদের চরিত্র, যা বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষ করেছিলেন তাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রণ করেছেন। কেউ যদি ওই অঞ্চলে বেড়াতে যান এখন তিনি সেই বঙ্কিমের দেখা প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখার ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রতারিত হবেন না এটুকু আশা করা যেতে পারে।

পরিশেষে, বাংলা সাহিত্যের মহান কীর্তিমান পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন তথা সাহিত্যজীবনের সঙ্গে মুরশিদাবাদ এইভাবে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে—তাঁর মৃত্যুর শততম বর্ষে এসে বারবার আমাদের মধ্যে এ কথাটিই ফিরে আসে।

গ্রন্থঋণ :

১ জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ ১৩১৯, সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৩৭৮

২ 'ভূমিকা', *বঙ্কিম রচনাবলী* : যোগেশচন্দ্র বাগল, সংসদ

৩ 'ভূমিকা', *বঙ্কিম রচনাবলী* : গোপাল হালদার, রিফ্লেক্ট

৪ *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৭৯

৫ *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা : ২য় সংখ্যা, ১২৭৯

৬ *গণকণ্ঠ* : বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৪

৭ গণকণ্ঠ পাক্ষিক সংবাদপত্র, ১৭ বর্ষ সংখ্যা ১০, ১১

৮ *বীক্ষণ* পাক্ষিক সংবাদপত্র, মুরশিদাবাদ ১০ বর্ষ সংখ্যা, ১০, ১১, ১২

৯ শ্রীঅরবিন্দ-এর রচনাবলী : পণ্ডিচেরি আশ্রম

১০ রবীন্দ্র রচনাবলী : বিশ্বভারতী

ব্যক্তিঋণ : রমেন্দ্রনাথ রায়, সুদীপা বসু, প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, কিষাণচাঁদ ভকত, অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা সরকার, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার।

বন্দে মাতরম্ ও বঙ্কিমচন্দ্র

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী

'সাহিত্য সম্রাট' বিশেষণটির মধ্যে অনেকে প্রাচীন এবং গ্রামীণ গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু ১লা জানুয়ারী, ১৯৬৯ সালে বেমক্কা বঙ্কিমচন্দ্রের ডাকটিকিটটি প্রকাশ হতে, আনন্দের আবেগে সেদিন আমার ওই বিশেষণটিই মনে উদয় হয়েছিল। স্মরণে ছিল রবীন্দ্রনাথের উক্তি :

> বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যে যেখানে যাহা কিছু, অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

উল্লাসের সঙ্গে একটু বেদনাবোধও সেদিন আমাকে স্পর্শ করেছিল। জন্মতিরোভাবের তারিখ সম্পর্কশূন্য একটি দিন বঙ্কিমচন্দ্রের ডাকটিকিট প্রকাশের জন্যে কেন বেছে নিল ভারতীয় ডাকবিভাগ? অন্যতম জাতীয়-সঙ্গীত রচয়িতার একটি মাত্র ডাকটিকিটই বা মুদ্রিত হল কেন?

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের শতবর্ষ স্মরণ করে আর একটি ডাকটিকিট হাতে পেলাম ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের, ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে। বহুবর্ণ এই ডাকটিকিটে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম স্তবক মুদ্রিত হয়েছে।

ডাকটিকিট দুটি হাতে নিয়ে ভাবছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র দূর-প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার নদীতে একদিন জোয়ার বইবে। তাই তিনি জাতিকে জাগাবার মতো মন্ত্রের সন্ধানে ছিলেন। সেই মন্ত্র স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করল। *কমলাকান্তের দপ্তর* রচনাকালে (১৮৭৩) এই মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় বীজাকারে ছিল। কমলাকান্তও দেখেছিলেন 'চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিনী অনন্ত রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা

আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত বীরজন কেশরী শত্রু নিস্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রু মর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'

কমলাকান্ত দশভুজা দশপ্রহরণধারিণীকে দেখেছেন অতীতের মহিমময়ী রূপে। এতদ্ সত্ত্বেও 'একদিন দেখিব' বলে কমলাকান্ত যে আশা প্রকাশ করেছেন, বঙ্কিমও সেইরকম অতীতের উজ্জ্বল স্মৃতি নিয়ে স্থির থাকতে পারেননি। আগামী দিনের স্বাধীনতা লাভের প্রশ্নই তাঁকে বারবার উত্তেজিত করেছে। আজ থেকে একশ বছরেরও আগে কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে (সম্ভবত ১৮৭৫ খ্রীঃ) সৃষ্টি হল ভারতের জাতীয় মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'। যদিও এই মন্ত্রের সঙ্গে জাতির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল আরও কয়েকবছর বাদে *আনন্দমঠ* উপন্যাসটির মাধ্যমে (১৮৮০ খ্রীঃ)। পরাধীন অবস্থার জন্যে বঙ্কিমকে জাতীয় মন্ত্রপ্রচারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনীর অন্তরাল নিতে হয়েছিল। কিন্তু সত্যদ্রষ্টার কল্পনায় তিনি নিজের কন্যাকে একদিন বলেছিলেন যে, 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত নিয়ে বিশ ত্রিশ বছর বাদে বাঙলাদেশ উন্মত্ত হয়ে মেতে উঠবে। সেই ঋষিবাক্য সফল হয়েছে। পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত প্রথম সংস্করণ *আনন্দমঠ*-এর শেষে ছিল :

> ...সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল ; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সেকথা পরে বলিব।

এই অংশ পরবর্তী সংস্করণে সেকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা বুঝে পরিহার করা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে কথা বলেননি, ইতিহাস সে কথা বলেছে। উত্তাল বিদ্রোহ বহ্নির মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে।

অবশ্য স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা আমরা বঙ্কিমের আগেও পেয়েছি। ১৮৪৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন :

> জান নাকি জীব তুমি জননী জনম ভূমি
> যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।

এই কবিতা রচিত হবার একশ বছর বাদে ভারতমাতা শৃঙ্খলমুক্ত হল। রঙ্গলালের *পদ্মিনী উপাখ্যান* পাচ্ছি :

> যেদিন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন,
> অসংখ্য বীরের যিনি জন্মপ্রদায়িনী।

মধুসূদনও কাতর আর্তি জানিয়েছিলেন, 'রেখো মা দাসেরে মনে।' বোঝাই যায় যে এইসব উদ্ধৃত অংশে উদ্দিষ্ট 'মা' হল স্বদেশভূমি। ১৮৬৭ সালে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গানে, সমস্ত ভারতসন্তান মিলে মায়ের মুখ উজ্জ্বল করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই দেশমাতৃকার রূপ প্রথম ফুটিয়ে তুললেন 'বন্দে-মাতরম্' সঙ্গীতে।

দিব্যদৃষ্টির বলে কমলাকান্ত বুঝেছিলেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশমাতাকে উদ্ধার করতে হবে। বলেছিলেন :

> উঠ মা এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা।

কমলাকান্তের জননীকেই *আনন্দমঠ*-এর সত্যানন্দ দেখেছেন অনাগত যুগের দেশমাতৃকার মধ্যে। তাই মহেন্দ্র 'বন্দে-মাতরম্' সঙ্গীত শুনে ভবানন্দকে 'মাতা কে?' প্রশ্ন করলে, ভবানন্দ বলেছিলেন, 'আমরা অন্য মা মানি না, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী।'

কমলাকান্তের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল আনন্দমঠের সন্তানদল। নবাবী আমলের ছিয়াত্তরের (বাঙলা ১১৭৬ সন্) মন্বন্তরের পটভূমিকায় বঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে *আনন্দমঠ* রচিত হয়েছে। কিন্তু সেটি উপলক্ষ্য মাত্র। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকের শেষার্ধে ও অষ্টম দশকের গোড়ায় কয়েকটি গ্লানিকর রাজকীয় বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে সেকালীন শিক্ষিত বাঙালী সমাজ আন্দোলন শুরু করে। যেমন, সিভিল সার্ভিস, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতি। ভারতবর্ষের শাসনকেন্দ্র কোলকাতা থেকে স্বাভাবিক গতিতেই এই আলোড়ন বিভিন্ন প্রদেশে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। এই রকম সন্ধিক্ষণে *আনন্দমঠ*-এর জন্ম। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিক্ষোভ, রূপকচ্ছলে নবাবের অত্যাচারের বিপক্ষে বাঙালী সন্তানদলের বিদ্রোহে পরিণত হল। তাই সপ্তকোটি বাঙালী কণ্ঠ, পরবর্তীকালে ত্রিশকোটি ভারতীয় কণ্ঠের ভেতর বিলীন হয়ে গেল। দেশবাসীকে মাতৃমন্ত্রে জাগিয়ে তুললেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরের যুগে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের হাতে হাতে ঘুরে বেড়াত *আনন্দমঠ*। পুলিশ *আনন্দমঠ* দেখলেই কেড়ে নিয়ে যেত সেদিন।

স্বদেশী যুগে মুকুন্দরামের কণ্ঠে বেজে উঠেছিল,
"জাগো গো জাগো গো জননী,
তুই না জাগিলে শ্যামা আর কেহ জাগিবে না ;
তুই না নাচিলে মাগো,

নাচিবে না ধমনী।

কিংবা উল্লেখ করা যেতে পারে স্বামী বিবেকানন্দের সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর :

> ভুলিও না— তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! ....বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ......মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

এই প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে:

> আসে নাই ফিরে ভারত-ভাবতী?
> মা'র কতদিন দ্বীপান্তর
> পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল
> ক্রন্দন—দেড়শত বছর!

কিংবা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতা-সঙ্গীতের সেই উদ্দীপনাময় স্তবক :

> অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
> কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
> 'হিন্দু না ওরা মুসলিম' : ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
> কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্র এইভাবেই ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দেশে।

১৯২৯ সালে শরৎচন্দ্র 'তরুণের বিদ্রোহ' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বাধীনতা সম্পর্কে বাঙালির দান সম্পর্কে উল্লেখ করে প্রসঙ্গত বলেছিলেন, তাই 'বন্দে মাতরম্'-মন্ত্র সৃষ্টি এই বাঙলায়।' ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ-নায়ক সূর্য সেন পরিচালিত সাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকারের ঘোষণা কালে বলা হয়েছিল, 'বৃটিশ দস্যুর প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা নয়। বিশ্বাসঘাতক ও লুণ্ঠনকারী দল সমূলে নিশ্চিহ্ন হউক। সাময়িক বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবী হউক। বন্দে মাতরম্।'

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্কিমচন্দ্র* প্রবন্ধে (১৯৩৮) বললেন :

> দেশের প্রাণকে, দেশের আশা-আশঙ্কা শক্তি সাধনা সমস্তকে তিনি দেশমাতা-রূপে কল্পনা করেন—ভারতমাতা এই শব্দের মধ্যে যে ভাবজগৎ, যে চিন্তাধারা, চিত্রসম্পুট, যে

আত্মাহুতির স্পৃহা বিদ্যমান, তাহার আবাহনকারী বঙ্কিমচন্দ্র ; 'বন্দে মাতরম্' গান এই হিসাবে কেবল vers d' occasion অর্থাৎ সাময়িক উচ্ছ্বাসের প্রকাশক কবিতা নহে—ইহা ভারতের শাশ্বত মহিমার সামগান, ভারতের বাহ্য-প্রকৃতির, ভারতের সভ্যতার, ভারতের আত্মার উদ্বোধক রাষ্ট্রসঙ্গীত।

'বন্দে মাতরম্' বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর রচনাও (১৯৩৯ খ্রীঃ) আত্মশ্লাঘার সঙ্গে স্মরণীয় :

লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে এর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। বাঙলার ভেতরে এবং বাইরে সহস্র লোকের মধ্যে এই সঙ্গীত জাগিয়ে তুলেছে দেশপ্রেম। সমগ্র জাতির কাছে বাঙলার অনেক দানের মধ্যে এই গানের কয়েকটি নির্বাচিত স্তবক অন্যতম।

ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ সালে লোকসভায় জওহরলাল বলেছিলেন :

স্পষ্টত এবং অবিসম্বাদিতভাবে 'বন্দে মাতরম্' বিরাট ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সমেত ভারতের প্রধান জাতীয় সঙ্গীত ; আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে এটি অন্তরঙ্গ রূপে জড়িত।

ফরাসী বিদ্রোহের সময়ে (১৭৯২ খ্রীঃ) 'লা মার্সেলেয়' সঙ্গীতটি যেমন বিপ্লবী ফরাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল ; 'বন্দে মাতরম' মাতৃমন্ত্র তেমনি ভারতীয়দের উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল। যার ফলে আমাদের বিলিতি বিধাতা পুরুষদের বিচলিত করে তোলে। তারা আজও 'বন্দে মাতরম্' কে ভীতিমিশ্রিত ঘৃণার চোখে দেখে। সেইজন্যই 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার' ১৯৭২ সালের সংস্করণে দেখতে পাচ্ছি:

তাঁর (বঙ্কিম) মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ব একাকারে মিশে গিয়েছিল এবং তাঁর ধর্ম তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মধ্যেই সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। পরবর্তীকালে যা হিন্দু-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মন্ত্র এবং স্লোগান রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ বুঝতে না পেরে, তারা তাঁর মধ্যে সঙ্কীর্ণতার ছায়া দেখে। কিন্তু আমরা জানি 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে যে ঐক্যের সন্ধান রয়েছে, তা ভারতবাসীর পক্ষে এক অদ্ভুত গণশক্তির উদ্বোধন করেছে।

বৈষ্ণব কবিতায় যেমন বাঙলা-সংস্কৃত মিশিয়ে লেখার রীতি আছে ; বঙ্কিমচন্দ্রও ভবিষ্যতের কথা স্মরণ রেখে তেমনি 'বন্দে মাতরম্' গানে প্রচুর সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ

ঘটিয়েছেন, যাতে ভাবীকালের ভারতীয়দের পক্ষে সে মন্ত্র গ্রহণযোগ্য হয়। ভাবতে গর্ব বোধ হয়, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র এবং সুরকার রবীন্দ্রনাথ। এই মণিকাঞ্চন যোগে 'বন্দে মাতরম্' ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশমাতা একদিকে 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাম্', অন্যদিকে 'বহুবল ধারিণীং' 'রিপুদল বারিণীম্'। এই দেশমাতৃকাকে আবাহন করে বঙ্কিম দেশবাসীকে বলতে শিখিয়েছেন—বন্দে মাতরম্। অবশ্য রচয়িতার জীবদ্দশায় এই সঙ্গীতটির বিশেষ প্রয়োগ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেই ঠাকুর পরিবারে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত প্রচলিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দু বছর পর কোলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে (১৮৯৬ খ্রীঃ) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গানটি গেয়েছিলেন। কিন্তু মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হতে ভারতীয়দের সময় লেগেছে বেশ কিছুদিন। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫ খ্রীঃ) বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে আলোড়ন ঘটে, সেই সময় প্রথম দেশবাসী দেশ মাতৃকাকে 'বন্দে মাতরম্' বলে সহস্রকণ্ঠে প্রণাম করে। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের প্রথম উচ্চারণেই সাফল্য এসে গেল। বঙ্গভঙ্গ রদ হল। তারপরই শুরু হলো 'বন্দে মাতরমের' গৌরবময় ইতিহাস। জালিয়ানওয়ালবাগের বীভৎস গণহত্যার (১৯১৯) পর, সারা দেশে যে দাবানল জ্বলে উঠেছিল, সেই সময় 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে অসংখ্য নরনারী হাসিমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করেছিল। বিজয় অভিযান চলল 'বন্দে মাতর্ ' মন্ত্রের। ভারতের বিপ্লবী দলের হৃদয়ের বাণী ছিল 'বন্দে মাতরম্'। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র মুখে নিয়ে শত শহীদের বুকের রক্তে ত্বরান্বিত হয়ে উঠল ভারতের স্বাধীনতা।

সেই স্বাধীনতা মন্ত্রের অন্যতম উদগাতা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর মাতৃমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর ডাকটিকিট দুটি তাই গভীর শ্রদ্ধায় অ্যালবামে সাজিয়ে রেখেছি।

বন্দে মাতরম্ ও রবীন্দ্রনাথ

সন্তোষকুমার দে

ভারতের জাতীয় সংগীত দুইটি এবং দুইটিই বাংলার দান। এক—'বন্দে মাতরম্', দুই—'জনগণমন'। প্রথমটির রচয়িতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয়টির রচয়িতা—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। 'বন্দে মাতরম্' শুধু একটি গান নয়, একটি মন্ত্র, মহামন্ত্র—যে মহামন্ত্রের ধ্বনি কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে সুপ্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলেছিল, আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপ্ত এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষের সকল জাতির সকল ভাষাভাষীর মনে দেশাত্মবোধ জন্মেছিল, সকল মানুষ এককণ্ঠে মাতৃবন্দনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা'—অতি পরিশীলিত ভাষায় রচিত ভারত-ভাগ্যবিধাতার জয়গান। এক সময় বিদেশি সাংবাদিকদের হীন প্রচেষ্টায় এটাই প্রমাণিত করবার প্রয়াস হয়েছিল, এই গানটি কবি ইংল্যান্ডেশ্বরকে আবাহন করে রচনা করেছিলেন। এই মূঢ় উক্তির প্রতিবাদ করাও রবীন্দ্রনাথ অপমানকর মনে করেছিলেন, তবে দেশীয় সাংবাদিক এবং দেশসেবকগণ অবশ্য নীরব ছিলেন না। তাঁদের বক্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্র-তত্ত্বাচার্য মনীষী প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' নামক গ্রন্থে নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণ করেছেন—যে রবীন্দ্রনাথ ওই 'জনগণমন' গানটি কোনো রাজপুরুষের বন্দনার উদ্দেশ্যেই রচনা করেননি, পরন্তু যিনি ভারতের প্রকৃত ভাগ্যনিয়ন্তা সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই তিনি এই জয়ধ্বনি তুলেছিলেন। ভারতের মনীষীবৃন্দও এই গানটির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন তাই স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়ে 'জনগণমন' গানটিকে বিশ্ববাসীর কাছেও বরণীয় করে তুলেছেন।

'বন্দে মাতরম্' গানটির গুরুত্ব কিন্তু তাতে কিছুমাত্র কমেনি, কারণ 'বন্দে মাতরম্' পরাধীন ভারতবাসীকে যেভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আর কোনো দেশে আর কোনো একটি জাতীয় সংগীত কোটি কোটি মানুষকে এভাবে অনুপ্রাণিত করেছে বলে শোনা যায় না। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের সময়ে যোদ্ধারা সাময়িক ভাবে রবীন্দ্রনাথেরই আর একটি গান থেকে অনুরূপভাবে অনুপ্রেরণা পেয়ে ছিল বটে, কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে 'সোনার বাংলা'র ঢেউ আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

'বন্দে মাতরম্' গানটির আরও কয়েকটি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। এক মহামনীষী ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্র এটি অতি সযত্নে রচনা করেছিলেন এবং আর এক লোকোত্তর প্রতিভা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাতে সুরসংযোজনা করেছিলেন। গবেষকেরা এখন অবশ্য আবিষ্কার করেছেন—যে ১৮৭৫/৭৬ সালে 'বন্দে মাতরম্' গানটি বঙ্কিমচন্দ্র যখন রচনা করেন তখন তিনি চুঁচুড়ায় বাস করতেন। চুঁচুড়ার প্রতিবেশী সুরকার ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম্' গানটিতে সুর বসিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন। তিনিই তাই 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটির প্রথম সুরকার। তবে তাঁর নামটি সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনাবলিতে 'ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়' বলে উল্লেখ থাকায় সেই নামটিই প্রথম ঘোষিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ক্ষেত্রমোহনের দেওয়া সুর শোনেন নি, তাই *আনন্দমঠ* 'বন্দে মাতরম্' গানটি প্রকাশিত হলে তিনি নিজেই তাতে সুর বসিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত স্বরলিপিও প্রকাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাসখানি *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তখন তাতে 'বন্দে মাতরম্' সর্ব প্রথম মুদ্রিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে *আনন্দমঠ* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ঠাকুরবাড়িতে সে বইটি, এমন কী *বঙ্গদর্শন*ও যে সমাদৃত হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়। ১২৯২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *বালক* পত্রিকায় 'বন্দে মাতরম্' গানটির প্রথমাংশের স্বরলিপি প্রকাশিত হয় কিন্তু তখন তাতে সুরকারের কোনো নাম দেওয়া ছিল না। স্বরলিপিকর্ত্রী হিসেবে প্রতিভাসুন্দরী দেবীর নাম মাত্র মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর 'শত গান' নামে একখানি গ্রন্থে 'বন্দে মাতরম্' গানটির স্বরলিপিটি পুনর্বার মুদ্রিত হয়—তখন তাকে সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে 'বন্দে মাতরম্' গানটির সুর দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়, সভাসমিতিতে, কংগ্রেসমণ্ডপে এমনকি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রকেও তিনি নিজের সুরে 'বন্দে মাতরম্' গেয়ে শোনান। বঙ্কিমচন্দ্র সে গান শুনে যে খুশি হয়েছিলেন তাও বর্ণিত আছে বঙ্কিম জন্মশতবর্ষের ভাষণে,

রবীন্দ্রনাথ মনে হয় ক্ষেত্রমোহনের দেওয়া সুরের কথা জানতেনই না, তাই তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :

> তাঁর (বঙ্কিমচন্দ্রের) 'বন্দে মাতরম্' গানে আমিই প্রথম সুর দিয়ে তাঁকে শোনাই। সবটা আমি গান করিনি, যতটা আমি সুর দিয়েছিলাম ততটা তাঁকে শুনিয়েছি। তিনি তাতে খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, সরকারি আদেশের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতায় টাউন হলে যে বিরাট জনসভা হয় তাতেই 'বন্দে মাতরম্' প্রথম

ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে তার আগে ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাওয়া হয়েছিল। এর দশ বছর পরে ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবার যখন কংগ্রেস বসে তাকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গানটি গেয়েছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানের একটি ছবি এঁকেছিলেন, সে কথাও এখন সবাই জানেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সুরে 'বন্দে মাতরম্' গানটি রেকর্ডেও গেয়েছিলেন এ তথ্য বহুদিন লোকে ভুলে গিয়েছিল, রেকর্ডটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

আমি আমার সমগ্র কর্মজীবন গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাটিয়েছি, সেখানে সমস্ত কাগজপত্র খুঁজে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া 'বন্দে মাতরম্' গানের কোনো সন্ধান পাইনি। পরে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডিং বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী হই, তারও কারণ ঘটে একটু অদ্ভুত ভাবে। UNESCO থেকে রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ডের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করবার আয়োজন হয় এবং তাঁদের প্রতিনিধি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সদনে আসেন। সেখানে তখন রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড এবং কবিকণ্ঠের রেকর্ড খুব বেশি ছিল না। রবীন্দ্র-সদন কর্তৃপক্ষ UNESCO প্রতিনিধিকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে পাঠান। তিনি আমার কাছে এসে তাঁদের প্রস্তাবিত ক্যাটালগটির জন্য রবীন্দ্র সংগীতের যাবতীয় রেকর্ডের সম্পূর্ণ তালিকা চাইলেন। আমি তখন বলতে বাধ্য হলাম,—এমন তালিকা তখন পর্যন্ত কেউ তৈরি করেননি, গ্রামোফোন কোম্পানিতে তো নেই-ই, কারণ রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড যখন প্রকাশ হতে আরম্ভ হয় তখন এ দেশে ডিস্‌ক্ রেকর্ড আসেনি, প্রতিষ্ঠা হয়নি গ্রামোফোন কোম্পানির কারখানা।

এখানে খুব সংক্ষেপে রেকর্ডিং-এর ইতিহাস একটু বললে বোধহয় বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে টমাস আলভা এডিসন আমেরিকায় ফনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন যাতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরে রাখা সম্ভব। বর্তমান বর্ষে (১৯৭৭) রেকর্ডিং আবিষ্কারের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কলকাতার অভিজাত প্রসাধন সামগ্রী ব্যবসায়ী (Perfumer) স্বর্গত হেমেন্দ্রমোহন বসু (H. Bose) এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্র এ দেশে এনে রেকর্ডিং করা শুরু করেন। তখন নলের মতো রেকর্ড হত, চাকতি রেকর্ড তখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

হেমেন্দ্রমোহন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গান তাঁর নিজের কণ্ঠে এবং অন্যান্য শিল্পীর কণ্ঠে হেমেন্দ্রমোহন রেকর্ড করেন এবং H. Bose's Record নাম দিয়ে তা বাজারে বের করেন।

১৯০১ সালে ইংল্যান্ডের গ্রামোফোন কোম্পানি কলকাতায় তার শাখা স্থাপন করেন এবং ১৯০৮ সালে এ দেশেই রেকর্ড তৈরি শুরু হয়। H. Bose's Record (সিলিন্ডার রেকর্ড) গ্রামোফোন কোম্পানির চাকতি রেকর্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে যেতে বাধ্য হয়। প্রথম কিছুদিন, তিনি ফ্রান্সে প্যাথে কোম্পানিতে তাঁর সিলিন্ড্রিক্যাল রেকর্ড পাঠিয়ে

তা থেকে ডিস্‌ক্ রেকর্ড তৈরি করিয়ে এনে চেষ্টা করে দেখেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তার রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠান তুলে দেন, তবে তার পারফিউমারি সামগ্রী—যেমন 'দেলখোস' সেন্ট এবং 'কুন্তলীন' চুলের তেল সুদীর্ঘকাল চালু ছিল।

H. Bose'-এর সিলিন্ড্রিক্যাল রেকর্ডেই রবীন্দ্রনাথের গাওয়া 'বন্দে মাতরম্' গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'কবিকণ্ঠ' নামক গ্রন্থে দিয়েছি। উৎসাহী পাঠক কবিকণ্ঠে প্রচুর ছবি ও রেকর্ড তালিকা এবং তার বিস্তারিত ইতিহাস জানতে পারবেন। UNESCO প্রতিনিধি অ্যালেন ড্যানেলুর বিশেষ অনুরোধে এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক, আমার শিক্ষাগুরু আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের নির্দেশে আমি রবীন্দ্রনাথের নিজকণ্ঠের রেকর্ড তথা রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ডের পূর্ণ তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হই এবং সুদীর্ঘ ১২ বৎসর ধরে *আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা, অমৃত, গল্পভারতী, কথাসাহিত্য, শনিবারের চিঠি* প্রভৃতি বহু পত্রিকায় ১৭টি প্রবন্ধ লিখে জনসাধারণের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহে চেষ্টিত হই। দেশে বিদেশে যেখানে কবি কখনও কিছু রেকর্ড করেছেন শুনেছি বা করবার সম্ভাবনা ছিল মনে করেছি সেখানেই যোগাযোগ করেছি। সেইভাবে জার্মানির রেডিও কর্তৃপক্ষ এবং একজন প্রবীণ অধ্যাপক আমাকে কবির নিজকণ্ঠের কয়েকটি অপ্রকাশিত রেকর্ডের তথ্য জানান। রবীন্দ্র-তথ্য বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধেয় শ্রীপুলিনবিহারী সেন আমাকে ড. সুকুমার সেনের নিকট পাঠান, তাঁর বর্ধমানের বাড়ি থেকেই ১৯০৬ সালে মুদ্রিত H. Bose's Record Catalogue হতে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গানের রেকর্ডখানির (36250) সন্ধান পাই। সেই সূত্র ধরে স্বর্গত হেমেন্দ্রমোহন বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র সাহিত্যরসিক হিতেন্দ্রমোহন বসুর নিকট ওই প্রাচীন রেকর্ডখানির সন্ধান করতে থাকি। আমি তখন আমহার্স্ট স্ট্রিটে হিতেন্দ্রমোহন বসুর বাড়ির কাছাকাছি থাকতাম বলে সুদীর্ঘ আট বৎসর ধরে তাঁদের বাড়িতে যাতায়াত করা সম্ভব হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের একটি গুদাম ঘরে পরিত্যক্ত একটি ট্রাঙ্কের মধ্যে রেকর্ডিং কোম্পানির পুরাতন কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে প্যাথে কোম্পানিতে তৈরি রবীন্দ্রনাথের গাওয়া 'বন্দে মাতরম্' গানটির ডিস্‌ক্ সৌভাগ্যক্রমে পাই এবং ওই বাড়িতে বসেই রেকর্ডখানির ছবি তুলে আমার লেখা *কবিকণ্ঠ* গ্রন্থে ছাপি। ১৯৬২ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যাতেও ওই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি।

তারপর বহুদিনের প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের সহযোগিতায় ওই রেকর্ডখানির 'টেপ' তৈরি করে আকাশবাণীর প্রধান কেন্দ্রগুলিতে দেওয়া হয়। কলকাতায় ক্যাথিড্রাল রোডের রবীন্দ্রসদনের যেদিন দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গাওয়া 'বন্দে মাতরম্' গানটির টেপ বাজিয়ে সেই শুভ কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল এবং এই সুপ্রাচীন সংগ্রহের তথ্য জেনে সেদিনের উদ্‌বোধক জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরে আমায় অতি আন্তরিকভাবে আশীর্বাদে অভিভূত করেছিলেন। এখনও

অনেক সময় বেতারে ২৫ বৈশাখের রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গানটি বাজানো হয়।

মূল রেকর্ডের অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি 'সোনারতরী' কবিতাটি আছে। রেকর্ডখানি পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষা করেছেন।

'বন্দে মাতরম্' গানটি দিলীপকুমার রায় ও শুভলক্ষ্মীর কণ্ঠে গীত রেকর্ড (45N83459) কিনতে পাওয়া যায়, আকাশবাণী বাদ্যবৃন্দের (7EPE 1006) রেকর্ডও পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডখানি কিনতে পাওয়া যায় না। কোনো পক্ষ কি এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারেন না?

রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার ও শুভলক্ষ্মী ব্যতীত আরও বহু বিখ্যাত শিল্পীর কণ্ঠে ও যন্ত্রে বহুবার 'বন্দে মাতরম্' গানটি রেকর্ডে প্রচারিত হয়েছে। তার মধ্যে হরেন্দ্রনাথ দত্তের গাওয়া রেকর্ডটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়ে দীর্ঘদিন চালু ছিল, তাতেই তার জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৩৯ সালে 'ইউনিট অব ফিল্ম্ মিউজিয়ান্স্' 'বন্দে মাতরম্' নামে একটি চলচ্চিত্র তোলেন, তাতেও 'বন্দে মাতরম্' গানের রেকর্ড (N 36170) প্রকাশিত হয়। তার আগে এবং পরে আরও অনেক শিল্পীর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে তার* একটি তালিকা দিলাম, এ বাদে আরও রেকর্ড থাকা অসম্ভব নয়।

১. অজয় বিশ্বাস, কনক দাশ, সতী দেবী ও সোমেন গুপ্তের সমবেত কণ্ঠে—N 17014
২. অনাদি দস্তিদারের পরিচালনায় বিবিধ শিল্পী—N 27829*
৩. আকাশবাণী বাদ্যবৃন্দ—7EPE 1006
৪. ইউনিট অব ফিলম মিউজিসিয়ান্স্—N 36170
৫. আনন্দবাজার পত্রিকা/হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের পক্ষে—AHR-1
৬. এইচ. এম. ভি অর্কেস্ট্রা—N 27893
৭. পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর—BEX 201, GE-3132
৮. মাস্টার কৃষ্ণ রাও—

* জগন্ময় মিত্র, দ্বিজেন চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, নীহারবিন্দু সেন, কনক দাশ, সুচিত্রা মিত্র, সুপ্রীতি ঘোষ ও গীতা সেন।

৯. জগন্ময় মিত্র, বেচু দত্ত প্রভৃতি—N 16985
১০. দিলীপকুমার রায়—H T 80
১১. দিলীপকুমার রায় এবং এম. এস. শুভলক্ষ্মী—45N83459
১২. বিষ্ণুপদ পাগনিস্—P 13361
১৩. ব্রাস ব্যান্ড (কোরাস্)—N 16939
১৪. ভরত ব্যাস এবং সম্প্রদায়—N 16872
১৫. ভবানী দাস—JNGS 5224
১৬. বাই মণ্ডবাই কুর্দিকার—GE 3997
১৭. মাতৃ সেবকদল—N 6944
১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—H. Bose-36250
১৯. রাম আশ্রম গার্লস স্কুল—N 16331
২০. হরেন্দ্রনাথ দত্ত—P 5182

প্রসঙ্গ 'বন্দে মাতরম্' এবং রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র[১]

লাড্‌লীমোহন রায়চৌধুরী

সকলেই জানেন বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম্' স্তোত্রটি ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সে কালের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এক সময় ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্'-এর পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় তরফ থেকেই জোরাল যুক্তি অবতারণা করা হয়েছিল। যাঁরা এঁর বিপক্ষে তাঁদের যুক্তি হল এই যে 'বন্দে মাতরম্' স্তোত্রে দেশ এবং হিন্দুর দেবী দুর্গা একাকার হয়ে গিয়েছেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পক্ষে এই পৌত্তলিক ধর্মের দেবীকে প্রণাম করার ফলে 'দোজখ'-এর পাপ জন্মায়। তা ছাড়া মুসলমানরা 'বোছা' দেন, তাঁদের পক্ষে হিন্দুরীতি অনুযায়ী প্রণাম জানানোও একটা পাপের কাজ। আরও কারণ আছে। 'বন্দে মাতরম্' স্তোত্রটি যে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সেই *আনন্দমঠ* উপন্যাসটিতেও আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান বিদ্বেষের কথা প্রচার করা হয়েছে। অতএব এমন একটি স্তোত্রকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হলে মুসলমানদের ধর্মবোধ আহত হতে পারে। সুতরাং এটি বর্জন করাই শ্রেয়। কবি রবীন্দ্রনাথ এই মতের সমর্থক ছিলেন। তাঁর বিবেচনায় 'বন্দে মাতরম্'-এর বড়ো জোর প্রথম দুটি স্তবক গ্রহণ করা চলে, কিন্তু স্তোত্রের শেষাংশগুলি অবশ্যই বর্জনীয়।

'বন্দে মাতরম্'-এর পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের যুক্তিগুলিও উপেক্ষা করার মতো নয়। তাঁদের মতে এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই এই গানটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইংরেজ বিরোধী লড়াইয়ে যোগ দিতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ, যিনি ত্রিশের দশকে এই গানটির বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন, তিনিও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগে এই গানটির প্রশংসায় কার্পণ্য করেন নি। এমন কি তাঁর একটি গানে ("একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন") 'বন্দে- মাতরম্' মন্ত্রটি ধুয়ো হিসেবে বারে বারেই ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়া 'ত্বং হি দুর্গা' প্রভৃতি যে শব্দগুলি সম্পর্কে সবচেয়ে

প্রবন্ধটি রচনার কাজে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রীসমর ভৌমিক নেতাজির অপ্রকাশিত চিঠিখানি ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ ব্যাপারে আমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস-এর নিকটও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ-এর লেখা 'মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ' এবং অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়-এর *'আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ'* নামক বই দুখানি থেকেও আমি মূল্যবান তথ্য সংকলন করেছি। এঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বেশি আপত্তি জানানো হয়েছে সেগুলি বস্তুত 'আইডিয়া' মাত্র। ওগুলির মধ্যে পৌত্তলিকতার ছোঁয়াচ আছে বলে অভিযোগ করাটা কোনো কাজের কথা নয়। 'বন্দে মাতরম্'-এর পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে আরও অনেকেরই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম করা যেতে পারে।

'বন্দে মাতরম্'-এর প্রশ্নে কোন পক্ষের মত ন্যায়সংগত এবং কেনই বা ন্যায়সঙ্গত সে বিষয়ে পুনরায় আলোচনা শুরু করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এইসব প্রশ্ন বারে বারে আলোচিত হয়েছে, তার ফলে নানা সময় মাত্রাতিরিক্ত তিক্ততারও সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার রাস্তায় *আনন্দমঠ* উপন্যাসটিকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে। আবার লিগ আমলে (সম্ভবত ১৯৪২ সালে) উপন্যাসটিকে নিষিদ্ধ করারও প্রস্তাব আনা হয় (অবশ্য নাজিমুদ্দিন ও ফজলুর রহমানের হস্তক্ষেপের ফলে এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি)। গত বছর এই নিয়ে আবারো বিতর্ক শুরু হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, তর্কের অবসান ঘটেনি। সুতরাং এইসব নিরর্থক বিচার মীমাংসায় জড়িয়ে না পড়ে বর্তমান প্রবন্ধে বিষয়টি অন্য আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি এককালে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র দুজনেই 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটির মুগ্ধ অনুরাগী ছিলেন। আবার কালক্রমে এরা দুজনেই সংগীতটিকে অংশত বা পুরোপুরি বর্জন করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। সময়ের বিচারে সুভাষচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু আগেই 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। মত পরিবর্তনের পর সুভাষচন্দ্র আবারো রবীন্দ্রনাথকে 'বন্দে মাতরম্'-এর সপক্ষে ফিরিয়া আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হননি এবং সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি নিজেই শেষ পর্যন্ত কবির মত গ্রহণ করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম্'-কে ঘিরে এই টানাপোড়েনের একটি আংশিক চিত্র উপস্থাপিত করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

প্রথমে, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র যখন উভয়েই 'বন্দে মাতরম্'-এর অনুরাগী ছিলেন সেই সময় এই গানটি সম্পর্কে এঁদের দুজনকার দুটি অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। ২৮ অক্টোবর ১৯১৬ তারিখে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে কবি মন্তব্য করেছেন:

> আমাদের বন্দে মাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনা-মন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

অতঃপর সুভাষচন্দ্রের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ, রঙপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ভাষণ দানের সময় সুভাষচন্দ্র বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র হলেন 'জাতীয়তার প্রধান পুরোহিত' এবং 'বর্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ ও দেবী

চৌধুরাণী—প্রণয়নের দ্বারা নবজাগরণের বোধন করিয়াছেন।'

এবারে মত পরিবর্তনের পালা। 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৯১২ সালে। ওই বছর লন্ডন শহরে একটি ঘরোয়া বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গাইতে বসে স্তোত্রটির মাত্র প্রথম দুটি স্তবক গেয়েই থেমে যান—বাকি অংশটুকু তিনি ভুলে গিয়েছেন এই অজুহাতে আর গাননি। অবশ্য ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে যথার্থ কতটা বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন সেটা ভেবে দেখা দরকার, কেননা আমরা উপরের অনুচ্ছেদে দেখিয়েছি যে ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহেও রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে তাঁর অনুরাগের কথা ব্যক্ত করে রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। কাজেই লন্ডন শহরের যে আসরে বসে তিনি 'বন্দে মাতরম্' পুরোটা গাইতে পারেননি সেখানে সত্যি সত্যিই হয়তো গানের সব কয়টি কলি তাঁর মনে পড়েনি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে জাতীয় সংগীত ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁর মনে কোনো অস্বস্তির ভাব জাগে নি। সে যাই হোক সঠিক কোন তারিখের পর থেকে কবির মনে 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে অনীহা সৃষ্টি হয়েছিল সেই আলোচনা আপাতত মুলতুবি রেখেও এ কথা বলা যায় যে এই গানটি সম্পর্কে তাঁর মনে ধীরে ধীরে বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ত্রিশের দশকে এসে তিনি এই গানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন।

সুভাষচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের মতো 'বন্দে মাতরম্' বর্জন করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে এই সংগীতের মাত্র প্রথম দুটি কলিই সভ্য সমিতিতে গীত হবে। সুভাষচন্দ্র এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। তবে ঐক্যের খাতিরে পরবর্তীকালে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও, সুভাষচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। এমনকী এ ধরনের সিদ্ধান্ত যাতে না নেওয়া হয় সেজন্য তিনি রীতিমতো চেষ্টাও করেন। এ ব্যাপারে প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহায্যপ্রার্থী হন। ১৯৩৭ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে কবি এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত জানিয়ে সুভাষচন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি জানান:

> বন্দে মাতরং গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব এ কথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে তর্ক চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলাদেশের সঙ্গে দুর্গাকে একাত্ম করেছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশভুজা মূর্তিরূপের যে পূজা সে কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি যখন লেখেন তখন সুভাষচন্দ্র কার্শিয়াং-এ রয়েছেন। কার্শিয়াং-এ কবির লেখা চিঠিখানি তখনও তাঁর হাতে এসে পৌছয়নি। ইতিমধ্যে 'বন্দে মাতরম্'-

কে টিকিয়ে রাখার জন্য সুভাষচন্দ্র আরো নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ২০ অক্টোবর তারিখে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন। মূল চিঠিখানি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায়। চিঠিখানির বয়ান এইরকম :

Kurseong
২০.১০.৩৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র এইমাত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি কলিকাতায় ২৪ তারিখে পৌঁছিব এবং সেখানে এক সপ্তাহ থাকিব। আমার ঠিকানা ৩৮/২ এলগিন্ রোড। মহাত্মাজি ও পণ্ডিত জহরলাল ২৬ তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং থাকিবেন—উড্‌বার্ন পার্ক-এ। আপনি যদি মহাত্মাজিকে 'বন্দেমাতরম্'-এর বিষয়ে লেখেন তাহা হইলে বড়ো ভালো হয়। আপনার সাহায্য এ বিষয়ে একান্ত দরকার। আমি জানিনা 'ওয়ার্কিং কমিটি' এ বিষয়ে কি করিয়া বসিবেন, কমিটিতে আমি একমাত্র বাঙালি। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে কবিকে অনুরোধ করিবেন মহাত্মাজিকে লিখিবার জন্য। আমি কবিকে লিখিয়াছি, কিন্তু কি ফল হইবে জানি না। অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে পরে লিখিতেছি।

আমার বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিবেন—

ইতি
বিনীত
সুভাষচন্দ্র বসু

চিঠিখানি পাঠ করে বোঝা যায় যে 'বন্দে মাতরম্'-কে অক্ষত অবস্থায় টিকিয়ে রাখা যে একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে সেটা সুভাষচন্দ্রও টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর চিঠির ভাষায় এক ধরনের হতাশা ফুটে উঠেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছেন, তার উত্তর এখনও তাঁর হাতে এসে পৌঁছয়নি, কিন্তু কবির কাছ থেকে এ ব্যাপারে যে বিশেষ সাড়া পাওয়া যাবে না সেটা তিনি আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে গান্ধিজিকেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল লাভ হয়নি। সবচেয়ে লক্ষ করার বিষয় যে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একমাত্র বাঙালি সদস্য বলে কমিটিতে তাঁর মতামত অগ্রাহ্য হতে পারে বলে প্রকারান্তরে একটা আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। সুভাষচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত চিঠিখানি পড়ে স্পষ্টভাবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়তো টানা চলে না। তবে একটা যেন সন্দেহের ইশারা পাওয়া যায়। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে

কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা হয়তো সব দিক দিয়েই যথেষ্ট যুক্তিসম্মত হয়েছিল। কিন্তু তা হলে ওয়ার্কিং কমিটির একমাত্র বাঙালি সদস্য হিসেবে সুভাষচন্দ্র নিজেকে এত অসহায় বোধ করেছিলেন কেন?

'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেয় সুভাষচন্দ্র তা মেনে নেন এবং পরবর্তীকালে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তিনি নানা জায়গায় নিজের মন্তব্যও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। ১৯৩৯ সালের ১১ আগস্ট যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ঘরে সুভাষচন্দ্র জানান, 'সেইজন্য সর্ববাদী-সম্মতভাবে যে অংশটুকু গৃহীত হয়েছে তাতে বন্দেমাতরম্ সংগীতের মর্যাদা কোনো মতে ক্ষুণ্ণ হয়নি বলেই আমি মনে করি।' এর থেকে বোঝা যায় যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একবার কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র সেটি রক্ষার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর পক্ষে এটিই সবচেয়ে স্বাভাবিক। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে লখনউ-এ অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেস যেভাবে জিন্না ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল তার ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। সুভাষচন্দ্র এটা বুঝেছিলেন, তাই তিনিও এই ব্যাপারে সায় দিয়েছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? হিন্দু সংস্কৃতি তথা হিন্দু পৌত্তলিকতার অপরাধে তিনি 'বন্দে মাতরম্'-কে বর্জন করেছিলেন। কিন্তু জনৈক রবীন্দ্র-গবেষকের মতে এটাই যদি 'বন্দে মাতরম্'-এর একমাত্র অপরাধ হয় তাহলে কবির পরবর্তীকালের রচিত 'স্বদেশ' পর্যায়ের আরও একাধিক গান বর্জন করতে হয়। এমন কি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতটিতেও 'বোজা' দেওয়ার পরিবর্তে 'ও মা তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে'—ইত্যাদি বিধর্মী প্রণাম পদ্ধতির কথা লেখা আছে। তা ছাড়া আরো আছে। 'মাতৃমন্দির-পুণ্য অঙ্গন', 'ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে', 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী মা '—ইত্যাদি গানগুলিও কি পৌত্তলিকতাপন্থী নয়? তবে কেন এগুলি 'স্বদেশ' পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হল? এই পর্যায় বিভাগ যে-ই করুন না কেন, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ তো একা হিন্দুর দেশ নয়। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর আজো আমাদের পাওয়া হয়নি।

পরিশেষে আর একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য। 'বন্দে মাতরম্' গানে 'দেশ' রাগে রবীন্দ্রনাথই প্রথম সুরারোপ করেন। ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নিজের দেওয়া সুরে এই গানটির কতকাংশ ('সুখদাং বরদাং মাতরম্' পর্যন্ত) গেয়ে শুনিয়েছিলেন। কবি কর্তৃক সুরারোপিত কবিকণ্ঠে এই গানটির প্রথম রেকর্ড বের হয়েছিল ১৯০৫ সালে। রেকর্ডের একদিকে ছিল 'সোনার তরী' কবিতার কবিকণ্ঠে আবৃত্তি এবং অপরদিকে এই

গান। আমহার্স্ট স্ট্রিট-এর বিখ্যাত এইচ বোস কর্তৃক ৭৮ আ. পি. এম. স্পিডে এই গানটি রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডের নম্বর ছিল ৪৫৪৭৭। আর একটি কপি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শনী গৃহে আজো সংরক্ষিত আছে।

সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় যে, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একমাত্র বাঙালি সদস্য বলে কমিটিতে তাঁর মতামত অগ্রাহ্য হতে পারে বলে প্রকারান্তরে একটা আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন।

বন্দে মাতরম্‌ ও রবীন্দ্রনাথ

আলপনা রায়

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর (১৩০৩ পৌষ ২) কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম্‌' গান গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ। অধিবেশন উপলক্ষে তিনি রচনা করেছিলেন ভারতমাতার বন্দনাগান : 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস-সভায় গানটি না গাওয়ার কারণ কি এই যে, 'একান্ত হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয়ী' এই রচনা 'সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাইবার উপযুক্ত নয়'? 'ভুবনমনোমোহিনী' সম্পর্কে পরবর্তীকালের এই অভিমত কি রচনাকালেও দ্বিধান্বিত করেছিল তাঁকে, তাই গেয়েছিলেন 'বন্দে মাতরম্‌'-এর প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি? সেদিনের বিবরণ আছে রবীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি'তে :

> বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্‌'-এ বাবা সুর বসিয়েছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের আরম্ভে বাবা একা এই গান গাইলেন, সরলাদিদি সঙ্গে অর্গান বাজিয়েছিলেন। তখন মাইক প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। বাবার গলা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই প্যাণ্ডালের বিপুল জনতার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল। ১৮৯৬ সালের কংগ্রেসে 'বন্দে মাতরম্‌' প্রথম গাওয়া হয়।

অধিবেশনের আরম্ভেই গানটি হয়েছিল কি না, *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র বিবরণী অনুসারে সে-বিষয়ে অবশ্য সংশয় প্রকাশ করেছেন 'রবিজীবনী' কার প্রশান্তকুমার পাল। এর আগেও প্রকাশ্য সভায় এই গান গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ; ২৩ মার্চ ১৮৮৪ (১২৯০ চৈত্র ১১) সাবিত্রী লাইব্রেরির (প্রতিষ্ঠা ১২৮৬) পঞ্চম অধিবেশনের সূচনায় ছিল অক্ষয়চন্দ্র মজুমদারের 'বন্দে মাতরম্‌' গান, আর সমাপ্তি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের স্ব-রচিত কয়েকটি স্বদেশী গানের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্‌' গানে। তবে কংগ্রেস-সভায় পরিবেশনসূত্রেই 'বন্দে মাতরম্‌' প্রথম জাতীয় সংগীতের স্বীকৃতি পেল।

লক্ষ্য করা যায়, অধিবেশনের দশ বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্‌'-এর প্রথম সাত পঙ্‌ক্তির স্বরলিপি, ১২৯২ সালে *বালক* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'গান-অভ্যাস' বিভাগে। স্বরলিপিকার রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাসুন্দরী দেবী। সুরকারের কোনো নাম অবশ্য এই পত্রিকায় নেই কিন্তু ১৩০০ সালে *ভারতী* পত্রিকার কার্তিক

সংখ্যায় সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে সুরকারের নাম 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। দুটি স্বরলিপি প্রায় একই রকম, নির্দেশিত রাগ-তালও এক—দেশকাওয়ালি। তাই মনে হয় *বালক* পত্রিকার স্বরলিপিটি রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত সুরের অনুসরণেই কৃত। প্রতিভাসুন্দরী দেবী জানিয়েছেন :

> 'বন্দে মাতরম্' নামক বিখ্যাত গানটির সমস্তটা দেওয়া গেল না, কারণ উক্ত গানের সুর অত্যন্ত কঠিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে আয়ত্ত হইবে না। বন্দে মাতরম্ গানে বিস্তর অলংকার লাগিয়াছে।

এর থেকে এমন ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে, সম্পূর্ণ গানটিতেই বুঝি সুর দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্নী সরলা দেবীর আত্মস্মৃতি থেকে জানা যায়, প্রথম দুই পদের সুর রবীন্দ্রনাথের, তাঁরই উৎসাহে বাকি অংশে সুর দিয়েছেন সরলা দেবী, 'একদিন মাতুল আমায় ডেকে বললেন—'তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল্ না।' ...তাঁর আদেশে 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে ও গোড়ার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর দিয়ে ফুটিয়ে নিলুম। দুই একটা জাতীয় উৎসবে সমস্বরে বহুকণ্ঠে বহুজনকে গাইতেও শেখালুম। সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকল।' এই ঘটনা সম্ভবত বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ পর্বকালের। ১৩০০ (১৮৯৩) সালের *ভারতী* পত্রিকায় বা ১৩০৭ (১৯০০) সালে প্রকাশিত সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপির সংকলনগ্রন্থ 'শতগান'-এ কেবল প্রথম সাত পঙ্‌ক্তিরই স্বরলিপি আছে ; দীর্ঘকাল পরে *শতগান*-এর তৃতীয় সংস্করণেই (১৩৩০) কেবল সম্পূর্ণ গানটির স্বরলিপি পাওয়া যায়। 'দেশ' রাগে বাঁধা এই গানের শুধু তালের পরিবর্তন হয়েছে স্বরলিপিগুলিতে ; *বালক* পত্রিকার 'কাওয়ালি' তাল 'শতগান' প্রথম সংস্করণে হয়েছে 'একতালা', আর তৃতীয় সংস্করণে বোধকরি বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্যে 'তাল ফেরতা'র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বারাণসী-কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯০৫) গানের 'সপ্তকোটীকণ্ঠ' ও 'দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃত'র পরিবর্তে 'ত্রিংশকোটি' ও 'দ্বিত্রিংশকোটিভুজৈর্ধৃত' গেয়েছিলেন সরলা দেবী। কিন্তু তাঁর মুদ্রিত কোনো স্বরলিপিতেই এমন নেই। মনে হয়, এটি মুখে মুখেই পরিচিত হয়েছিল, যেমন আরও পরে হয়েছিল 'কোটী কোটী কণ্ঠ' ও 'কোটী কোটী ভুজৈর্ধৃত'। রবীন্দ্রনাথ-সুরারোপিত অংশটি পরবর্তীকালে স্বরবিতানে (খণ্ড ৪৬) মুদ্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কখনও সম্পূর্ণ গানটি গেয়েছেন বলে জানা যায় না। জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনেও তিনি নিজের সুরারোপিত শুধু প্রথম স্তবকটিই গেয়েছিলেন সম্ভবত ; দীর্ঘ একচল্লিশ বছর পরে ভিন্ন উপলক্ষ্যে এক চিঠিতে 'বন্দে মাতরম্' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> The Privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine when the author was still alive and I was the first person to sing it before a gathering of the Calcutta Congress.

বলা বাহুল্য, এই দুটি বাক্যকে সংযুক্ত করে দেখার কোনো সংগত কারণ নেই, সকলেই জানেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণবর্ষ ১৮৯৪। এই বছরেই (সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, ১৩০১ ভাদ্র ১৮) রাণাঘাটে কবি নবীনচন্দ্র সেনের বাড়িতে 'নবযুবক' রবীন্দ্রনাথের 'বন্দে মাতরম্' গাইবার বিবরণ আছে নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' গ্রন্থে : বঙ্কিমবাবুর 'বন্দে মাতরম্' গাইতে বলিলে, কেবল প্রথম পদটি মাত্র গাইলেন। বলিলেন, গানটি তাঁহার মুখস্থ নাই।' অনুরূপ একটি ঘটনার বিবরণ আছে রোটেনস্টাইনের আত্মজীবনীতেও ; ঈষৎ কৌতুকভরেই তিনি জানিয়েছেন, লণ্ডনের এক ভোজসভায় (২ সেপ্টেম্বর ১৯২০) নৈশ-আহারের পর 'বন্দে মাতরম্' গাইবার অনুরোধ করা হলে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি শব্দের পর আর মনে করতে পারলেন না, যেমন সেদিন নিজের নিজের দেশের জাতীয় সংগীতের সবটুকু মনে করতে পারেননি ইয়েট্স, আর্নেস্ট রীজ এবং রোটেনস্টাইন স্বয়ং।

রবীন্দ্রনাথের এই বিস্মরণের কারণ কি এমন হওয়া সম্ভব যে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুই স্তবকের পরবর্তী অংশ সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহ বোধ করেননি, যেমন লিখেছেন তিনি পরিণত বার্ধক্যে :

> .. with all the sentiments of which, brought up as I was in the monothestic ideals of my father, I could have no sympathy.

'বন্দে মাতরম্' গানে রবীন্দ্রনাথের আগেও সুর দিয়েছেন অন্তত দুজন : ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদুভট্ট। *আনন্দমঠ* নির্দেশিত মল্লার রাগিণীতে বাঁধা যদুভট্টের সুরটিই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পছন্দ হয়েছিল, শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'মল্লার'-এর কাছাকাছি এক ভিন্ন রাগে গানটি বাঁধলেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যদুভট্টের নিত্য-সংযোগ এবং দুটি রাগের নৈকট্যের কথা স্মরণ করে রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতো আমাদেরও কৌতূহল হয়, রবীন্দ্রনাথ কি যদুভট্টা প্রদত্ত সুরটি শুনেছিলেন? শোনা অসম্ভব নয়। তবু রবীন্দ্রনাথ নতুন রাগে 'বন্দে মাতরম্'-কে চিহ্নিত করলেন : রাগটির নাম 'দেশ', লক্ষ করা ভালো।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই নতুন সুর বঙ্কিমচন্দ্র শুনেছিলেন, এমন কোনো নিশ্চিত তথ্য-প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালে এই সুরসৃষ্টি বা পত্রিকায় স্বরলিপি প্রকাশ ছাড়াও ১২৯৩ বৈশাখে তৃতীয় সংস্করণ *আনন্দমঠ*-এর পরিশিষ্টে স্বয়ং লেখকের অনুমোদনে প্রতিভাসুন্দরী দেবী-কৃত স্বরলিপিটি মুদ্রিত হয়।

তাই সংগতভাবেই অনুমান করা হয়, 'বন্দে মাতরম্'-এর এই সুরটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুদ্রিত স্বরলিপির মধ্য দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' গান একটি নির্দিষ্ট সুরে প্রতিষ্ঠিত হল। পরবর্তী সময়ে আরও কেউ কেউ এই গানে সুর দিয়েছেন, কিছু পরীক্ষা- নিরীক্ষাও হয়েছে। বর্তমানে যে সুরটি সরকারিভাবে স্বীকৃত ও সুপরিচিত, সেটিও দেশ রাগাশ্রিত।

'বন্দে মাতরম্' গানের বা বিশেষত এই শব্দবন্ধের বিপুল ও বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদ আন্দোলনে। রাখীবন্ধন-উৎসবের অন্যতম গানই ছিল 'বন্দে মাতরম্'; পতাকায় লেখা হয়েছে, শাড়ির পাড়ে বোনা হয়েছে, বন্ধুত্ব বিনিময়ের সম্ভাষণ কিংবা প্রতিবাদের ভাষা হয়েছে, কারারুদ্ধ স্বদেশীর বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতের চরম উচ্চারণ হয়েছে 'বন্দে মাতরম্'। সমকালের গীতিকাররা নতুন নতুন গান রচনা করেছেন, সে-গানেও অনেক সময়ে ধ্বনিত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্'। 'বন্দে মাতরম্' নামে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকা, গীতসংকলন গ্রন্থ। এই সময়ে (১৯০৫) রবীন্দ্রনাথের পুরনো রচনা 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানে নতুন ধুয়োর সংযোজন হয়েছে, 'বন্দে মাতরম্'। মূল গানের ('বন্দে মাতরম্') স্নিগ্ধতা এখানে নেই, 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটির সঙ্গে সংগতি রেখে যুগের উদ্দীপনা ধ্বনিত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্'-এর পুনঃপুনঃ উচ্চারণে। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ-গীত 'বন্দে মাতরম্' গানের গ্রামোফোন রেকর্ড। বস্তুত স্বদেশী যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্ত্রবাণী হয়ে উঠেছিল শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতের তথা জাতির প্রাণের মন্ত্র।

তবু এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে 'বন্দে মাতরম্' থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র মাতৃমূর্তির কল্পনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গানে দেশজননী আর জগজ্জননীতে ভেদ ছিল না কোনো; তিনি দশপ্রহরণধারিণী প্রতিমা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ অন্তরঙ্গ স্নেহময়ী মাতা। ত্রিনেত্রর রূপকল্পনা কোনো গানে থাকলেও, তিনি দ্বিভুজা ; ঐশ্বর্যময়ী দেবী নন, দরিদ্রা। তাঁর পুরোনো দেশাত্মবোধক গানের মতো এখানে বিশেষ করে হিন্দু-সংস্কৃতির কোনো প্রকাশ নেই। দেশের মাটি মধ্যে এই যুগেই কবি দেখেন 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা'।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল নিবিড় ; এই কাজে বারবার তিনি লেখনী ধরেছেন। কিন্তু বোমা ও বয়কটে অবসিত আন্দোলন তাঁকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারল না, এই জগৎ থেকে তিনি সরে এলেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছেন, অপব্যবহারে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ক্রমশ তার মহিমা হারাতে চলেছে ; মন্ত্র হয়ে উঠছে রাজনৈতিক প্রয়োজনের স্লোগান। ১৯১৬ সালে ১৩ জানুয়ারি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন :

> বন্দে মাতরমের নামে দেশে যে একটা দুষ্কৃতির ঢেউ উঠিয়াছে সেটার ত একটা Psychology আছে—ঘরে-বাইরে গল্পে তারই আলোচনা চলিতেছে। আমি ইচ্ছা করিয়া আগে হইতে ভাবিয়া একাজে প্রবৃত্ত হই নাই—আপনা-আপনি কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসের নায়ক স্পষ্টই বলে :

> দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক পরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

মনে রাখতে হবে, এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, তখন রবীন্দ্রনাথের অনুভবে মুছে যাচ্ছে স্বদেশ ও বিশ্ব, স্বজাতি ও মানবজাতির বিভাজন রেখা। 'বন্দে মাতরম্' বাণীটিকেও তিনি দেখতে চাইছেন নতুন তাৎপর্যে। আমেরিকা থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন এই সময়েই (১৯১৬) :

> বাংলাদেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রসারিত হোক্, বাংলাদেশের বাণী সর্বজাতির সর্বজাতির সর্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দে মাতরম্ মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবীযুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে। মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত এই ঐতিহাসিক গানটি যে অচিরেই হয়ে উঠবে বিতর্কের কেন্দ্র, এমন কি অনুমান করেছিলেন তিনি? স্মরণ করা যেতে পারে, সত্তর বছরের জন্মদিন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী '...ভাবোচ্ছ্বাসে তোমাদের সকল শক্তি নষ্ট হইতে দিয়ো না, তাহাকে কার্যে পরিণত করো। 'বন্দে মাতরম্' যথেষ্ট হইয়াছে, এখন 'বন্দে মাতরম্' স্থানে 'বন্দে মাতরম্' বল।' অদূর ভবিষ্যতে অনিবার্য ভ্রাতৃবিরোধ বোধকরি কল্পনায় দেখেছিলেন দূরদর্শী কবি, যে বিভেদের সূচনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বদেশী যুগেই। ১৯০৫ সালে মহাসমারোহে পালিত হল রাখীবন্ধন উৎসব, কিন্তু সংগতকারণেই বহুসংখ্যক মুসলমান এই উৎসবে যোগ দিলেন না, এই বাস্তব ঘটনাটি কবিকে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন :

> মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে ; ...সে যখন বুঝিবে

আমি তাহাকে আমার অনুবর্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্বক চেষ্টা করিতেছি না, আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গল সাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি, তখনই সে বুঝিবে, আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; তখনই সে বুঝিবে, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মা'কে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটোবড়ো সকলেই যাঁহার সন্তান।

প্রত্যাশিত সেই সাধনার যথার্থ প্রয়াস কি হয়েছিল কখনও?

১৯৩৭ সালে জাতীয় সংগীত বা national anthem প্রসঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক মুসলমান ও জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের অনমনীয় মনোভাবের কথা সকলেই অবহিত আছেন। প্রকাশ্য জনপথে *আনন্দমঠ* পুড়িয়ে ফেলা, একপক্ষের সেই ক্ষোভের উগ্র অভিব্যক্তি। বার্ধক্য ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই বিতর্কে বা দ্বন্দ্বে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর লেখা প্রাসঙ্গিক তিনটি চিঠির অংশবিশেষ স্মরণ করা যেতে পারে।

প্রথমটি লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুকে, ১৯৩৭ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে। 'বন্দে মাতরম্' গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব এ কথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে তর্ক চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলাদেশের সঙ্গে দুর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশভুজা মূর্তিরূপের যে পূজা সে কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারে না। ...আনন্দমঠ উপন্যাসটি সাহিত্যের বই, তার মধ্যে এই গানের সুসঙ্গতি আছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সর্বজনীনভাবে সঙ্গীত হতেই পারে না। বাংলাদেশের একদল মুসলমানের মধ্যে যখন অযথা গোঁড়ামির জেদ দেখতে পাই তখন সেটা আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়। তাদের অনুকরণ করে আমরাও যখন অন্যায় আব্দার নিয়ে জেদ করি তখন সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে।'

দ্বিতীয়টি সেই বিখ্যাত চিঠি, তারিখ ২৬ অক্টোবর ১৯৩৭, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি জওহরলাল নেহরুকে লেখা :

> An unfortunate controversy in raging round the question of suitability of 'Bande Mataram' as national song.....I freely concede that the whole of Bankim's Bande Mataram' poem and together with its context is liable to be interpreted in ways that might wound Moslem susceptibilities, but a national song though derived from it which has spontaneously come to consist only the first two stanzas of the original poem, need not remind us every time of the whole of it, much less of the story with which it was accidentally associated. It has acquired a separate individuality and an inspiaring significance of its own in which I see nothing to offend an sect or community.

সম্ভবত এই অভিমত অনুসারেই দীর্ঘ আলোচনার পর ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুই স্তবক জাতীয় সভা-সমিতিতে গাইবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তবে, স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বন্দনাগীতিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে 'মুসলমান বন্ধু'দের আপত্তিও যে যুক্তিসংগত এবং কংগ্রেস যে কখনো এই গান বা কোন গানকেই ভারতের 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসেবে স্বীকার করেনি, একথাও জানানো হল। [*দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৯ অক্টোবর ১৯৩৭] সিদ্ধান্ত প্রকাশের পরের দিন, ৩০ অক্টোবর ১৯৩৭ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় রবীন্দ্রনাথের বিবৃতিরূপে মুদ্রিত হল ২৬ অক্টোবর তারিখে জওহরলাল নেহরুকে লেখা চিঠির মর্মার্থ। এই সিদ্ধান্তের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা, পত্রিকায় লেখা হল :

> ...'মুসলিম বন্ধুদের আপত্তি'—অপ্রকাশ্য গোপন আপত্তি পূরণ করিবার জন্য এবং ভারতের সর্ববিধ ধর্মসম্প্রদায়ের বুক হইতে বেদনা-শল্য তুলিয়া লইবার জন্য এত পরামর্শ, এত দুশ্চিন্তা—এমন কি বৃদ্ধ কবিবরের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিবার পরও, তাঁহাদের পছন্দসই অংশটুকুকে প্রত্যেক জাতীয় সম্মেলনে এবং কংগ্রেসে আবশ্যিক জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন না কেন?

রবীন্দ্রনাথও যথেষ্ট সমালোচিত এবং নিন্দিত হলেন ; এমনকি তাঁর অনুরাগী ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনও ভিন্ন মত পোষণ করে লেখনী ধরলেন। পত্রিকায় লেখা হল :

> বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় হস্তক্ষেপ অনুমোদন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহার কুফল যে শেষ পর্যন্ত তাঁহার উপরে আসিয়াও বর্তাইতে পারে ইহা সম্ভবত তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই।
>
> [*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৬ নভেম্বর ১৯৩৭]

এই প্রসঙ্গে হয়তো উল্লেখ করা অসংগত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ-রচিত ভারতবর্ষের national anthem টিও এখন খণ্ডিতভাবে শুধু প্রথম স্তবকই সর্বত্র গাওয়া হয়।

বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় চিঠিটির প্রাপক তরুণ লেখক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'গান না শ্লোগান' প্রবন্ধ উপলক্ষ্যে কবি জানিয়েছেন :

> ...ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন কোনো গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয় কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান—এমন কি ব্রাহ্মও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তুমি কি বলতে চাও, 'ত্বং হি দুর্গা', 'কমলা কমলদলবিহারিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি হিন্দু নামধারিণীদের স্তব, ...সর্বজাতিক গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে। হিন্দুর

> পক্ষে ওকালতি হচ্ছে ওগুলো আইডিয়ালমাত্র। কিন্তু যাদের ধর্মে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোনো অর্থই নেই।

জাতীয় সংগীত প্রসঙ্গে আবেগময় উত্তেজনা, উত্তপ্ত বিতর্কের সেই দিনগুলি থেকে আজ আমরা প্রায় সাত দশক দূরে। মনে হয়, সেদিন জাতীয় সংগীতের সমস্যার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধের মিলনোৎসব যে সর্বার্থ আন্তরিকতায় সফল হয়ে উঠতে পারেনি, সেই বেদনাদায়ক স্মৃতিই কি তাঁকে সতর্ক করেছিল? সতর্ক করেছিল দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কহীনতার, মানসিক বিচ্ছেদের টুকরো-টুকরো অভিজ্ঞতা? আশঙ্কা হচ্ছিল, জাতীয় সংগীতের সমস্যা থেকেই হয়তো বেধে উঠবে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা? সুভাষচন্দ্র বসুকে 'বন্দে মাতরম্' বিষয়ে যে ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলেন, পরিশেষে যুক্ত করেছিলেন এই কথাগুলি : 'বাঙালি হিন্দুরা এই আলোচনা নিয়ে চঞ্চল হয়েছেন, কিন্তু ব্যাপারটি একলা হিন্দুর মধ্যে বদ্ধ নয়। উভয়পক্ষেই ক্ষোভ যেখানে প্রবল সেখানে অপক্ষপাত বিচারের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রীয় সাধনায় আমাদের শান্তি চাই, ঐক্য চাই, শুভ বুদ্ধি চাই,—কোনো এক পক্ষের জিদ্‌কে দুর্দম করে হারজিতের অন্তহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই নে।' রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের হয়তো স্বপ্ন ছিল, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এক ধর্মরাজ্য হয়ে উঠবে অখণ্ড ভারতবর্ষ, শুধু মানুষ-পরিচয়েই পরস্পর মেলাবেন হাত, কণ্ঠ মেলাবেন সকলে এক সংগীতে।

[সাহিত্য একাডেমি সভাঘরে আলোচনাচক্রে পঠিত]

বন্দে মাতরম্ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু

জগদীশ ভট্টাচার্য

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করা অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণে আপনার উপদেশের জন্য লিখিতে বাধ্য হইতেছি। এর সঙ্গে পণ্ডিত জহরলালজীর একখানি চিঠি পাঠাইতেছি। তাহা হইতে দেখিবেন যে কংগ্রেস মহলে 'বন্দে মাতরম্' গানের বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। ২৬শে অক্টোবর তারিখে Congress Working Committee-র যে সভা কলিকাতায় বসিবে, সেখানে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। হয়তো উক্ত কমিটি এই গান বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে আপনার মতামত আমি জানি না এবং জানিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি। বাংলা দেশে, এবং বাংলার বাহিরে হিন্দু সমাজে, খুব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে এবং বহু বন্ধুর অনুরোধে আপনার উপদেশ পাইবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি।

৯ই অক্টোবরের "Comrade" পত্রিকায় বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত কে. আর. কৃপালনীর এক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তাহাতে শ্রীযুক্ত *কৃপালনী বিশ্বভারতী* পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বন্দে মাতরম্ গানের বিরুদ্ধেই লিখিয়াছেন। তাঁহার মত বিশ্বভারতীর মত কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

আপনার যদি এই মত হয় যে বন্দে মাতরম্ গানের বর্তমান মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত তাহা হইলে আপনি যদি পণ্ডিত জহরলাল ও মহাত্মা গান্ধীকে এ বিষয়ে লেখেন তাহা হইলে খুব ভালো হয়। মহাত্মাজীর কাছে আপনার কথার কতটা মূল্য আছে তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। জহরলালজী বোধ হয় কলিকাতায় আসিবার পথে আপনার সহিত দেখা করিবেন—অতএব আপনি ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তাঁহাকে নিজেই বলিতে পারেন। মহাত্মাজীকে কিন্তু লেখাই ভালো। তিনি বোধ হয় ২৬শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং ১নং উডবার্ন পার্কে [I Woodburn Park] থাকিবেন।

সতত আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমরা প্রার্থনা করি। আমার বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম আপনি গ্রহণ কবিবেন।

ইতি—

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

চারদিন পরে, ২০/১০/৩৭ তারিখে, কার্সিয়াং থেকেই সুভাষচন্দ্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখলেন :

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার পত্র এইমাত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি কলিকাতায় ২৪শে তারিখে পৌঁছিব এবং সেখানে এক সপ্তাহ্ থাকিব। আমার ঠিকানা—38/2 Elgin Road। মহাত্মাজী ও পণ্ডিত জহরলাল ২৬ শে তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং থাকিবেন—I Woodburn Park-এ। আপনি যদি মহাত্মাজীকে 'বন্দে মাতরম্'-এর বিষয়ে লেখেন, তাহা হইলে বড়ো ভালো হয়, আপনার সাহায্য এ বিষয়ে একান্ত দরকার। আমি জানি না 'ওয়ার্কিং কমিটি' এ বিষয়ে কী করিয়া বসিবেন—কমিটিতে আমি একমাত্র বাঙ্গালী। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে কবিকে অনুরোধ করিবেন মহাত্মাজীকে লিখিবার জন্য। আমি কবিকে লিখিয়াছি, কিন্তু কী ফল হইবে জানি না। অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে পরে লিখিতেছি।

আমার বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

জওহরলাল তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি ২৫শে অক্টোবর একান্তভাবে কবির সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেলেন। ২৬শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে তাঁর মতামত কংগ্রেস-সভাপতি জওহরলালের কাছে নিজের একান্ত-সচিবের মাধ্যমে লিখে পাঠালেন। কবির এই চিঠি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখলেন :

An unfortunate controversy is raging round the question of suitability of 'Bande Mataram' as national song. In offering my own opinion about it. I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine when the author was still alive and I was the first person to sing it before a gathering of the Calcutta Congress, To me the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficient aspects of our motherland made special appeal so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem and from those portions of the book of which it is a part, with all sentiments of which, brought up as I was in the monotheistic ideals of my father, I could have no sympathy.
It first caught on as an approapriate national anthem at the poignant period of our strenuous struggle for asserting the people's will against the decree of separation hurled upon our province by the ruling power. The subsequent developments during which 'Bande Mataram' became a national slogan cannot, in view of the stupendous sacrifices of some of the best of our youths, be lightly ignored at a moment when it has

once again become necessary to give expression to our triumphant confidence in the victory of our cause.

I freely concede that the whole of Bankim's 'Bande Mataram' poem read together with its context is liable to be interpreted in ways that might wound Moslem susceptibilities, but a national song though derived from it which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original poem, need not remind us every time of the whole of it, much less of the story with which it was accidentally associated. It has acquired a separate individuality and an inspiring significance of its own in which I see nothing to offend any sect or community.

মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের এই সমর্থন লাভ করে, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি' সিদ্ধান্ত করেন যে, জাতীয়-সভাসমিতিতে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হলে এই গানের শুধু প্রথম দুটি কলি গাওয়া হবে। তবে এই গানের পরিবর্তে অন্য কোনো সর্বজনগ্রাহ্য গান পরিবেশন করার পূর্ণ স্বাধীনতা উদ্যোক্তাদের থাকবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের মুসাবিদা করেন জওহরলাল স্বয়ং। দিল্লির 'নেহরু স্মারক প্রদর্শনশালা'য় জওহরলালের হস্তাক্ষরে মুসাবিদাটি রক্ষিত আছে।[১০২] আমরা তার নির্বাচিত প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধার করছি :

১...The song and words 'Bande Mataram' were considered seditious by the British Government and were sought to be suppressed by violence and intimidation. At a famous session of the Bengal Provincial Conference held in Barisal in April 1906, under the Presidentship of Shri, A. Rasul, a brutal lathi charge was made by the police on the delegates and volunteers and the 'Bande Mataram' badges worn by them were violently torn off. Some delegates were beaten so severely as they cried 'Bande Mataram' that they fell down senseless. Since then, during the past thirty years, innumerable instances of sacrifice and suffering all over the country have been associated with 'Bande Mataram' and men and women have not hesitated to face death even with that cry on their lips, The song and the words thus became symbols of national resistance of British imperialism in Bengal especially, and generally, in other parts of India. The words 'Bande Mataram' became a slogan of power which inspired our people, and a greeting which ever remind us of our struggle for national freedom.

... ...

The Working Committee feel that past associations, with their long record of suffering for the cause, as well as popular usage, have made the

> first two stanzas of this song a living and inseparable part of our national movement and as such they must command our affection and respect. There is nothing in these stanzas to which any one can take exception. The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India.
> The Committee recognise the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song. While the Committee have taken note of such objection in so far as it has intrinsic value the Committee wish to point out that the modern evolution of the use of the song as part of National life is of infinitely greater importance than its setting in a historical novel before the national movement had taken shape. Taking all things into consideration therefore the Committee recommend that wherever the Bande Mataram is sung at national gatherings only the first two stanzas should be sung with perfect freedom to the organisers to sing any other song of an unobjectionable character, in addition to, or in the place of, the Bande Mataram song.

জওহরলাল-রচিত এই প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মেনে নিলেন 'the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song.' বলাই বাহুল্য, জওহরলাল দুর্গা, কমলা এবং বাণী—এই তিন হিন্দুদেবীর নামই শুধু দেখেছেন। সংগীতের ভাবার্থে অনুপ্রবেশ করে এই নামত্রয়ের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করে দেখার আবশ্যকতা অনুভব করেননি। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতিও তাঁকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। তাছাড়া ভারতের অহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শী মহানুভবতাও নিশ্চয়ই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কংগ্রেস যে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, এ কথা প্রমাণ করা সেদিন বড়ো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু প্রস্তাবের অনুজ্ঞা অংশ 'বন্দে মাতরম্'-এর অশুভ ভবিষ্যতের সূত্রপাত করেছে। ওয়ার্কিং কমিটি যদি সেদিন এই মহাসংগীতের প্রথম দুটি স্তবক গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হতেন তাহলেও হয়তো বলার কিছু ছিল না। কেননা স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বন্দে মাতরম্' যে মহাপ্রেরণা সঞ্চার করেছে, প্রারম্ভিক ভূমিকায় জওহরলাল তার যে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাতে তার প্রতি সুবিচারই করা হ'ত। তিনি বলেছেন, 'There is nothing in the stanzas to which any one can take exception.' এই উক্তি যদি অকপট হয় তাহলে যে-দুটি স্তবক 'living and inseparable part of our national movement' তার বদলে অন্য কোনো গান গাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কেন?

শুধু প্রশ্নই নয়, জাতীয় সংগীতের একটি প্রামাণ্য সংকলনগ্রন্থ রচনার প্রস্তাবও ওয়ার্কিং কমিটি করলেন। উক্ত সংকলনগ্রন্থে সংগীত নির্বাচনের জন্য একটি সাব-

কমিটিও গঠিত হল। তার চারজন সদস্য হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু ও নরেন্দ্র দেব। তাঁরা প্রচলিত অন্যান্য জাতীয় সংগীত পরীক্ষা করবেন। এমন কী, কেউ যদি তাঁর নিজের লেখা নতুন গান পাঠাতে চান তাও তাঁরা গ্রহণ করবেন। কিন্তু, বলা হল, যে-সব গান সহজ হিন্দুস্থানীতে লেখা, অথবা সহজেই হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করা সম্ভব, সেগুলিই সাব-কমিটি গ্রহণ করবেন। ইংরেজি বয়ানে বলা হয়েছে :

> Only such songs as are composed in simple Hindustani or can be adapted to it, and have a rousing and inspiring tune will be accepted by the sub-committee for examination.

এখানেই শেষ নয়, প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হল, ওয়ার্কিং কমিটি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির কাছে সুপারিশ করছেন, তাঁরা যেন তাঁদের নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষায় অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে অনুমোদিত হল। সবচয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল রবীন্দ্রনাথকে এই প্রস্তাবের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা। বলা হল, সাব-কমিটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং তাঁর উপদেশ গ্রহণ করবেন।

ভাবতে বিস্ময় লাগে, জওহরলালের মতো রাষ্ট্রনীতিবিশারদ নেতৃ-পুরুষের সেদিন মনে হয়েছে, কোনো দেশের জাতীয় সংগীত ফরমাস দিয়ে তৈরি করা যায়। জাতীয় সংগীত যে জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা যে জাতীয় ঐতিহ্য থেকেই উৎসারিত জাতীয় বীরবৃন্দের প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত, এই সত্য বিস্মৃত হলে যে বিভ্রান্তি ঘটে সেদিন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সেই বিভ্রান্তিই ঘটেছিল।

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসি জাতীয় সংগীত 'মার্সাই' (Marseillaise)-এর কথা মনে পড়ে। একদিক দিয়ে 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য রয়েছে। স্বদেশি আন্দোলনের দিনে 'বন্দে মাতরম্' ছিল সপ্তকোটিকণ্ঠের জীবনসংগীত। ধীরে ধীরে তা সারা ভারতের জাতীয় সংগীতে রূপান্তরিত হয়। 'মার্সাই'-সংগীতও প্রথমে ছিল 'রাইন-বাহিনীর রণসংগীত'—Battle song of the Rhine Army'. এর রচয়িতা Rouget de Lisle নামে একজন রাজভক্ত এঞ্জিনিয়ার অফিসার। গানটির প্রথম ছটি স্তবক তিনি রচনা করেন ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৪/২৫ এপ্রিলে স্ট্রাসবুর্গে। গানটি অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মার্সাই শহরের জনগণ তাঁদের বিভিন্ন সভাসমিতিতে গান করার জন্য সংগীতটি নির্বাচন করেন। গানের এই বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা দেখে এর রাজানুগ্রহধন্য রচয়িতা কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে ওঠেন। Lamartine লিখছেন, 'It was the fire-water of the Revolution.'

জাতীয় সংগীত জাতীয় সংহতি

ভবতোষ দত্ত

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে আজও ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। এই সেদিনও দক্ষিণ ভারতে জনগণমন নিয়ে আপত্তি শোনা গেল। সে-বিতর্ক ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় পর্যন্ত গড়িয়েছে। কেউ আপত্তি করেছেন, এ গান ঠিক দেশভক্তির গান নয়, ভগবদ্ভক্তির গান। সুতরাং, নতুন গান তৈরি হওয়া দরকার, যে গান সত্যি জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারবে। এই বিতর্কের সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ হিন্দি বা উর্দু ভাষায় লেখা জাতীয় সংগীতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। আমাদের জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে সব সংশয়ের নিরসন যে এখনও ঘটেনি, ভারতীয় হিসাবে সেটা আমাদের নিয়তি। যে-দেশে এত অজস্র বৈচিত্র্য সে দেশের চিন্তার ধারাকে একটি খাতে বইয়ে দেওয়া শক্ত। অবশ্য দেশ বা জাতি সম্পর্কে তো কোনো সংশয় থাকবার কথা নয়। এ দেশ আমার বা আমি ভারতীয়—এই বোধ ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডের যে-কোনো প্রান্তেরই মানুষের বোধ হওয়া উচিত। কিন্তু আজ চারিদিকে তাকালে অবস্থা যেন অত সহজ মনে হয় না। শক, হুণ, পাঠান, মোগল, হিন্দু, মুসলমান, দ্রাবিড়, আর্য, কিরাত, শবর—সবাইকে নিয়ে যে জাতি তার ইতিহাস অন্য দেশের মতো নয়। সে-কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন এবং তাঁর গান 'জনগণমন'-এ তার স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে।

জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে বলতে গেলে স্বভাবতই জাতির ধারণাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। কারণ জাতীয় সংগীত কোনো সম্প্রদায় অর্থে জাতির গান নয়, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ, হিন্দু বা মুসলমানের গান নয়। জাতি সম্বন্ধে আমাদের এই পুরাতন ধারণা থেকে উত্তীর্ণ হতে বহু সময় লেগেছে। এখনও আমরা উত্তীর্ণ হতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। একরাষ্ট্র-পরিচালিত সমমনোভাবাপন্ন একটি বৃহৎ মানবসমাজকে আমরা আজকাল বলি জাতি। এর দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যে সর্বত্র। প্রায় সব দেশেই এক জাতির ভাষা একটা ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক ভাষা থাকলেও ভাষার পার্থক্যটা বড়ো না হয়ে সমমনোভাবটাই বড়ো হয়েছে। তাই তারাও জাতি। ভারতবর্ষে ভাষা অজস্র, ধর্মও বহু, আচার বিধিও অঞ্চলভেদে বহু। আমরা যখন বলি, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত একটি অখণ্ড ঐক্য বিরাজমান, তখন কথাটা হয়তো এক অর্থে ঠিকই বলি, তবু মনে রাখা দরকার এর মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মের মধ্যেও আচার বিধিতে পার্থক্য

আছে। এমনি করে আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের পার্থক্যকেও দেখানো যেতে পারে। তবু ইতিহাসের নিয়তি আমাদের সবাইকে একসূত্রে গেঁথেছে। আজ বহু বৈচিত্র্য ও বর্ণভেদ সত্ত্বেও আমরা একজাতি। এই বৈচিত্র্যকে নিয়ে যে জাতীয় সংগীত সেটাই আমাদের সংগীত। এ কথাটা মনে রাখার দরকার এইজন্যই যে, সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো দেশের জাতীয় সংগীতে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করবার দরকার হয় না।

এই বৈচিত্র্যকে নিয়ে আত্মচেতনার অভিব্যক্তির একটি ইতিহাস আছে। আমাদের জাতীয় সংগীত তারই প্রবণতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের পূর্বতন সাহিত্যে বা শাস্ত্রে আজকের মতো রাষ্ট্রনির্ভর জাতিচেতনার কথা পাওয়া যায় না। এই জাতিচেতনার সূচনা হল উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রথমে দেশচেতনা তারপরে জাতিচেতনা। যে-মাটিতে বা যে কুলে জন্মেছি, তার প্রতি আকর্ষণ মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গীয় সংস্করণে একটি সুন্দর শ্লোক আছে :

ন সে স্বর্ণময়ী লঙ্কা রোচতে তাত লক্ষ্মণ।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

এই সমতা রাজনৈতিক অর্থে দেশপ্রীতি নয়, জন্মভূমির প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসা। এর কোনো কারণ খোঁজবার দরকার হয় না। উনিশ শতকে এই দেশপ্রীতিই সাহিত্যে ও সংগীতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার রূপ একটু অন্যরকমের হল। দেশ বলতে একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ ভূমিকে বোঝানোর দরকার। ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশ তখন আমাদের সাহিত্যে ও কবিতায় স্থান নিয়েছে। সাহিত্যে দেশচেতনার স্থান পাওয়ার তাৎপর্য গভীর। কারণ শাস্ত্রে বা পুরনো সাহিত্যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ কোনো অখণ্ড দেশের কথা প্রচলিত ছিল না। বিষ্ণুপুরাণে জম্বুদ্বীপের প্রশস্তি আছে। কিন্তু আমার দেশ বলে কবি কখনো নির্দিষ্ট সীমাকে নির্দেশ করেননি। ভারত বা বঙ্গভূমিকে স্বদেশ বলে নির্দেশ করে গৌরব বোধ করার দৃষ্টান্ত নেই। আমাদের পুরনো বাংলা সাহিত্যে সে-রকম কিছু পাওয়া যায় না। উনিশ শতকে ডিরোজিওর ইংরেজি কবিতায় প্রথম পাওয়া গেল To India my native land. বাংলা ভাষাতে ভারতবর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। তিনিই প্রথম ভারতভূমিকে 'জননী' বলে সম্বোধন করেছিলেন .

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?

এটা ১৮৪৭ সালে লেখা কবিতা। তখন থেকেই ধরা যেতে পারে ভারতবর্ষ কবিদের

চেতনায় জননীরূপে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। বাংলাদেশ এবং বাঙালির কথা স্বাভাবিকভাবেই নানা উপলক্ষে পূর্ববর্তী লেখকদের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাই ছিল এই বাংলাদেশচেতনার কারণ। সেটা বোঝা যায়, কিন্তু ভারতভূমিকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করে নেবার কল্পনা কীভাবে এসেছিল বলা যায় না। কয়েক বৎসর পর মধুসূদন লিখেছেন 'বঙ্গভূমির প্রতি'। সেখানে বঙ্গভূমিকেই তিনি জননী স্বরূপা জ্ঞান করেছেন। আর তাঁর অন্তিম প্রার্থনা ছিল 'জ্যোর্তিময় কর বঙ্গ ভারতরতনে' (১৮৬৫)। এখানে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ মিশে গেছে।

দেশচেতনার সঙ্গে ক্রমে অনুভূত হল জাতিচেতনা। জাতিচেতনার সৃষ্টি বিশেষ তাৎপর্যসহ ঐতিহাসিক ঘটনা। যে-বঙ্গ এবং ভারতকে কবিরা দেশ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তার অধিবাসীরা সবাই একটি সমাজে বদ্ধ। সেই সমাজ সম্বন্ধে একটা সমগ্রতা ও অখণ্ডতাবোধেই জাতিধারণার উদ্ভব। আগে আমরা ছোটো ছোটো গণ্ডিতে বাস করেছি। দেশচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ বা জাতির অনুভব দেখা দিতে লাগল। নানা ধর্ম আছে তাতে, নানা মত এবং নানা রূপ নিয়ে এই বৃহত্তর জাতিকে আমার ক্ষুদ্রতর জাতির ঊর্ধ্বে স্থান দেবার কর্তব্যবোধ আমাদের কাছে নতুন আদর্শ স্থাপন করেছে। এই জাতিভাবনাটিও নতুন। তখনও পর্যন্ত ভারতীয়রা একজাতি কিনা—এ বিষয়ে বিচারবিশ্লেষণ আরম্ভ হয়নি কিন্তু অগোচরেই যেন একজাতীয়তাবোধ জেগে উঠেছে। কয়েক বছর পর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে জাতিচেতনার বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন *ভারতকলঙ্ক* প্রবন্ধ (১৮৭৩)। তাতে ভারতীয়দের মধ্যে একজাতীয়তাবোধ গড়ে উঠবার বাধা কোথায়, তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিভিন্ন যুগে বহু জাতির মিশ্রণে ভারতীয় জাতির বর্তমান রূপ। তাই ভারতীয়দের মধ্যে এতো বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথ বলবার আগেই উনিশ শতকের মনীষীদের দৃষ্টিতে ভারতীয় ইতিহাসের এই দিকটি চোখে পড়েছিল। তবু ভারতীয়রা সবাই যে এতো বৈচিত্র্য নিয়েই এক জাতি, এ কথাটিও তাঁরা অনুভব করেছেন।

বৈচিত্র্যময় ভারতীয় জাতীয়তার সংগীত প্রথম শোনা গিয়েছিল ১৮৬৭ সালের হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে। হিন্দুমেলার পরিকল্পনা এসেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র। তাঁরা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা। রাজনারায়ণ জাতীয় 'গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভাস্থাপনের প্রস্তাব' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার ভাব সঞ্চারিত করা। এই ভাবটি নিয়ে নবগোপাল মিত্র আরম্ভ করেন হিন্দুমেলা ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল। দেশানুরাগ জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনী, দেশীয় খেলাধুলা, ব্যায়াম, কবিতাপাঠ ইত্যাদির আয়োজন হয়। এই মেলার উদ্‌বোধন হত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গাও ভারতের জয়' গানটি দিয়ে।

মিলি সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান।
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়
গাও ভারতের জয়।

অতঃপর এই গানে ভারতের অতীত গৌরবগাথা ও আদর্শ চরিত্রের উল্লেখের দ্বারা উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়াসে জাতীয় সংগীতের পূর্বাভাস রচিত হয়েছে। ১৮৭৫-এ হিন্দুমেলায় বালক রবীন্দ্রনাথ যে 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি পড়েছিলেন এই গানে ছিল তারই পূর্বসূত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯-এর চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বইটির সমালোচনায় এই গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে বললেন—

'রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।'

তখনও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ গানটি কল্পনায় আসেনি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটির মধ্যে দেশমূর্তি দেখা দিয়েছে, সেইসঙ্গে দেখা দিয়েছে জাতীয় উদ্দীপনা :

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়
যতোধর্ম স্ততো জয়।
ছিন্নভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?

এর প্রায় দশ বৎসর আগে রঙ্গলালের *পদ্মিনী উপাখ্যান* কাব্যে রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব কল্পনা করে কবি লিখেছিলেন :

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানে এই দুই গানের ভাবনির্যাস ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের এই গানটিতে আর একটি বিশেষত্ব ছিল যার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর রচিত রবীন্দ্রনাথের জনগণমন গানটিতে। জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে গিয়ে কবি ভোলেননি ধর্মের জয়ের কথা। মনে রাখা ভালো, 'যতোধর্ম স্ততো জয়' এই মহাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন মহাভারতের যুদ্ধের প্রাক্কালে গান্ধারী। দুর্যোধন যখন জননীর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গেলেন, তখন গান্ধারী বলতে পারেননি— তোমাদের জয় হোক। তিনি বললেন, যেখানে ধর্ম সেখানে জয়। আমাদের জাতীয় উদ্দীপনাতেও আমরা ধর্মকেই স্মরণ রেখেছি—যে-ধর্ম সর্বজনীন মানবধর্ম। আমাদের জাতীয় সংগীতের মধ্যে এই তিনটে বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাই—দেশের ভৌগোলিক প্রতিমা, ঐক্য ও সংহতি চেতনা এবং ধর্মবোধ। এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি একান্তই আমাদের। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সংগীতে দেশের জন্য গৌরববোধ আছে, দেশমূর্তিকেও উজ্জ্বল করে তোলার প্রয়াস আছে সেই সঙ্গে আছে একত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণাদায়ক রৌদ্রভাব। রৌদ্রভাব আমাদের সেকালের প্রায় সব দেশাত্মবোধক গানেই থাকত। আজ মনে হয় তার দরকারও ছিল। একটি বিখ্যাত গান সরলাদেবীর 'হিন্দুস্থান'। এই গান প্রথম গাওয়া হয়েছিল কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে ১৯০১ সালে :

অতীত গৌরব বাহিনী সম বাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান
মহাসভাউন্মাদিনী সম বাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান।
কর বিক্রম বিভব যশ সৌরভ পূরিত সেই নাম গান
বঙ্গ বিহার উৎকল মারাঠা গুর্জর পঞ্জাব রাজপুতান
হিন্দু পার্সি জৈন ইসাই শিখ মুসলমান,
গাও সকল কণ্ঠে সকলভাবে—নমো হিন্দুস্থান।
জয় জয় জয় হিন্দুস্থান, নমো হিন্দুস্থান।
ভেদরিপু বিনাশিনী সম বাণী, গাহ আজি ঐক্য গান।
মহাবলবিধায়িনী সম বাণী, গাহ আজি ঐক্য গান।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের অতীত গৌরববোধ, ভারতীয় জাতিসংহতি এবং প্রবল অনুপ্রেরণা এই গানটিতে সার্থকতর শিল্পরূপ লাভ করেছে। সংহতি ও বৈচিত্র্য একই সঙ্গে এতে আছে, রবীন্দ্রনাথের জনগণমন-এ সেই কল্পনারই নবরূপ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওই গানটি যেমন সরলা দেবী ও রবীন্দ্রনাথের গানের পূর্বরূপ, তেমনি বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্'-এরও অঙ্কুর সেখানেই। এই গান বঙ্কিমকে কতখানি অভিভূত করেছিল, বঙ্কিমের শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্যই তার প্রমাণ। ১৮৭৫ সালে বঙ্কিম যখন

'বন্দে মাতরম্' গান রচনা করেন, তখন এই গানটি তাঁর মনে ছিল না তা হতে পারে না। বঙ্কিম তখন দেশভাবনায় মগ্ন। কিছুকাল আগে সুহৃদ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' বেরিয়েছে যাকে তিনি বলেছিলেন একমুঠো সোনা। বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস নিয়ে বঙ্কিম বেশ কিছুদিন থেকেই জিজ্ঞাসু ছিলেন। বাংলার ইতিহাস নেই বলে তাঁর দুঃখও কম ছিল না। রাজকৃষ্ণের বইতে তিনি বাঙালির গৌরবের প্রমাণ পেলেন। তা ছাড়া 'বন্দে মাতরম্' রচনার অন্য উপলক্ষ্য ছিল। *আনন্দমঠ* তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সত্যেন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' গানের মিল প্রধানত দুদিক দিয়ে। দেশের একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরূপ দুজনের গানেই পাওয়া যায়, দুজনের গানেই আছে বীর্যের প্রণোদনা। 'ফলবতী বসুমতী স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী'র ছবিটি বঙ্কিমের গানে সুজলা সুফলা মাতৃভূমির রূপ নিয়েছে।

যে রূপান্তর বঙ্কিম করলেন সেটির তাৎপর্য হল সুদূর প্রসারী। সত্যেন্দ্রনাথের গানটি মূলত বিবৃতিধর্মী, তাতে ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা কম। 'বন্দে মাতরম্' গড়ে উঠল এক মাতৃমূর্তি, সংগীতের ঝঙ্কারে, ছন্দস্পন্দনে চিত্ররূপময়তায় 'বন্দে মাতরম্' হল একটি পরিপূর্ণ সার্থক কবিতা। এই গানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর নারীরূপ। দেশকে জননী বলে সম্বোধন করেছেন আগের কবি, কিন্তু মায়ের মূর্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি। 'বন্দে মাতরম্'-এর চোখে পড়বার মতো বৈশিষ্ট্য হল দুটি—একটি ওই দেবী বা মাতৃরূপ, অন্যটি এর বিষয়, বাংলাদেশ। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গণেন্দ্রনাথ যে-গান লিখেছিলেন, ভারতচেতনা তার অবলম্বন। কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ও লিখেছিলেন 'কতকাল পরে বল ভারত রে! দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।' হেমচন্দ্রের ভারতবিলাপ ভারতসংগীত প্রভৃতি কবিতাও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের যুগের রচনা। এই পরিপূর্ণ ভারতীয় দেশচেতনার মধ্যে বঙ্কিম যে-সংগীত রচনা করলেন সেটি বঙ্গভূমিকে নিয়ে। আজকালকার সমালোচকেরা হয়তো বলবেন, বঙ্কিমের দেশচেতনা সংকোচনধর্মী। কথাটা নিয়ে তর্ক হতে পারে, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। যে-সময় তিনি 'বন্দে মাতরম্' লেখেন, তার কিছু আগেই ভারত সম্বন্ধে প্রবন্ধও তিনি লিখছেন। তবু যে তিনি বাংলাদেশকেই তাঁর প্রগাঢ় দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন, তার কারণ বঙ্গভূমি স্বভাবতই অধিকতর প্রত্যক্ষের বস্তু, বিশেষ করে ভাষার মাধ্যম থাকায়। এটা বলার দরকার নেই যে সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদিত বঙ্গভূমির প্রশস্তি রচনার উদ্দেশ্য অবশ্যই বাঙালিকে জাতি হিসেবে আলাদা করে নেওয়ার জন্য নয়, সেটা তখন কল্পনাতেও ছিল না। বাংলার ইতিহাস এবং বাঙালি জাতি সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখলেও ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতি হিসেবে ভাববার কোনো প্রমাণ কোথাও নেই।

এই বাংলাদেশকেই বঙ্কিম নারী প্রতিমায় রূপ দিলেন। তবে এই প্রতিমা ঠিক যে

দুর্গা তা বলা চলবে না। তাঁকে বলেছেন ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী আবার তাঁকেই বলেছেন কমলা কমলদলবিহারিণী। অর্থাৎ তিনি দুর্গা এবং কমলা—কোনো একটা বিশেষ প্রচলিত রূপ তাঁকে দেননি। দুর্গার বরাভয় শক্তি এবং কমলার ঋদ্ধি সবকিছুরই তিনি সম্মিলিত প্রতিমা। আবার তিনি বাণীও। বঙ্কিমের দেশমাতৃকা শক্তি, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, ধর্ম, মানুষের পরমার্থ বলতে যা বোঝায় সব কিছুরই প্রতীক। এবং তাঁর প্রত্যক্ষ রূপ হচ্ছে শস্যশ্যামলা শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিত বঙ্গভূমির নিসর্গ প্রকৃতি। এই বর্ণনার ফলে এই গানটির মধ্যে এসেছে ভাবরূপ, শুধু ঐতিহাসিক তথ্য নয়, কিংবা প্রত্যক্ষ উন্মাদনা সৃষ্টিও নয়। অবশ্য হিন্দুর দুর্গামূর্তি লক্ষ্মী সরস্বতীকে নিয়ে অসুরবিনাশিনী শক্তির ভাবমূর্তি। আমরা এমন একটা শক্তির আরাধনা করি যে শক্তি অশুভকে বিনাশ করবে এবং সেই সঙ্গে বিদ্যা ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি দেবে। সেই মূল শক্তির রূপকল্পনা করা হয় লক্ষ্মী সরস্বতী বেষ্টিত দশভূজা মূর্তিতে। বঙ্কিমের মাতৃমূর্তিতেও সব শক্তির সমাহার। কিন্তু প্রচলিত কল্পনাতে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের আলাদা আলাদা মূর্তি। 'বন্দে মাতরম্'-এর দেবীমূর্তি একজন, তিনি একাই সব বৃত্তি এবং কাঙ্ক্ষিত ধর্ম অর্থ মোক্ষের প্রতীক। সুতরাং, মানুষ যে শক্তি বিদ্যা ও ধর্ম কামনা করে বঙ্কিমের দেশজননী সেই সবকিছুরই সংহত রূপ। এই কল্পনাতে দুর্গার প্রচলিত রূপ নেই, তবে মানুষের সকল কাম্যবস্তুর একটি রূপ কল্পিত, যার সঙ্গে মিশেছে স্বদেশের নিসর্গ রূপের চেতনা। সব মিলিয়ে বঙ্কিমের জননী হচ্ছেন প্রত্যক্ষ দেশচেতনা। কাব্য হিসেবে এর সার্থকতা হচ্ছে ভাবময়তার উত্তরণে। দেশের নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে দেশের মানুষের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষাকে মিলিয়ে এর রচনা। বঙ্কিমের কমলাকান্তের একটি রচনায় কালসমুদ্রে নিমজ্জিতা দুর্গাকে আবার উদ্ধার করে নিয়ে আসবার স্বপ্ন আছে। সেখানে দুর্গাকেই বলেছেন 'চিনিলাম এই আমার দেশ'। ব্যক্তিগত বর্ণনাতেও দেখা যায়. বঙ্কিমগৃহে কোনো এক দুর্গাপূজার রাত্রিতে তাঁর মনে ভাবের প্রেরণা এসেছিল। 'বন্দে মাতরম্'-এর দেশমূর্তির উৎস হিসেবে অষ্টমী পূজার দিনের দুর্গাধ্যান হয়তো কাজ করেছিল। অর্থাৎ বঙ্কিমের একটা প্রবর্তনা এসেছিল ধর্মানুষ্ঠান থেকে, কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট বস্তু ধর্মীয় প্রতিমা নয়। মাতৃমূর্তি কল্পনাতেই ধর্মের রূপকল্প তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

বোধ হয় দেশবোধকে সত্য এবং ভাবাবেগপূর্ণ করতে অভ্যস্ত ধর্মের সংস্কার বলাধান করে। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটিতেও যাকে সম্বোধন করা হয়েছে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেশ নন, দেশের এবং মানবমাত্রেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা—ব্রহ্ম। ব্রহ্মোপাসনায় তাঁকে স্মরণ করা হয় 'পিতা নেহসি' বলে। তিনি পিতা, মাতা নন। অর্থাৎ নারীরূপে তাঁকে ভাবা হয়নি। জনগণমন গানটি সেদিন ব্রহ্মসংগীতরূপেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৯১১ সালে। 'বন্দে মাতরম্' গানটি মনে ভাবাবেগের সৃষ্টি করে, শক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে অকল্যাণকে দূর করবার উৎসাহমূর্তি রচনা করে, জনগণমন

গানে অনেকটা চিরন্তন ভাগ্যবিধাতার কল্পনায় মনকে শান্ত করে, নির্বেদ-জাতীয় ভাবমণ্ডল রচনা করে। এইজন্যই বন্দেমাতরম হিন্দুর ধর্ম চেতনা থেকে সৃষ্টি হলেও কর্মে ও অনুষ্ঠানে প্রবর্তিত করে—আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য আছে। এ কথা তো সকলেরই জানা যে জনগণমনের ভাগ্যবিধাতা কোনো সম্প্রদায়ের সংস্কার থেকে কল্পিত নয়, তিনি হিন্দু-মুসলমান যে-কোনো সম্প্রদায়েরই ধ্যানযোগ্য কল্পনা। 'বন্দে মাতরম্'-এর দেশজননী বিশেষ কোনো অনুষ্ঠেয় ধর্মের কল্পিত প্রতিমা না হলেও হিন্দুর প্রচলিত চিত্রকল্প দিয়ে তৈরি ; মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা গড়বার কল্পনাতে সেই সংস্কার অলক্ষ্যে কাজ করেছে। সেইজন্যই পরে একশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে এই নিয়ে আপত্তিও হয়েছে।

আনন্দমঠে 'বন্দে মাতরম্' সন্নিবিষ্ট হবার পরেও দীর্ঘকাল এই আপত্তি শোনা যায়নি। আপত্তি হওয়ার রাজনৈতিক যোগাযোগ আমরা আলোচনা করছি না। জাতীয় সংগীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম্'-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি। আমাদের জাতীয় জাগরণে মুসলমান সম্প্রদায় দীর্ঘকাল নানা ঐতিহাসিক কারণে কিছু উদাসীন ছিল। তখনকার বাংলাসাহিত্যে ও সমাজে হিন্দু ধর্মভুক্ত চিন্তা ও কর্মনায়কদেরই দেখতে পাই। বঙ্কিমও সে রকমই একজন ভাবুক। তাই তাঁর রচিত গানেও তার ছায়া পড়েছে। বিশেষ করে *আনন্দমঠে* প্রযুক্ত হওয়াতে এই গানের সাম্প্রদায়িক চেতনা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ সেই বইতে আঠারো শতকের মুসলমান রাজশক্তি সম্পর্কে মন্তব্য অকরুণ।

কিন্তু ইতিহাসের এ তথ্য অস্বীকার করব কী করে যে এই গান জাতীয় জীবনে কী অসাধারণ প্রেরণা দিয়েছে। এই প্রেরণার কারণ 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রত্যক্ষ দেশবর্ণনা ও মানবিকভাবের রূপায়ণ। সত্য সত্যই মানুষের মন যে ভাবের আলোড়নে আলোড়িত হয়, এই গানে তারই প্রতিফলন। তাই সহজেই এই গান মনকে উদবেলিত করে। রচনার পরেও কয়েকবছর বঙ্কিম গানটি প্রকাশ করেননি। তারপর ১৮৮২ সালে *আনন্দমঠে* এটি যথাযোগ্যভাবে সন্নিবিষ্ট হলে, বাঙালি এই গানের কথা জানতে পারে এবং আলাদা করে এটি খ্যাতিলাভ করে। ১৮৮৫ সালে ঠাকুরবাড়ির *বালক* পত্রিকায় 'গান অভ্যাস' বিভাগে এই গানটিকে উদ্ধৃত করে বিশেষিত করা হয় 'বিখ্যাত' বলে। সেইসঙ্গে একটি ছবিও ছাপা হয়েছিল হরিশচন্দ্র হালদারের আঁকা। ছবির বিষয় বহু সন্তান বেষ্টিত এক জননী। সেই জননী একজন সাধারণ বাঙালি মূর্তি, তাতে কোনো পৌরাণিক গরিমা আরোপিত হয়নি। ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'বন্দে মাতরং'। এটি যে বঙ্কিমের গান থেকেই অনুপ্রেরিত তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু গানের দেবীর দেবী ঐশ্বর্য এতে দেখানো হয়নি। *আনন্দমঠে* সন্নিবিষ্ট হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে পড়ার আরও নিদর্শন আছে। কবি হেমচন্দ্র লিখেছিলেন :

গাহিল সকলে মধুর কাকলি, গাহিল বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জসশীতলাং সুখদাং বরদাং মাতরম্।

১৮৮৬ সালে কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে হেমচন্দ্রের এই কবিতা লেখা। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি। 'বন্দে মাতরম্' এই সভায় সত্য সত্যই গাওয়া হয়েছিল কিনা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের পরিবার সমাজে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ তখন সকলেরই পরিচিত। সেইজন্যই অনুমান করা যায় কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তখন নবীন হলেও গান গাইবার জন্য আহূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি রামপ্রসাদী সুরে, গানের বর্ণনাও খুবই সাধারণ আকুল ভাবের সরল অভিব্যক্তি:

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ওই ডেকেছে কে
সেই গভীর স্বরে উদাস করে—আর কে কারে ধরে রাখে ॥

এই গানে 'বন্দে মাতরম্'-এর ধ্রুপদী গাম্ভীর্য নেই, পৌরাণিক কল্পনা নেই, 'বন্দে মাতরম্'-এর মা যেন আমাদের ঘরের মা হয়ে এসেছেন, পুরাণের চণ্ডী যেমন রামপ্রসাদের আগমনি গানে ঘরের মেয়ে হয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিমের মাতৃআহ্বান নানারূপে নানাভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় সরল সুরের মধ্য দিয়ে দেশমাতাই নানাভাবে দেখা দিয়ে বাঙালি চিত্তকে ভরে দিয়েছেন।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি
ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে—

কিংবা

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী

কিংবা

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।

ইত্যাদি বহুগানে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকেই জননীরূপে আহ্বান করেছেন। দেশকে মা বলে ডাকাটা আমাদের রক্তের সংস্কারই বলতে পারি। এর কারণ খুবই সহজ—মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের মতো এতো সহজ স্বাভাবিক এবং নিকটতম সম্পর্ক আর নেই। শিশু মাকে সর্বদা ঘরে পায়, পিতা থাকেন তাঁর গাম্ভীর্য নিয়ে বাইরের কাজে।

বঙ্কিমের মাতৃভাবনার পৌরাণিক কল্পনা থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছেন মায়ের লৌকিক রূপে। শুধু মাতৃভাবনায় নয়, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে আরও বহু স্বদেশি গান রচনা করেছিলেন। তার সবগুলি যে মাতৃরূপের প্রশস্তি তা নয়, আশা উৎসাহ উদ্দীপনা ভরসা জাগানোর জন্য সেগুলি রচিত। কিন্তু সেগুলি বাঙালি সমাজ ছাড়িয়ে প্রচারিত হয়নি। সেগুলি বাঙালিরই গান, বাঙালিরই সুর, বাঙালি হৃদয়কেই বিশেষভাবে স্পর্শ করে। বঙ্কিমের জাগানো বঙ্গচেতনারই পরবর্তী বিকাশ, তাই বোধ হয় বাঙালির মধ্যেই প্রচলিত। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ নামক ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে। একে বলতে পারি বাঙালি জাতীয়তাবাদ। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের মধ্যে ফলপ্রসূ হয়নি, হয়েছে অনেক পরে ১৯৭২-এ বাংলাদেশ নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্মের ফলে।

আবার 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের মধ্যে সপ্তকোটি বাঙালির কথা থাকলেও এ গানটিকে সর্বভারতই গ্রহণ করে নিয়েছিল জাতীয় সংগীত বলে। ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের প্রথম দিনের উদ্‌বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ এই গানটি গেয়ে। তারপরেও জাতীয় কংগ্রেসে বিভিন্ন বৎসরে অধিবেশনের উদ্‌বোধন করা হয়েছে বন্দেমাতরম্ গান দিয়ে। এখানে অবশ্য একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬-র অধিবেশনে বন্দেমাতরম্ গাইলেন, প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেন, 'তিনি সম্ভবত এই গানের প্রথম অনুচ্ছেদ সুখদাং বরদাং মাতরম্ পর্যন্তই গেয়েছিলেন। ১৯০০ সালে প্রকাশিত সরলাদেবীর 'শতগান' পুস্তকেও শুধু এই অংশটুকুরই রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর পাওয়া যায়।' পরে যখন জাতীয় সংগীত নির্বাচনের প্রয়োজন হয়, তখনও রবীন্দ্রনাথের মত ছিল এই যে 'বন্দে মাতরম্'কে যদি জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করতেই হয়, তবে ওই প্রথমাংশ টুকুকেই করা যেতে পারে।

'বন্দে মাতরম্' গানটি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই অনায়াসে প্রচারিত হয়ে গেল। দেশের মুক্তিকামী তরুণ সন্ত্রাসবাদীরা এই গানটিকে কণ্ঠে ধারণ করলেন। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি গঠিত হয় বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মের নাম নিয়ে, তাঁরা *আনন্দমঠ* 'বন্দে মাতরম্' আর গীতা এই নিয়ে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গে ব্রতী হলেন। ফলে এঁদের মুখে মুখে 'বন্দে মাতরম্' বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। অরবিন্দ-তিলক 'বন্দে মাতরম্'কে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করে নিলেন। সখারাম গণেশ দেউস্কর বাংলার ভাবধারাকে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করবার অন্যতম বাহক হলেন। সরলাদেবী কাশীর কংগ্রেস অধিবেশনে সপ্তকোটিকে ত্রিংশকোটিতে পরিবর্তিত করে সর্বভারতের ক্ষেত্রে

এর প্রযোজ্যতা প্রতিপন্ন করেছিলেন। শাসক ইংরেজও পরোক্ষে 'বন্দে মাতরম্'কে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিতে বাধ্য হলেন যখন এই গান গাওয়া নিষিদ্ধ হল এবং 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হল। এই গানের গুরুত্ব স্বীকৃত হল এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে আলোচনাযোগ্য হওয়ায়, বিদেশে ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হওয়ায়। *আনন্দমঠ* প্রধান উপলক্ষ্য হলেও গানের তাৎপর্য প্রাসঙ্গিক ভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

লক্ষ করবার বিষয় এই যে 'বন্দে মাতরম্' আর বঙ্গভূমির প্রশস্তি রইল না, সে হল সমগ্র ভারতের জাতীয় সংগীত। এরকম প্রশ্ন কেউ তুলে ছিলেন কিনা জানি না যে, এতে তো সমগ্র ভারতের অন্তরের কথা নেই, এ কেবল বাংলা অঞ্চলের কথা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'জাতিধর্ম' বা nation এবং nationality নিয়ে নানা আলোচনার সূত্রপাত হল। সমগ্র ভারতবর্ষ এবং তার সভ্যতার প্রকৃতির আলোচনা চলতে লাগল। সেই আলোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি মনীষী। রবীন্দ্রনাথের এ সময়ের বিভিন্ন লেখায় ভারতের ইতিহাসের নিজস্ব প্রকৃতি এবং তার বৈচিত্র্যধর্ম, ভারতচিত্তের মানবতাবোধ—এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যাত হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি যেমন বঙ্গভূমিকে নিয়ে প্রচুর গান রচনা করেছিলেন, কথা ও কাহিনীর 'দুই বিঘা জমিতে' প্রণাম করে বলেছিলেন :

নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

তেমনি আবার সেই সময়েই লিখছেন :

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি
দিন আগত ওই ভারত তবু কই
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবা সাথে।

কিংবা ভারতবর্ষের অতি অপূর্ব ভৌগোলিক মাতৃমহিমা—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননীজননী।।
নীল-সিন্ধুজল-ধৌতচরণতল অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বরচুম্বিত ভালে হিমাচল শুভ্রতুষারকিরীটিনী।।

ধ্যানী ভারতবর্ষের রূপ—

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর
নদীজপমালা-ধৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে।

এই তৃতীয় গানটি সেই ভারতবর্ষেরই স্তুতি যে-ভারতকে কবি তাঁর নিজের দৃষ্টিতে দেখেছেন—শুধু কবির দৃষ্টিতে নয়, ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে। ভারতবর্ষের যে-অধ্যাত্মসাধনা হোমরত তপস্বী প্রতীকে কবির নানা রচনায় প্রকাশিত, এখানে ভারতের হিমালয়-নদী প্রান্তরের প্রাকৃতিক চিত্রে তাই কাব্যরূপ লাভ করেছে। আবার 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-বহুসংস্কৃতির দ্বন্দ্বমিলনের ইতিহাস রচনা করেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি যে বহুজাতির মিলনমূলক সভ্যতার কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করেছেন তার ছবি এঁকেছেন এই কবিতাতেই :

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।।

এই ছবিটিই কবি আবার এঁকেছেন জনগণমন গানটিতেও। শেষ পর্যন্ত জনগণমনই ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত হল। আকস্মিকভাবে নয়, এ গানেরও ইতিহাস আছে।

এ গান রচিত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। রচনার একটি উপলক্ষ্য ছিল। এই উপলক্ষ্য নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। আজ অবশ্য সংশয়াতীতভাবে তার অবসান হয়েছে। ১৯১১-র ৩০-এ ডিসেম্বর কলকাতায় পঞ্চম জর্জের আগমনের তিনদিন আগে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইতিপূর্বে দিল্লিতে ভারতসম্রাট বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এজন্য বাঙালি নেতারা স্থির করেন কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে সম্রাটকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। সেজন্য উপযুক্ত গানও চাই, গানটি রাজপ্রশস্তিমূলক হওয়া দরকার। সে-সময় রবীন্দ্রনাথের কথাই সবার মনে পড়ল। নেতৃস্থানীয় রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান জনৈক ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে এরকম একটি গান রচনা করে দিতে অনুরোধ করেন। তখন রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতে—

'রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের

সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারত ভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন অভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক।'

গানটি সম্রাটের রাজপ্রশস্তি নয় অবশ্যই, তবে রচনার উপলক্ষ্য ছিল সম্রাটের কলকাতা আগমন। কলকাতা কংগ্রেসের প্রথম দিনে গাওয়া হল 'বন্দে মাতরম্', দ্বিতীয় দিনে গাওয়া হল জনগণমন এবং একটি হিন্দি রাজপ্রশস্তিমূলক গান 'যুগজীব, মেরা বাদশা চহুঁ দিশ রাজ সবায়া'। এই গানটির রচয়িতা সরলা দেবীর স্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরী। তৃতীয় দিনে গাওয়া হল সরলা দেবীর 'অতীত গৌরব বাহিনি'। রাজস্তুতিমূলক হিন্দিগানটি গাওয়ার দিনে জনগণমন গান গীত হওয়ায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানটির সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না বলেই এবং সেই গান অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করবে বলেই গাওয়া হয়েছিল। প্রশস্তির উদ্দেশ্যে নয়। প্রশস্তির উদ্দেশ্যে ফরমায়েশ দিয়ে রচিত হয়েছিল হিন্দি গানটি। কিন্তু এই জনগণমন গানটিই কয়েকদিন পর মাঘ মাসের *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* মুদ্রিত হয়। তাতে পরিচয় হিসেবে লেখা হয় 'ব্রহ্মসংগীত'। এর দ্বারা আর কোনো সংশয়ই থাকে না যে জনগণমনের ভারতভাগ্যবিধাতা পরব্রহ্ম ছাড়া কেউ নন, সম্রাট তো ননই, দেশও নয়। এতে জাতীয় সংগীত বলতে আমাদের যা ধারণা, দেশ-এর উদ্দিষ্ট নয় বলাতে এতে সেই ধারণার সমর্থন হয় না।

পরন্তু এই ব্রহ্মসংগীতটিই জাতীয় সংগীতরূপে 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে গণ্য হয়েছিল অন্তত ১৯১৭ সাল থেকে। সেবারকার কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনেও এই গান গাওয়া হয় তৃতীয় দিনে। অবশ্য প্রথম দিনের উদ্‌বোধন হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' দিয়েই। রবীন্দ্রনাথের জনগণমন গানটি সমকালীন সাময়িক পত্রের বিবরণে 'Magnificient' 'Patriotic song' বলে বর্ণিত হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তৃতায় বললেন—It is a song of the victory of India. তারপর থেকেই এই গান জাতীয় সংগীত বলেই গণ্য হয়ে আসছে। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে এর হিন্দি অনুবাদ জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এর দুটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।

ব্রহ্মসংগীতকে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করায় বাধা হল না কেন? তার কারণ ওই গান বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। ভারত ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্ম বটে, কিন্তু তিনি যে ভারতের বিধাতা সেই ভারতেরই অধিবাসী আমরা। সেই ভারতের রূপ ফুটেছে এতে। সেই রূপ রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট, যার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা দিয়েছেন নানা জায়গায়। এখানে আছে পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মরাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল এবং বঙ্গ অর্থাৎ ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ এই ভারতভূমি যার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা প্রভৃতি

পর্বত এবং নদী। সরলা দেবীর অতীত গৌরববাহিনী গানে এই বিস্তৃত অঞ্চলগুলির উল্লেখ আছে। কবি এইসব অঞ্চলে ব্যাপ্ত জনসমাজের দিকে তাকিয়ে তাদেরই অন্তরের প্রার্থনাকে ভাষা দিয়েছেন। এই সমাজে আছে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান এবং খ্রিস্টান। এই বিস্তৃত ভারতসমাজ যাকে অন্য কবিতায় বলেছেন মহামানবসাগর। তারা পেরিয়ে এসেছে অনেক দুঃখের রাত্রি, অনেক সংকটের মুহূর্ত। তাকে তিনি বলেছেন :

> পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
> হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
> দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
> সঙ্কট দুঃখত্রাতা।

আমাদের এত বৈচিত্র্য, এত স্ববিরোধিতা, এত বিপ্লব থেকে উত্তীর্ণ করিয়ে দিতে যিনি পারেন, তিনি ভারত ভাগ্যবিধাতা এবং তিনি ঐক্যবিধায়ক।

সুতরাং, জনগণমন গানের মূল মর্মটি হচ্ছে বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য। বিচিত্রকে নিয়েই এক ভারতীয় জাতি। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ়যোগকে অধিকার করা।

এই গানটি নিছক গান নয়, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভারত ইতিহাস পাঠও আছে। প্রায় ১৯০১ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট ছিল নানা প্রবন্ধে কবিতায় এবং গোরা উপন্যাসে—এই গানটিতে তারই সংহত অভিব্যক্তি। সেই অর্থেই জনগণমন ভারতীয় জাতির গান। ভারতীয় জাতির বৈশিষ্ট্য এক ধরনের ধর্মপ্রাণতায়। সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম নয়, উদার অর্থে সেই নৈর্ব্যক্তিক দৈবানুভবকে কবি এই কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে আছে 'যতো ধর্মস্ততো জয়'। সেই ধর্মবোধ থেকে রবীন্দ্রনাথও এক পরম নৈর্ব্যক্তিক বিধাতার অনুভব লাভ করেছেন। তিনিই ভারতভাগ্যবিধাতা। দেশানুভবের সঙ্গে ঈশ্বরানুভবকে মেলানো অন্য দেশের জাতীয় সংগীতের তুলনায় অভিনব অবশ্যই। কিন্তু এই অনুভব থাকাতে সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কলুষমুক্ত হয়েছে। য়ুরোপে ধর্মহীন দেশচেতনার পরিণাম তো আমরা জানি। 'প্রতিনিধি' কবিতাতে শিবাজির রাজধর্মের নির্দেশ গুরু রামদাস দিয়েছিলেন :

পালিবে যে রাজধর্ম
জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

এই আত্মবিমুখ ত্যাগধর্মের উৎস এক ধর্মবোধ। সেই ধর্মকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় সংগীতে নিত্যস্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছেন।

এই ভাবটি মনে রাখলে বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে এর একটা ভিন্নতর দৃষ্টি বোঝা যায়। বঙ্কিম দেশজননীর অভয়মূর্তি রচনা করেছেন 'দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবাল' এবং 'বহুবলধারিণী'র উল্লেখ করে। 'বন্দে মাতরম্'-এ মায়ের শাসক এবং পালকরূপ দুইই আছে। এই প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় লিখেছিলেন :

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাটনেত্র আগুনবরণ।

এই মূর্তি তিনি জনগণমন গানে দেননি। তাতে এনেছেন শান্তি সহিষ্ণুতা মৈত্রী ও ঐক্য। বঙ্কিমের গানে উদ্দীপনা, অধীরতা, চাঞ্চল্য, এককথায় রজোগুণ। রবীন্দ্রনাথের গানে ভারতভাগ্যবিধাতার ধ্যান ও তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন।

আনন্দমঠের আদর্শ

আল্-ফারুক

বঙ্কিমবাবুর *আনন্দমঠ* ও 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত নিয়ে দেশের আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে উঠেছে আন্দোলনের প্রচণ্ডতায়। ভারতের বৃহত্তম দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের দরবারে পর্যন্ত আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছে গেছে এবং উভয় প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করে 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে 'রিজুলিউশন' পর্যন্ত পাস করতে হয়েছে। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত *আনন্দমঠ*-এরই শঙ্খধ্বনি বা 'বাই-প্রডাক্ট'। *আনন্দমঠ*-এর সত্যিকার আদর্শ নিয়ে আলোচনা সময়োপযোগী, সন্দেহ নেই।

গোড়ার কথা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম না হলেও প্রথমতম শক্তিমান লেখক, তা সর্ববাদীসম্মত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রথম 'গ্র্যাজুয়েট'। বাংলার শ্রেষ্ঠতম দানবীর মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহছেন মরহুমের করুণাধারায় প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবিত 'হুগলী মোহ্ছেন কলেজ' থেকেই হুগলী-সমীপবর্তী নৈহাটী-কাঁঠালপাড়ার অধিবাসী যুবক বঙ্কিমচন্দ্র বি. এ. পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদলাভ করেন এবং উত্তরকালে 'রায়বাহাদুর' ও 'সি. আই. ই.' খেতাবে ভূষিত হন।

প্রথমাবস্থায় জাতিধর্মনির্বিশেষে 'হুগলী মোহ্ছেন কলেজে'র যাবতীয় পড়ুয়ারা কোনো-না-কোনো প্রকারে হাজী মোহছেন মরহুমের 'ওয়াক্ফ-ফন্ড' হতে উপকৃত হতো। অন্ততঃ মোহছেন-ফন্ডের কল্যাণে হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই বালক বঙ্কিম অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত লেখাপড়া করে মানুষ হতে পেরেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা দেশে তখন যে স্কুল-কলেজের ছড়াছড়ি ছিল না, তা খুলে বলার দরকার করে না। এই হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকেও নিঃস্বার্থ দানবীর হাজী মোহ্ছেন মরহুমের করুণাধারায় সিক্ত ও ধন্য হাজার হাজার মানুষের অন্যতম বলে নির্দেশ করা অসঙ্গত নয়।

সেকাল ও একাল

এ-কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ইংরেজ-মনিবের নিমক খাওয়ার সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠ* লিখেছিলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিমকখোর নওকরদের নিমকহালালী ও রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর নেই। স্বদেশি-আন্দোলন, নন-কো-অপারেশন, নিরস্ত্র প্রতিরোধ, সংবাদপত্রের প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠা ও প্রতারণা, স্বাধীনতাপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন, বিপ্লবাত্মক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন প্রভৃতি বহুবিধ কারণে ভারতের ব্রিটিশসিংহের শক্তি ও হুঙ্কার আজ কতকটা মন্দীভূত হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে যে ব্রিটিশ প্রতাপ অনেক বেশি প্রবল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তা বলাই বাহুল্য। ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রে কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রীর খাতিরে, আদেশে বা চক্ষুলজ্জায় কোনো প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের প্রবলপ্রতাপান্বিত—বিলাতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মিস্টার লয়েড জর্জের ভাষায় 'বিলাতি ইস্পাতের কাঠামো' সম সুদৃঢ়—খাস বিলাতি সিভিলিয়ন 'মীর মুন্‌শী' বা চীফ্ সেক্রেটারিকেও খদ্দরপোশাকে ভূষিত হয়ে আফিস করতে হয়েছে বা হচ্ছে, সংবাদপত্রপাঠকগণ তা অবগত আছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তা কি কেউ কল্পনাও করতে পারতো? সেই একদিন আর এই একদিন—আসমান জমিন তফাৎ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

যাক্ সে-কথা। এইবার 'আনন্দমঠ'-এর পূত-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যাউক।

বুনিয়াদ

উত্তর-বাংলার 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ'ই যে *আনন্দমঠ*-এর ঐতিহাসিক বুনিয়াদ, 'তৃতীয় বারেব বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

> এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড়ো গুরুতর হইয়াছিল। আরও দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে-যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই। উত্তর-বাঙ্গালায় হইয়াছিল। আর Captain Edwards নামের পরিবর্তে Major Wood নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ-অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না, কেননা উপন্যাস উপন্যাস,—ইতিহাস নহে।

পুরো বিজ্ঞাপন অবিকল উদ্ধৃত হলো। 'পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন' থেকে প্রতীয়মান হয়, উপরের ভুলগুলি উক্ত সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধিত সংস্করণই বর্তমানে বাজার-প্রচলিত *আনন্দমঠ*।

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ

পরিশিষ্টের 'যথার্থ ইতিহাস' থেকে দেখা যায়, ১৭৭৩-৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। তিব্বতের দক্ষিণ ভাগে পাহাড়-অঞ্চলে ছিল এই সন্ন্যাসীদের বাস। 'সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণে' লজ্জানিবারণ করেই তারা বেশির ভাগ চলাফেরা করতো। বাড়ি-ঘর পুত্র-কলত্রের বালাইও তাদের ছিল না। দেশবিদেশ ঘুরাফেরার সময়ে হৃষ্টপুষ্ট ছেলেপেলেদের চুরি ক'রে নিয়ে লালন-পালন করে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করাই ছিল তাদের ব্যবসা। তীর্থভ্রমণের অছিলায় 'সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা' বাংলা দেশে এসে সুযোগ পেলেই এই সন্ন্যাসী-মহাপ্রভুরা নিরস্ত্র গ্রামবাসীর টাকাকড়ি বাড়িঘর লুণ্ঠন করতো। রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতি জিলারই প্রভুদের দৌরাত্ম্য হতো সবচেয়ে বেশি। বাঙ্গালি হিন্দু (হেস্টিংস সাহেবের কথায় "জন্টু") সমাজের 'প্রবাদের মত' উচ্ছ্বসিত দেবদ্বিজ ভক্তির কল্যাণে এই লুণ্ঠনব্যবসায়ী জোচ্চোর সন্ন্যাসীদের দমন করাও ছিল সবিশেষ কষ্টকর। তীর্থযাত্রী নগ্ন সন্ন্যাসী বলে 'হিন্দুসমাজের সকল স্তরের নিকট ছিল তারা প্রগাঢ় ভক্তির অধিকারী'। কাজেই গুরুজীদের গতিবিধির কোনো সংবাদ দিতে বা তাদের কর্তৃপক্ষকে কোনোরূপ সাহায্য করতে স্থানীয় হিন্দুরা ছিল নারাজ।

সন্তানী আদর্শ

এই দারা-পুত্র-পরিবার-নাদারাদ্ লুণ্ঠনব্যবসায়ী লক্ষ্মীছাড়া লেংটা সন্ন্যাসী বা ভ্রাম্যমান দস্যু-তস্কর ছেলেধরারাই হচ্ছে হিন্দু-বাংলার 'জীবন-বেদ' 'ঋষি' বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*-এর অগ্নিমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' দীক্ষিত 'হরে মুরারে মধু কৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে' উচ্চারণকারী 'শুভ্রশরীর, শুভ্র কেশ', 'শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবস্ত্র' ঋষিকল্প স্বামী 'সত্যানন্দ' এবং তাহার মন্ত্রশিষ্য 'সন্তান' ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিক বীরপুরুষদের ঐতিহাসিক আদর্শ বা Prototypes। এবং নব্যবাংলার স্বদেশি আমলের 'বন্দে মাতরম্'-বাদী স্বদেশপ্রেমিক সন্ত্রাসবাদীরা হচ্ছে এই 'আনন্দ কোংর'ই আদর্শবাদী অনুচর ও ভক্তগণ। *আনন্দমঠ*-এর সত্যিকার আদর্শ অনুধাবন করতে হলে উপরোক্ত ঐতিহাসিক সত্যগুলি মনে রাখা নেহায়েৎ দরকার।

দেশোদ্ধারের স্বরূপ

উপরোক্ত সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ বা পাহাড়ি বাবাজীদের ধর্মের নামে দস্যুবৃত্তিই *আনন্দমঠ*-এর ভিত্তি। বাবাজীরা লুটতরাজে নেমেছিল অর্থের লালসায়, আর বঙ্কিম-কল্পিত স্বামী-সন্তান সম্প্রদায় নিবিড় অরণ্যের অভ্যন্তরে 'বহুবিধ দেবমন্দির'-পরিবেষ্টিত 'এক প্রকাণ্ড

ভূমিখণ্ডে' 'অবস্থিত' 'একটি বড় মঠে'—পুরাকালে যাহা বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—অর্থাৎ *আনন্দমঠ*-এর ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত হয়েছিল 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং' দেশমাতৃকার উদ্ধারসাধনে। কিন্তু সে দেশোদ্ধার দেশের প্রকৃত মুক্তি নয়—স্বাধীনতাও নয় ; সে দেশোদ্ধার নিছক মুসলিম-বিনাশ—সনাতন আর্যগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এবং ইংরেজ-প্রশস্তি—আন্তরিকতার সহিত না হলেও আত্মরক্ষার গরজে।

ঋষিত্বের দাবী

বাংলা, তথা ভারতের, তথাকথিত জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসপন্থীগণ জোরগলায় প্রচার করে থাকেন : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করে ভারতবর্ষে 'স্বরাজ' বা 'স্বাধীনতা' সংস্থাপনই কংগ্রেস তথা জাতীয়তাবাদের প্রথম, মধ্যম ও শেষ কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*-এ দেশমাতৃকার স্বাধীনতার বীজ-মন্ত্র বিঘোষিত হয়েছে বলেই বাংলার ফাঁকা-আওয়াজ-সর্বস্ব জাতীয়তাবাদীরা বঙ্কিমচন্দ্রকে আজ 'ঋষিত্বে'র দরজায় পৌঁছাবার জন্য অতটা কোশেশ্ ও কারসাজি কর্চ্ছেন। কিন্তু এ-আব্দার একেবারেই ভুয়ো ও ভিত্তিহীন—অন্তত *আনন্দমঠ*-এ তার কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য মুসলমানের বাড়ি-ঘর (বঙ্কিমের ভাষায় 'শুয়ারের খোয়াড়') ধ্বংস, মুসলমানের 'মসজিদ বিনাশ করে রাধামাধবের মন্দির প্রতিষ্ঠা', মুসলমানের ধনদৌলত লুণ্ঠন, মুসলমান শাসন-সংহার—এককথায় মুসলমান জাতিকে সমূলে ধ্বংস করার নামই যদি বাংলা তথা ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতা হয়, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঋষি' পদবাচ্য এবং *আনন্দমঠ* জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার 'জীবন-বেদ', সন্দেহ নেই। *আনন্দমঠ*-এর আখ্যানবস্তুর আলোচনা থেকেই তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে।

প্রথম খণ্ড

সমসাময়িক অবস্থা

'১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন। কিন্তু তখনও বাঙ্গালির প্রাণ, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের আর প্রাণ, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়।'

মন্তব্য : হঠাৎ কংগ্রেস-প্রেমে মশগুল ও মাতোয়ারা মীরজাফরের বংশাবতংশ

মুরশিদাবাদের নওয়াব বাহাদুরের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে কি বঙ্কিমচন্দ্রের সুমধুর এই বিশেষণ-বৃষ্টির উপর?

আনন্দমঠ

বাঙ্গালির সেই চরম দুর্দিনে, 'অত্যন্ত অন্ধকার' বৃক্ষলতাকণ্টকাকীর্ণ এক নিবিড় অরণ্যে, 'বহুবিধ দেবমন্দির' ও নাটমন্দির পরিবেষ্টিত 'এক প্রকাণ্ড ভূমি-খণ্ডে' অবস্থিত এক প্রকাণ্ড মঠে অর্থাৎ *আনন্দমঠ*-এর সত্যানন্দের নেতৃত্বে ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ, জীবানন্দের সন্ন্যাসিনী জীবন-সঙ্গিনী শান্তি (নবীনানন্দ) প্রভৃতি দেশোদ্ধারে উৎসৃষ্টপ্রাণ স্বদেশপ্রেমিক বীরগণ অবস্থান কচ্ছে। পদচিহ্ন গ্রামের 'বড় ধনবান' মহেন্দ্র সিং, তার স্ত্রী কল্যাণী ও শিশু-কন্যাসহ শহরে পালাচ্ছিল প্রাণের ভয়ে মড়কের উপদ্রবে। রাস্তায় শিশুকন্যাসহ কল্যাণী 'পেটের জ্বালায় ডাকাত' গ্রামের চাষাভুষোদের দ্বারা অপহৃত হয়। মহেন্দ্র তখন শিশুকন্যার জন্য দুধের যোগাড়ে অন্যত্র গিয়েছিল। সত্যানন্দের কৃপায় কল্যাণী ও তাহার শিশুকন্যা রক্ষা পায়। মহেন্দ্র ও ভবানন্দ সিপাহিদিগের হাতে বন্দি হয়, কিন্তু পরে খালাস পায়। মহেন্দ্র পরে সত্যানন্দের হাতে সন্তানধর্মে দীক্ষিত হয়। মহেন্দ্রের দীক্ষার ব্যাপারেই 'বন্দে মাতরম্'-এর অবতারণা 'ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল—এখন ত প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?' এত্যাদি ইতরজনোচিত ভাষায় মুসলমানদিগকে বঙ্কিমচন্দ্রের গালিবর্ষণ এবং মুসলমানদের বাড়ি-ঘরকে 'বাবুয়ের বাসা' 'শুয়রের খোঁয়াড়' বলে উল্লেখ। সত্যানন্দের এই স্বদেশপ্রেমিক সন্তানসেনা *আনন্দমঠ*-এ অবস্থান করে এবং লুঠ-তারাজ করে, জীবিকার্জন ও অর্থ সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

শান্তির ইতিহাস

জীবানন্দের স্ত্রী শান্তির জীবনেতিহাস এবং বিবিধ তত্ত্বমূলক আলোচনা এই খণ্ডের মূলকথা। শান্তি বালক-সন্ন্যাসী-বেশে এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগদান করেছে—'জিতেন্দ্রিয়' সন্ন্যাসীদের একজন পণ্ডিত তাকে পড়াতে শুরু করলে। ক্রমে শান্তির 'যৌবন লক্ষণ দেখা দিল'। 'শান্তির অভিনব যৌবন-বিকাশ-জনিত লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া' শান্তির অধ্যাপক 'সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্তিকে নির্জনে পাইয়া বড়ো জোর করিয়া' 'শান্তির হাতখানা ধরিয়া ফেলিল'। 'শান্তি তাঁহার কপালে এমন জোরে ঘুষা মারিল যে সন্ন্যাসী মহারাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং শান্তি-সন্তান সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।'

খোদার দুশ্‌মন

তবে এইখণ্ডেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনের গোপন কথা প্রকাশ করতে কসুর করেনি। চতুর্থ পরিচ্ছদের শেষে মহেন্দ্রের প্রশ্নের জওয়াবে সত্যানন্দ ঠাকুর বলছে :

> আমরা রাজ্য চাহি না, কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।

তৃতীয় খণ্ড

সন্তানদের কীর্তি

সত্যানন্দ ও তার চেলাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবার পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

'সন্তান-সম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসীদলে বিষ্ণু-পাদপদ্ম পূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ... তারপর তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে বলে—'ভাই বিষ্ণুপূজা করিব?' এই বলিয়া ২০২৫ জন জড় করিয়া মুসলমানদের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয় মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়। সন্তারা তাহাদের সর্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রামলোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে।'

সন্ত্রাসবাদ

'সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে' বলে :

'দিনে দিনে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া,দলবদ্ধ হইয়া দিগদিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। যেখান রাজপুরুষ পায় ধরিয়া মারপিট করে, কখন কখন প্রাণবধ করে ; যেখানে সরকারি টাকা পায়, লুঠিয়া লইয়া ঘরে আনে ; যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভগ্নাবশেষ করে।'

সন্তান শাসন

সন্তান-দৌরাত্মে অস্থির হয়ে—

'রাজপুরুষগণ সন্তানদিগের শাসনার্থে ভুরি ভুরি সৈন্যপ্রেরণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ শস্ত্রযুক্ত ও মহাদম্ভশালী। তাহাদিগের দর্পের সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিতবলে সন্তানেরা তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোনও সন্তানের দলকে যখন সৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর একদল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়।'

প্রাতঃসূর্য

এই সময়ে প্রতিথনামা ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল। কলিকাতায় বসে লৌহশৃঙ্খলে সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধবার ভাবনায় তিনি মশ্‌গুল। বঙ্কিমচন্দ্রের জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহে বললেন—'তথাস্তু'। কিন্তু সন্তানদের শাসন না করলে যে নয়। তাই 'ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে ফৌজদারির' সৈন্য এবং পরে 'কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া একদল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহনিবারণের জন্য প্রেরণ করিলেন।'

টমাসের দুর্গতি

কাপ্তেন টমাস বিদ্রোহদমনের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ....কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য অজেয়। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের ন্যায় কর্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল। সুবন্দোবস্ত করেও টমাস সাহেব পরাস্ত হলেন। 'পিপীলিকা'বৎ সন্তানদের বাহাদুরী জাহির করা চাই ত!

* * *

ইংরেজের জয় হউক

কিছুদিন পর কাপ্তেন টমাসের অধীনে কোম্পানির ও দেশি সিপাহিদের সহিত ভবানন্দের নেতৃত্বাধীনে সন্ন্যাসীর আবার যুদ্ধ হলো। এবারও সন্তানদের জয় হলো। টমাস বন্দি; বিজয়ী ভবানন্দ বল্‌লে : 'কাপ্তেন স তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস, তোমার প্রাণ দিলাম। আপাততঃ তুমি বন্দি। ইংরেজের জয় হউক ; আমরা তোমাদের সুহৃদ।'

ভবানন্দের কীর্তি

সন্তানেরা যুদ্ধে জয়লাভ করলে বটে, কিন্তু সেনাপতি ভবানন্দ 'বন্দে মাতরম্' বলতে বলতে আত্মহত্যা করলে। আত্মহত্যার কাহিনিটি এই : মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী মরবার জন্য বিষ খেয়েছিল স্বপ্নাদেশে মহেন্দ্রকে সন্তানধর্মে দীক্ষা নেবার সুযোগ দিতে। ভবানন্দের কৃপায় কল্যাণী বেঁচে উঠে এবং পাশের এক গ্রামে রক্ষিত বা রক্ষিতা হয়। সন্তানদলটি মাঝে মাঝে কল্যাণীকে দর্শন দিতে লাগলো পড়াবার অছিলায়। কিন্তু কল্যাণীর অতুলনীয় রূপরাশিতে আত্মবিহ্বল হয়ে ভবানন্দ একদিন বলেই ফেললে :

> সন্তান ধর্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যেদিন তোমার প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেইদিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। ...এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে কখনও সন্তান ধর্ম গ্রহণ করিতাম না। ...সন্তানধর্ম অতলতলে যাউক। তুমি আমার হও, আমায় বিবাহ কর।

বিবাহের ফৎওয়া

কল্যাণী বিষ খেয়ে মরে গিয়ে বেঁচে উঠেছিল বলে মহেন্দ্র বেঁচে থাকতেও ভবানন্দকে বিবাহ করতে কল্যাণীর পক্ষে কোনও দোষ নেই—এই ফতোয়াও প্রভু ভবানন্দ দিয়েছিল। কল্যাণী রাজী হয়নি। সত্যানন্দ এ-সংবাদ জানতে পারে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপেই 'বীর' ভবানন্দ আত্মহত্যা করে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করে। (মন্তব্য :— আনন্দমঠী সন্তান-সেনাদের Second in Command সেনাপতি ভবানন্দের এই চরিত্রের অবনতিও উল্লেখযোগ্য। বাংলার 'সন্তান'বাদীরাও যে ভবানন্দের আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে, সংবাদপত্র পাঠকগণের তা জানা আছে।)

সন্তান-সৎকার

রণজয়ের পর, 'অজয়-তীরে' সন্তানসেনাদের বিজয়-উৎসব। সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য। 'বন্দে মাতরম্'-রবে নিহত সন্তানদের সৎকার চললো। ধূমধামের সহিত চন্দনকাষ্ঠে 'কল্যাণীর পদমূলে বিক্রীত' 'বীর' ভবানন্দের চিতা প্রজ্জ্বলিত হলো। সন্তানগণ 'বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত নহে ; অতএব দাহ করে।'

কি করা যায়?

কানন মধ্যে গোপন সভায় সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ, ধীরানন্দ আসীন।

এখন কি করা যায়? সত্যানন্দ বললে :

> এতদিন যে-জন্য আমরা সর্ব-কর্ম, সর্বধর্ম, সর্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে। এ প্রদেশে যবন-সেনা আর নাই। যাহা অবশিষ্ট আছে, একদণ্ড আমাদের নিকট টিকিবে না। তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও।

সৈন্য কোথায়

জীবানন্দের মত—রাজধানী আক্রমণ ও অধিকার। সত্যানন্দেরও তাই। ধীরানন্দ ধীরমস্তিষ্ক। বললে : 'সৈন্য কোথায়?' জীবনানন্দ বললে : 'স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।' ধীরানন্দ বললে : 'একজনকেও পাওয়া যাইবে না। সবাই লুটিতে বাহির হইয়াছে। গ্রাম সকল এখনও অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুটি লুটিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবে না, আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।'

সন্তান রাজ্য

সত্যানন্দ বিষণ্ণ। বলল :

> যাহা হউক, এ-প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দি হয়। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তান-রাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে বহুতর সেনা সন্তানের নিশান উড়াইবে।

জয় মহারাজ

জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করতঃ বললে : 'হে মহারাজাধিরাজ, আজ্ঞা হয় ত এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপন করি।' সত্যানন্দ চটিতং। জীবনে এই তার প্রথম রাগ। বললে 'ছি! আমায় কি শূন্য-কুম্ভ মনে কর? আমরা রাজা নহি, সন্ন্যাসী। নগর অধিকার হইলে যাহার শিরে তোমাদের ইচ্ছা হয়, রাজ-মকুট পরাইও। কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্মে যাও।' অর্থাৎ আবার মুসলিম-দলনে বাহির হও। সন্তানদের কর্মমুসলিম-বিনাশ।

চতুর্থ খণ্ড

বল—বন্দে মাতরম

'সেই রজনীতে হরি-ধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণ। সন্তানেরা দলে দলে উচ্চৈস্বরে 'বন্দে মাতরম্' 'জগদীশ হরে' গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ বা নগরাভিমুখে ধাবিত হইয়া পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে—'বল বন্দে মাতরম্ নহিলে মারিয়া ফেলিব।'

'সেই এক রাত্রির মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল—'মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।'

মুই হেঁদু

'গ্রাম লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদিগের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবণ নিহত হইল। অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল : 'মুই হেঁদু।'

সব ফাঁকি

'মুসলমানেরা দলে দলে নগরাভিমুখে ছুটিল। সিপাহিরা সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণিবদ্ধ হইল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল—'আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক। মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেইদিন হউক।' মুসলমানেরা বলিতে লাগিল—'আল্লা আক্‌বর! এতনা রোজের পর কোরান শরফি বেবাক কি ঝুটো হলো। মোরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করি, তা এই তেলককাটা হেন্দুর দল ফতে করতে নারলাম। দুনিয়ার সব ফাঁকি।'

ভগবানের আশীর্বাদ

'উত্তরবঙ্গ মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে ; মুসলমান এ-কথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন। বলেন, কতকগুলি লুঠেরা তো বড়ো দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপে কত কাল যাইত, বলা যায় না। কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় গভর্নর-জেনারেল। তিনি মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন—তাঁর সে-বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত? অগৌণে

সন্তানশাসনার্থে Major Edward নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নতুন সেনা লইয়া উপস্থিত হইল।'

আবার যুদ্ধ

'আবার তুমুল যুদ্ধ হইল। যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তান-সংঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে লোক লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।'

একি মহারাজ?

'সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন।' সত্যানন্দ ধ্যানে মগ্ন, এমন সময়ে 'চিকিৎসক' মহাশয় শুভাগমন করলেন। বললেন—'সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।' সত্যানন্দ বললে—'চলুন, আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু মহাত্মন! আমার এক সন্দেহভঞ্জন করুন।আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধ জয় করিয়া সনাতন ধর্ম নিষ্কণ্টক করিলাম, সে সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদশে কেন হইল?'

কার্যসিদ্ধি

মহাপুরুষ বললেন, 'তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোনো কার্য নাই। অনর্থক প্রাণী হত্যার প্রয়োজন নাই।' সত্যানন্দ—'মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখন কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।'

মহাপুরুষ, 'হিন্দুরাজ্য এখনো স্থাপিত হইবে না। তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে ; অতএব চল।'

মর্মপীড়ায় কাতর হয়ে সত্যানন্দ বললে, 'হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?'

আসল কথা

চিকিৎসক মহাপুরুষ বললেন, 'না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।' সত্যানন্দ বিষণ্ণ হলো। সান্ত্বনার সুরে মহাপুরুষ বললেন—'সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের ফল কখনও পবিত্র হয় না। অতএব তোমরা দেশোদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে।

ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। ...ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত। লোকশিক্ষার বড়ো পটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। ...ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গলসাধন করিয়াছ —ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে। ...শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা। আর ইংরেজের সহিত যুদ্ধে জয়ী হয় এমন শক্তি কাহারও নাই।

শেষরক্ষা

আনন্দমঠ-এর সত্যিকার উদ্দেশ্যসন্ধানের সুবিধা হবে বলে বঙ্কিমী 'জীবন-বেদে'র সারমর্ম যথাসম্ভব তাহার নিজের ভাষায় বর্ণিত হলো। অনামা চিকিৎসক মহাপুরুষ স্বয়ং গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র, তা সহজেই অনুমেয়। গৈরিক-পরিহিত তিলক-কাটা সন্তান-সেনাদের হাতে ইংরেজ সেনাদের নাজেহল হওয়ার কল্প-কাহিনি লিপিবদ্ধ করে ডেপুটি বঙ্কিমের হৃদয় হয়তো দুরু দুরু কেঁপে উঠেছিল। তাই কবিরাজ মহাশয়ের মুখে ইংরেজ-প্রভুদের তারিফ করে এই শেষরক্ষারই প্রচেষ্টা। তবে মনিবদের মাতৃভাষা বাংলা হলে শ্রাদ্ধ কোথায় গড়াতো, কে জানে।

অদৃষ্টের বিড়ম্বনা

আর উপরের কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের বাণী হলে ইংরেজ-প্রভুদের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় Miss Mayo-র Mother India'র কথা পাঠকের মনে পড়া কি অস্বাভাবিক? কিন্তু অদৃষ্টের এমনই বিড়ম্বনা যে ইংরেজ শাসনেরপক্ষে ওকালতি ও প্রচারণা করে আমেরিকান Miss Mayo আজ বাঙালি তথা সমগ্র ভারতবাসী কর্তৃক শতমুখে অভিশপ্ত, আর সেই ইংরেজদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বঙ্কিমচন্দ্র আজ শতমুখে প্রশংসিত—'ঋষিত্বের' পর্যায়ে উন্নীত! তবে 'ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই'—এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঋষিত্বে'র দাবী নেহায়েৎ উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বর্তমান কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে যে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার শুরু হয়েছে, সংবাদপত্রপাঠকগণের তাহা অবিদিত নেই।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

মুসমলান বিনাশে না ইংরেজ না হিন্দু কাহারও আপত্তি নেই। তাই *আনন্দমঠ*-এর বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণভরে মুসলমানের ধ্বংস কামনা করে গেছেন। দুঃখের বিষয়, সে-কামনা

আজও পুরোপুরি সফল হয়নি—হবে কিনা ভবিতব্যই বলতে পারবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কামনায় মোনাফেকীর আমেজ ছিল বলেই হয়তো অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে *আনন্দমঠ*-এর ভিত্তির উপর বাংলার দুরপনেয় কলঙ্ক ও অভিশাপ সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হয়েছিল ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসের কামনায়। হয়তো ইহা প্রকৃতিরই প্রতিশোধ।

বন্দে মাতরম

আনন্দমঠ-এর সর্বত্র মুসলমান-ধ্বংসের 'রণ-হুঙ্কার' রূপেই মুসলিম-বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্র সন্তান-সেনাদের মুখে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ব্যবহার করিয়েছেন। আত্মসম্মান ও জাতীয় সম্মান-সম্পন্ন জিন্দা-দিল্ কোনো মুসলমান 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে পারে না।

ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা

আনন্দমঠ-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য মুসলিম-বিনাশ, মুসলমানের 'মসজিদ ভাঙিয়া রাধামাধবের মন্দিরপত্তন'। এবং সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা ইংরেজের-শাসনের ভিতর দিয়ে, বিনাশ করে নয়। 'বন্দে মাতরম্' সেই উদ্দেশ্যসাধনের দীক্ষামন্ত্র হতে পারে। 'বন্দে মাতরম্ *আনন্দমঠ*-এর আগেকার রচনা, কিন্তু বন্দে মাতরম্' যে *আনন্দমঠ*-এর জন্যই রচনা, কিংবা *আনন্দমঠ*-ই 'বন্দে মাতরম্'-এর জন্য রচনা, এসম্বন্ধে সন্দেহের অবসর নেই। ভারতের নয়কোটি মুসলমানের বিনাশমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' হবে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এবং ভক্তিগদ্গদ্-কণ্ঠে মুসলমানদিগকে উচ্চারণ করতে হবে সেই মরণ-মন্ত্র—ধৃষ্টতারও সীমা থাকা দরকার!

মূলে কুঠারাঘাত

তারপর 'বন্দে মাতরম্' আগাগোড়া পৌত্তলিকতা-কন্টকিত বন্দনা-গীতি ও স্তোত্র। তৌহীদ্পরস্ত মুসলমান 'একমেবাদ্বিতীয়ম' আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও 'বন্দনা' করতে পারে না—করলে তার সত্যিকার মুসলমান বিশ্বাসের মূলেই কুঠারাঘাত হয়। ইসলামের প্রধানতম মৌলিক শিক্ষাই হচ্ছে 'তৌহীদ'—একেশ্বরবাদ। মুসলমান মাতৃভূমিকে ভালবাসে নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বদেশপ্রীতির ক্ষণস্থায়ী হুঙ্করের জন্য তাঁরা ইসলামের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা ও সৌন্দর্য বিসর্জন দিতে পারে না। মুসলমানের পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের সহিত ধর্মের বন্ধনও অচ্ছেদ্য। ইসলামের ইহা অনবদ্য শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য। মুসলমান সম্প্রদায় ব্যতীতও পৌত্তলিকতা-বিরোধী ভারতবাসীর সংখ্যা বহুকোটি! তাঁরা ত 'ত্বংহি-

দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা-কমলদল-বিহারিণী বাণী-বিদ্যাদায়িণী নমামি তাং' বলে দেশমাতৃকার চরণে প্রণতি-নিবেদন করতে পারে না। জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচন ও নির্ধারণে এই সকল অ-মুসলমান তৌহীদবাদীদের মনোভাবও কি উপেক্ষণীয়?

আকাশকুসুম

যে-সঙ্গীতে কোটি কোটি ভারতবাসীর জাতীয় সম্মান ও ধর্মীয় শিক্ষা নিষ্ঠুরভাবে ব্যাহত হয়, তাহা কখনও সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারে না এবং হওয়া উচিত নয়। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কর্তারা এই স্থূল কথাটা মনে রেখে 'বন্দে মাতরম্'-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে এ-কূল ও-কূল দু-কূল বজায় রাখবার ব্যবস্থা না করলেই ভাল করতেন। কংগ্রেসি সিদ্ধান্তে 'বন্দে মাতরম্' সমস্যার সমাধান হয়নি—হতে পারে না। জাতীয় সঙ্গীতরূপে 'বন্দে মাতরম্'-এর সহিত মুসলমানদের আপস-নিষ্পত্তি আকাশকুসুম।

উপসংহার

আনন্দমঠ-এর সত্যিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব মতের আলোচনা করেই প্রবন্ধের উপসংহার করবো। *আনন্দমঠ* সম্বন্ধে এত কথা বলবার আছে যে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা অসম্ভব। প্রবন্ধের দীর্ঘতার জন্য তাই নাচার এবং পাঠকগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

গ্রন্থকারের কথা

আনন্দমঠ-এর প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে লেখা রয়েছে : 'বাঙ্গালির স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালির প্রধান সহায় ; অনেক সময় নয়। সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র ; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বোঝান গেল।'

অভিমত না ধাপ্পাবাজী?

আনন্দমঠ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত কৈফিয়ৎ বা অভিমত পুরোপুরি মেনে নেওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। 'সমাজ-বিপ্লব অনেক সময় আত্মপীড়ন মাত্র ; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী'—কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের কথা বলে মনে হয় না ; অন্তত: *আনন্দমঠ*-এর ঘটনা-পরম্পরার প্রকৃতি, পরিণতি ও বিবরণের ধারা থেকে তা প্রতীয়মান হয় না বা হতে পারে না বলেই আমাদের বিশ্বাস ও ধারণা।

নিগূঢ় উদ্দেশ্য

স্বদেশপ্রেমের প্ররোচনায় বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহের আবশ্যকতা ও মহনীয়তা প্রদর্শনই বাস্তবিকপক্ষে *আনন্দমঠ*-এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য। ইংরেজ-প্রভুদের বিপক্ষে তা সরাসরি শিক্ষা দেওয়া অসুবিধা ও বিপজ্জনক বলেই সরকারি নিমক্‌খোর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব 'ম্লেচ্ছদের' উপর দিয়েই তা বোঝাবার কোশেশ্‌ করে গেছেন এবং প্রভুদের মনস্তুষ্টি ও আত্মরক্ষার সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই *আনন্দমঠ*-এর মাঝে মাঝে 'ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়'— 'ইংরেজ মিত্র রাজা'—'ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই' ইত্যাদি ছিটেফোঁটা স্তোকবাক্য এবং প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে 'সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়ে (সকল সময়ে নয়।) আত্মপীড়ন মাত্র ; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী' বলে লোকভোলানো কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।'

আর্তনাদ কেন?

'সমাজ-বিপ্লব আত্মপীড়ন মাত্র ; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী'—ইহাই যে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের সত্যিকার বাণী, *আনন্দমঠ*-পন্থী, 'বন্দে মাতরম্‌' মন্ত্রদীক্ষিত স্বদেশপ্রেমিকরাও তা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে না, এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই। সরকারি গোলামি করেই বিপ্লবাত্মক স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-মন্ত্রের শিক্ষাদাতা ও দীক্ষাগুরু *আনন্দমঠ*-এর ভিতর দিয়ে সুচতুর সুনিপুণ ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা 'আর্টিষ্ট'রূপে স্বজাতীয়দের অন্তরে 'সনাতন হিন্দুধর্ম ও রাজত্ব' প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের বীজ বপন করে গেছেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র আজ হিন্দু-বাংলার 'ঋষি'-কল্প মহাপুরুষ এবং *আনন্দমঠী* স্বাদেশিকতা ও সন্ত্রাসবাদের প্রতি ভক্তগণের 'মুখে-বলা-যায়-না-কিন্তু-অন্তরে-অন্তরে-অনুভব করি'-ই গোছের সত্যিকার দরদ ও প্রাণের টান রয়েছে বলেই বাংলার আকাশ-বাতাস আজ এমনভাবে মথিত হয়ে উঠেছে 'বন্দে মাতরম্‌'-মন্ত্রের বিলোপ বা অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদের কলরব ও আর্তনাদে।

'বন্দে মাতরমে' আপত্তি কেন?

রেজাউল করীম,

নানাবিধ ফতোয়ার দ্বারা বিব্রত মুসলমান সমাজের জন্য আর একটা অভিনব ফতোয়া জারী হইয়া গেল—সমগ্র মুসলমান সমাজকে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুসলমানের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সব কিছুই বিপন্ন হইবে, বিধ্বস্ত ও নির্মুল হইবে, যদি না তাহারা 'বন্দে মাতরম্' পরিত্যাগ করে। অনুমান সাত শত বৎসর ধরিয়া ভারতে মুসলমান বসবাস করিয়া আসিতেছেন। এই সুদীর্ঘ যুগের মধ্যে মুসলমানের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কথা হইতেছে 'বন্দে মাতরম ;'—সুতরাং ইহা পরিত্যাগ না করিলে মসুলমান একদণ্ড টিকিতে পারিবে না। যে ইস্‌লামকে আমরা উদার সর্বজনীন ও সর্বকালোপযোগী ধর্ম বলিয়া গর্ব করিয়া থাকি, তাহা কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' একটিমাত্র অক্ষর দ্বারা বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত ও নির্মুল হইয়া যাইবে। সেইজন্য ইস্‌লামের কল্যাণকামী নেতাগণ পূর্বাহ্নেই মুসলমানকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের তথাকথিত নেতাগণ দেশের দিকে দিকে 'বন্দে মাতরম্-এর' বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। ইস্‌লাম আজ বিপন্ন, ইস্‌লামের তরী আজ নিমজ্জমান, সমগ্র মুসলমান আজ শুদ্ধিওয়ালাদের মুখের গ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কে আছ সমাজহিতৈষী, ইস্‌লামকে যদি বাঁচাইতে চাও, তবে অবিলম্বে 'বন্দে মাতরম্' পরিত্যাগ করো।

'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে এই যে নূতন ফতোয়া জারী হইল, ইহা কিন্তু ইস্‌লাম ধর্মে অভিজ্ঞ ও কোরআন বিশেষজ্ঞ আলেম-ফাজেলদের ফতোয়া নহে। এই ফতোয়া জারী হইল কতকগুলি রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী কোট-প্যান্ট পরিহিত সাহেবিয়ানা ঢঙের ব্যারিস্টার ও সেই শ্রেণির লোকের দ্বারা। যাঁহারা জীবনে কোনো দিন মসজিদের প্রাঙ্গণেও চরণধূলি দিবার অবসর পান নাই, ইস্‌লামের সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যাঁহাদের কোনোই সম্বন্ধ নাই, সেইসব ব্যক্তিগণ আজ 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ইস্‌লাম কীসে নষ্ট হয়, আর কীসে রক্ষা হয়, এসব বিষয়ে আলোচনা করিবার একচেটিয়া অধিকার মিষ্টার জিন্না, অথবা স্যর নাজিমুদ্দিনের নাই। এমনকি যে মৌলানা অকরম খাঁ সাহেব নিজেকে ইস্‌লামের একমাত্র বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাবি করেন, তাঁহারও সে অধিকার নাই। ইস্‌লামকে যাঁহারা কামধেনুরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কোনও মতকেই অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

খিলাফতের যুগে মৌলানা আকরম খাঁ যখন মুসলমানকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি কোরআন-হদীসকে ভিত্তি করিয়া সেইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। সে যুগে যখন 'বন্দে মাতরম্' গীত হইত এবং 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হইত, তখন তিনি কোরআন-হদীসে তাহার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পান নাই (১৯০৬-১৯১১ সালের স্বদেশি যুগেও তিনি 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন।) আর আজ সেই কোরআন-হদীসকে সামনে রাখিয়া তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করিতেছেন, 'বন্দে মাতরম্' বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন। খোদায় বাণী কোরআন, আর খোদার নবীর বাণী হদীস—ইহাতে কি কখনও পরস্পরবিরোধী কথা থাকিতে পারে? যাঁহারা এই মহান গ্রন্থদ্বয়ের নজীরে পরস্পরবিরোধী কথা প্রচার করেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই ইস্‌লামের শত্রু তাঁহাদের কোরআন-হদীসের ব্যাখ্যা সর্বদাই উদ্দেশ্যমূলক, সুতরাং তাহা সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। যখন যাহা প্রয়োজন হইবে—তাহা পরস্পরবিরোধী হউক, অথবা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হউক, তাঁহার অম্লান বদনে সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহাই কোরআন-হদীস হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন। ইস্‌লামের দোহাই দিয়া 'বন্দে মাতরম্' বিরুদ্ধে যে ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই ধরনের ফতোয়া। দরকার হইলে ইঁহারা এই কোরআন-হদীস দ্বারাই উহাকে সমর্থন করিবেন। অতীতে এইরূপই করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে এইরূপই করিবেন।

সুতরাং 'বন্দে মাতরম্' বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে, তাহা ইস্‌লামের দিক হইতে যুক্তিসঙ্গত কি না লীগ-পন্থীদের তথাকথিত ফতোয়া তাহার একমাত্র বিচারক হইতে পারে না। প্রতিকথায় যাঁহারা ইস্‌লামের নামে ব্যবসায় করিয়া থাকেন, ইস্‌লাম ভাঙাইয়া খাওয়াই যাঁহাদের একমাত্র জীবিকা, নির্দিষ্ট কোনো লোককে ভোট না দিলে যাঁহাদের দৃষ্টিতে ভোটারগণ কাফের হইয়া যায়, তাঁহাদের প্রচারিত নূতন কোনো ফতোয়া যে সেই ধরনেরই হইবে, তাহাদে কোনো সন্দেহ নাই। 'বন্দে মাতরম্' বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অতি অল্পদিনের। ইহার পূর্বে ভারতের প্রতি সভায় এই গান গীত হইত, আর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিও সর্বত্র ব্যবহৃত হইত। সুতরাং আমাদের প্রশ্ন—এই গান ইস্‌লামের বিরোধী হইলে খিলাফতের যুগে মৌঃ আজাদ মৌলানা মহম্মদ আলি, শৌকত আলি, জাফর আলি, হসরত মোহানী প্রমুখ নেতাগণ তখন কেন ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন নাই? যে সব সভায় এই গান গীত হইত, অথবা 'বন্দে মাতরম্' শব্দ ধ্বনিত হইত, সে সব সভায় তাঁহারা উপস্থিত হইতেন, বক্তৃতা দিতেন, এবং বিনা প্রতিবাদে উক্ত সঙ্গীতের সম্মানে দণ্ডায়মান হইতেন। তারপর বহু যুগ পর্যন্ত এই গান দেশের বিভিন্ন সভায় গীত হইয়া আসিতেছে। কৈ কেহই ত ইহার কোনো প্রতিবাদ করেন নাই। জিন্না সাহেব যখন আইন সভার আসন ও চাকরি সমস্যা লইয়া দেশময় আন্দোলন করিতেছিলেন, এবং বহু কংগ্রেসী মুসলমানকেও তাঁহার দলে ভিড়াইতে লাগিলেন, তখনও 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে কেহই কোনো আপত্তি করেন নাই, আপত্তি করা দূরের

কথা, এ সম্বন্ধে কেহই কোনো কথা পর্যন্ত তোলেন নাই। তারপর দেশের বুকের ওপর দিয়া কত ঝড়-বাতাস বহিয়া গেল, কত লোকের মাথায় পুলিশের লাঠি ভাঙিয়া গেল, কারাগারে ও বন্দিশালায় কত দেশপ্রেমিকের জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হইয়া গেল। আর দেশবাসী এই 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দৃপ্ত আননে সকল অত্যাচার ও অনাচার সহ্য করিয়া গেল। জাতির এই মহাপরীক্ষার সময় কোনো নেতাই 'বন্দে মাতরম্' মধ্যে ইস্‌লাম বিরোধী ভাবধারা লক্ষ্য করেন নাই। ১৯৩৭ সালে হঠাৎ কী এমন ঘটনা ঘটিল যাহার জন্য 'বন্দে মাতরম্' ইসলাম বিরোধী হইয়া উঠিল—'বন্দে মাতরম্'-এর নামে ইস্‌লামের কৃষ্টি ও কলা সব নষ্ট হইতে বসিল?

আমাদের তথাকথিত নেতারা সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচর স্বরূপ আজ কয়েক বৎসর হইতে মুসলমানের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী ভাবধারা প্রচার করিবার জন্য যে ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন, 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনটা সেই ব্রতেরই অন্য রূপ মাত্র। চৌদ্দ দফার ধুয়া নিতান্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাছাড়া বাঁটোয়ারার পর চৌদ্দ দফার গুরুত্বও কতকটা কমিয়াছে। বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের 'না গ্রহণ, না বর্জন নীতি' যদি মুসলমানকে বশীভূত করিয়া ফেলে, তবে ত এতদিনের পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে! এদিকে বাঙ্গালায় ও পাঞ্জাবে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিত্ব ঘটিত হইয়াছে। যদি সাধারণ মুসলমান কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী হইয়া কংগ্রেস-পন্থী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ত লীগের মৃত্যু অনিবার্য। এই সব সঙ্গীন অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় আবিষ্কৃত হল 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করা। আর তাহাতে হাতে হাতে ফলও পাওয়া গেল। মুসলমান সমাজ লীগ-পন্থীদের প্রচারণায় পড়িয়া, রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, সবই ভুলিয়া গেল—মনে রহিল কেবল 'বন্দে মাতরম্' সমস্যা। যেন কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম্' বিসর্জন দিলেই ইস্‌লাম উদ্ধার হইয়া যাইবে।

'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের মূল কারণ কী, আর তাহা কী উদ্দেশ্যে হইতেছে তাহা আলোচনা করিলাম ; এবং দেখাইলাম যে, সত্যিকার কোনো অভিযোগ দূর করিবার জন্য এই আন্দোলন হয় নাই—ইহা হইয়াছে কোনো এক গুপ্ত মন্ত্রণাগারে একটা হীন ষড়যন্ত্রের ফলে। এত সব আলোচনার পরও কথা উঠিতে পারে, 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন যে কারণেই ও যে উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, যে সঙ্গীতে হিন্দুদের দেবদেবীর নাম উল্লেখ আছে এবং যে সঙ্গীত আনন্দমঠ-এর অঙ্গীভূত, তাহা কী কোনো মুসলমান সমর্থন করিতে পারে? ইহার উত্তরে আমরা স্পষ্টভাবে বলিব, দেবদেবীর নামোল্লেখ থাকিলে অথবা *আনন্দমঠ*-এর অঙ্গীভূত হইলেই যে, কোনো সঙ্গীত একেশ্বরবাদীর বর্জনীয় হইবে এরূপ যুক্তির সারবত্তা আমরা স্বীকার করি না। ইহা আমরা জানি ও মানি যে, কোনো একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতার বিরোধী সম্প্রদায় দেবদেবীর পূজাও করিতে পারে না, অথবা স্তব-স্তুতিও করিতে পারে না। সেরূপ করিলে তাহার ধর্মদ্রোহিতা করা হইবে ; কিন্তু 'বন্দে মাতরম্'-এ কোনো দেবদেবীর পূজাও করা

হয় নাই, অথবা তাহাদের স্তব-স্তুতিও করা হয় নাই। উহাতে দেশমাতৃকার বন্দনা করা হইয়াছে এবং দেশমাতৃকাকে হিন্দুদের দেবীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ আমরা যেমন বলি, 'হারকিউলিসের' মতো শক্তিশালী, 'ভেনাসের' বা 'জোহ্‌রার' মতো সৌন্দর্যশালী, 'বেকাসে'র মতো কামুক 'মিনার্ভা'র মতো জ্ঞানী,—সেইরূপভাবে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে দেশমাতৃকাকে হিন্দুদের দেবদেবীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা ইস্‌লামের দৃষ্টিতে আদৌ নিন্দনীয় নহে। আরবের ও পারস্যের কবিগণ এইরূপ উপমামূলক বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'বন্দে মাতরম্'-এ হিন্দু দেবদেবীর নিকট মুসলমানের মাথা নোয়াইবার কোনো প্রশ্ন উঠে না। কোনো মুসলমান পরিপূর্ণ ঈমান লইয়া ও আল্লাহতালার প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গাহিতে পারে, এরূপ করিলে তাহার ঈমানের একটুও ব্যাঘাত উৎপাদন হইবে না। তারপর *আনন্দমঠ*-এর সহিত সংযুক্ত বলিয়া 'বন্দে মাতরম্' বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠিয়াছে, একাধিক লেখক ইতিহাসের পারম্পর্য পেশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, *আনন্দমঠ*-এর বহু পূর্বে উক্ত সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। সুতরাং সে কথা পুনরায় উত্থাপন করা বাতুলতা মাত্র।

কোনো সঙ্গীত অথবা অন্য কোনো বিষয়কে গ্রহণ অথবা বর্জন করিবার মানদণ্ড ইহা নহে যে, উহা অমুক স্থান হইতে গৃহীত হইয়াছে ;—বরং তাহা গ্রহণ ও বর্জনের একমাত্র মানদণ্ড এই যে, তাহার নিজস্ব কোনো গুণ বা দোষ আছে কিনা। পারস্যের অমর কবি হাফেজ যখন তাঁহার অমর গ্রন্থের প্রথম একটি লাইন পাপাত্মা এজিদের কবিতা হইতে গ্রহণ কারিয়াছিলেন, তখন অনেকেই তাহাতে রাগান্বিত হন। তদুত্তরে কবি বলেন, মুক্তা কুড়াইয়া লইতে হইলে স্থানের বিচার করিতে হয় না। আমরা 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সম্বন্ধেও সেই কথাই বলিতে পারি। ইহার অন্তর্নিহিত মাধুর্যের কারণে ইহা জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। *আনন্দমঠ* ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করে নাই। ইহার মর্যাদা অপূর্ব শব্দসম্ভার ও ভাবসম্পদে। অবশ্য আমরা 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে যতই কিছু বলি না কেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য অন্য কোনো উপায় আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন তুমুলভাবে চলিতে থাকিবে। কংগ্রেস-সেবী হিসাবে আমরা কয়েকটি কথা মাননীয় নেতাদের সমীপে নিবেদন করিব। দেশের 'মাইনরিটি' সম্প্রদায় কংগ্রেসের অবলম্বিত কোনো কার্যের প্রতিবাদ করিলে করাচী প্রস্তাব অনুসারে প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্মী সেই প্রতিবাদ সম্বন্ধে একটা বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য। 'মাইনরিটিদের' অভিযোগের প্রতিকার করিতে প্রস্তুত না হইলে করাচি প্রস্তাবের কোনোই মূল্য থাকে না। মুসলমানগণ 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলিয়াছেন, তাহা কি সেই ধরনের অভিযোগ, যাহার প্রতিকার করাচি প্রস্তাবে পাওয়া যাইতে পারে? অথবা ইহা কি জিন্না সাহেবের চতুর্দশ দফার আর একটি বর্ধিত আকার, যাহার প্রতিকার কংগ্রেসের দ্বারা কোনো মতেই হইতে পারে না? ইহা বিবেচনা করিবার বিষয় বটে। তবে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, যে সব মুসলমান

কংগ্রেসের দলভুক্ত, তাঁহারা এযাবৎ কেহই 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই। অথচ যাঁহারা চিরকালই কংগ্রেস-বিরোধী এবং কংগ্রেসে যোগদানের যাঁহাদের কোনোই সম্ভাবনা নাই, কেবল তাঁহারাই 'বন্দে মাতরম্'-কে উপলক্ষ্য করিয়া মুসলমানের মধ্যে কংগ্রেস-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। এখানে আর একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতেছি, কংগ্রেস যদি জিন্নাপন্থীদের একটি প্রাণীও কংগ্রেসের পতাকার তলে সমবেত হইবেন না। কারণ উদ্দেশ্যে ত আর 'বন্দে মাতরম্' বাতিল করা নয়—অন্য একটা ষড়যন্ত্র পূর্ণ করিবার জন্য উহা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

মুসলমানের দৃষ্টিতে 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে তিনটি বিষয় উত্থাপিত হইতে পারে—(১) 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি, (২) সঙ্গীতটির প্রথম দুই কলি, (৩) সমগ্র সঙ্গীতটি। 'বন্দে মাতরম্!' এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শ্রোতার মনে ভারতবাসীর পঞ্চাশ বৎসরের জাতীয় সংগ্রামের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। 'বন্দে মাতরম্'!! লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে যখন স্বেচ্ছাসেবকগণ আকুলভাবে ডাকিয়া উঠে 'বন্দে মাতরম্', তখন সমগ্র জনতা অধীর উৎসাহে পুলকিত হইয়া উঠে। কোন্ সুদূর অতীতে কত শত জন জাতীয় পতাকা স্বহস্তে বহন করিয়া এই 'বন্দে মাতরম্'-এর জন্য প্রাণবিসর্জন দিয়াছে, তাহারই স্মৃতি তখন জনতার মন উৎক্ষিপ্ত করিয়া তোলে ; —সে তখন সেই ভাবে আত্মবলি দানের কথাই ভাবিয়া থাকে। ভারতবাসী কোনো দিনই জাতীয়তার বীজমন্ত্র এই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। যদি তাহাকে বলা হয়, অতীতের পঞ্চাশ বৎসরের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেল, তাহার প্রাণপণ স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভুলিয়া যাও, স্বদেশি যুগ ও অসহযোগ এবং আইন-অমান্য যুগের সমস্ত গৌরবময় ইতিহাস ভুলিয়া যাও—আর যদি সে নির্বিচারে তাহা ভুলিয়া যাইতে পারে, তবেই সে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি বিস্মৃত হইবে—অথবা পরিত্যাগ করিবে। স্বদেশি যুগ, অসহযোগ ও আইন-অমান্য যুগ আজ আমাদের নিকট অতীত ইতিহাসের বস্তু ; এই সব পুণ্যময়স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, বিস্মৃতির কবল হইতে হৃদয় মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে একটি মাত্র ধ্বনি—'বন্দে মাতরম্।' এই ধ্বনি ভারতবাসী কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লীগ-পন্থিগণ লজ্জায় মরিয়া যাইবেন ; কারণ এইদীর্ঘ ৫০ বৎসরের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁহাদের দিবার মত কিছুই নাই। পরাজয় ও অকর্ম্মণ্যতার গ্লানি মুছিবার জন্য আজ তাঁহারা 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। তা লাগুন, যাহা ইচ্ছা করুন। আমরা স্পষ্টভাবে বলিতে চাই, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেশবাসী কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুই কলিতে কোনো একেশ্বরবাদীর আপত্তি করিবার মত একটা শব্দও নাই। ওই দুই কলিতে দেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র। আমাদের দেশ কী সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা নয়?—ইহার যামিনী কি শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত নহে? ইহার কাননে কাননে কী ফুল্ল কুসুম স্ফুটিত হইয়া হৃদয়কে মুগ্ধ করে না? আমাদের

এই মধুর দেশ কী দ্রুমদল দ্বারা সুশোভিত নহে? যে দেশে কাননে-কান্তারে সৌন্দর্য, রূপ ও শোভা নিত্য বিরাজমান, সে দেশ কি সুহাসিনী নহে? সে দেশ কি মধুরভাষিণী নহে? 'বন্দে মাতরম্'-এ দেশমার্তৃকার বর্ণনা পড়ে—'মাঝখানে তুমি দাঁড়িয়ে জননী শরৎকালের প্রভাতে'। সুতরাং 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুই কলির বিরুদ্ধে কাহারও একটা কথা বলিবার থাকে না। এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত অল্প ভাষায় এরূপ নিপুণভাবে দেশের বর্ণনা করিয়াছে—যাহার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। শেষ কয়েকটি কলি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলিয়াছি, তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। আমাদের বিবেচনায় শেষ কলিগুলিতেও পৌত্তলিকতার কোনো স্তব বা গান নাই।

আমাদের পঞ্চাশ বৎসরের জাতীয় সংগ্রামের সহিত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতি কিছুতেই আজ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কংগ্রেস মডারেটগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যেমন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ পরিত্যাগ করিতে পারে না, জাতীয় পতাকার স্থানে ইউনিয়ন-জ্যাককে গ্রহণ করিতে পারে না,—সেইরূপ 'বন্দে মাতরম্'-এর স্থানে অন্য কোনো সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে এই 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত জাতির মাথা উঁচু করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। মুমূর্ষু জাতি এই সঙ্গীত গাহিয়া নব কলেবরে জাগিয়া উঠিয়াছে ; হতাশায় নিরাশায় জাতির শক্তি যখন বিখণ্ডিত হইতে বসিয়াছিল, তখন জাতি এই সঙ্গীতকে সম্বল করিয়া আবার এক হইয়াছে—আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে পুলিশের মৃদু যষ্টির ভয়, জেল-অন্তরীণে ভয়, পদে পদে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপের ভয়—এই দৃশ্যের মধ্যে হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক এই সঙ্গীত গাহিয়া জাতির সম্মান রক্ষা করিয়াছে। এতদিন পরে—এতদিনের মহা সাধনার পর জাতি যখন সিদ্ধির পথে পাড়ি দিয়াছে, তখন সে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও সঙ্গীত কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না—দৃঢ়ভাবে এই সঙ্গীতকেই ধরিয়া রাখিবে। অতীতে জাতিকে এই 'বন্দে মাতরম্'-এর জন্য বহু বিপদ-ঝঞ্ঝা সহ্য করিতে হইয়াছিল—ভবিষ্যতেও সেইরূপ সহ্য করিতে হইবে ; বিপদের কাল রাত্রি সম্মুখে—সাম্প্রদায়িকগণ, সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দাগণ—নূতন মূর্তিতে, নূতন ছলনা লইয়া দেশের মহাব্রতকে নষ্ট করিতে আসিতেছে—অচিরেই তাহাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইবে। বলো দেশবাসী, উচ্চকণ্ঠে বলো—'বন্দে মাতরম্'! সেই বরিশালে ও সিরাজগঞ্জে যেরূপ উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলে, তেমনি জোরে মিলিতকণ্ঠে বলো—'বন্দে মাতরম্'।

'*বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমানসমাজ*, ১৯৪৪, পৃ. ৯০-১০২

বন্দে মাতরম্ নয়, নমস্তে

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

বাঙলাদেশের জাতীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত কবে প্রবলভাবে এল, সে বিষয়ে 'বঙ্কিম-জীবনী' প্রণেতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯১৩ সালের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে উত্থার করেছেন এই কথাগুলো :

> During Bankim Chandra's lifetime the *Bande Mataram*, though its dangerous tendency was recognised, was not used as a party war-cry; it was not raised, for instance, during the Ilbert Bill agitation, nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendra Nath Banerji in 1883. It has, however, obtained an evil notoriety in the agitation that followed the partition of Bengal.

১৮৯৪ সালেই অবশ্য অরবিন্দ Induprakash পত্রিকায় লিখলেন, বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কমে আসছে, লোকের মন হিন্দুধর্মের দিকে ফিরছে। তরুণদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হচ্ছে। কেশব সেন ও কৃষ্ণদাস পালের অনুসরণকারী দাসসুলভ ইংরেজ অনুকরণকারী তরুণদের পরিবর্তে বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত তরুণরা এসে গেছেন।

এর আগে ১৮৮৪ সালে হিন্দুধর্ম প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের প্রবল মসীযুদ্ধ হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ এবং বিধবাবিবাহ-জাতীয় সংস্কারবিমুখতা তখন খুবই লোকপরিজ্ঞাত। তবে বঙ্গিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্নেহশীল ছিলেন।

ঠিক কবে জানা যায় না, কিন্তু ১৩৪৪ সালে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হল, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথমাংশ নিজে সুর বসিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন।

১৮৮৫ সালে বালক পত্রিকায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় দেশ রাগে 'বন্দে মাতরম্'-এর কিয়দংশ স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হল। 'বন্দে মাতরম্' তখনই বিখ্যাত, একথা *বালক* পত্রিকায় লেখা হল। যদিও গানটির প্রকাশ হয় *বঙ্গদর্শনে* ১৮৮১ সালে *আনন্দমঠ*-এ, ১৮৭৫ সালে গানটির রচনা হয়েছে অনুমিত হলেও।

১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসল কলকাতায়, তাতে 'বন্দে মাতরম্' গীত হল, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাখীবন্ধন কবিতার মারফৎ সেটা আমরা জানতে পারছি। সেই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গাইলেন স্বরচিত গান, 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।'

রবীন্দ্রজীবনীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ১৮৯০ সালে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্তান্তে লেখেন 'বন্দে মাতরম্' এবং *আনন্দমঠ*-এর বাইরে জাতীয় ধ্বনি হিসেবে এই প্রথম এর ব্যবহার ঘটল।

১৮৯৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গাইলেন উদ্বোধন সংগীত হিসেবে। ওই অধিবেশন উপলক্ষ্যেই তিনি রচনা করলেন 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'। এই গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিলষ দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিশিয়ে গান লিখতে। অনুরোধ করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পালের মতো লোকেরা। এই দুর্গামূর্তির জন্যই রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'বন্দে মাতরম্-কে গ্রহণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করে লিখলেন এই 'ভুবনমনোমোহিনী' দেশমাতৃকার স্তব, পূজার গান নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে অবশ্য তাঁর এই গানটিও সাম্প্রদায়িক গান, সর্বভারতীয় গান নয়। পরবর্তী যুগে তিনি 'বন্দে মাতরম্' গানের শুধু প্রথম অংশটিই সর্বভারতীয় গান বলে অভিহিত করেছেন। বাকি অংশটুকু প্রবলভাবেই সাম্প্রদায়িক গান বলে তিনি বিবেচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কখনোই একরেখ ছিল না। তাঁর বয়স যখন বারো তেরো তখন *বঙ্গদর্শন*-এ *বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর* বেরচ্ছে : 'একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত।' (জীবনস্মৃতি)। এর পর পনেরো বছর বয়সে তিনি মরকতকুঞ্জে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখলেন, সেই দর্শন দেবদর্শনের মতো। একুশ বছর বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলেন (১৮৮২)। এর পরের বছর বঙ্কিমচন্দ্র জানালেন, *বউঠাকুরাণীর হাট* স্থানে স্থানে অতি সুন্দর উচ্চদরের কিন্তু উপন্যাস হিসেবে নিষ্ফল। তাঁর মতে, উদীয়মান লেখকদের মধ্যে (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ) রবিই বেশ গিফটেড কিন্তু প্রিকশাস। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ *বউঠাকুরাণীর হাট* বেরুবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন, তাঁর কাছে এই উৎসাহবাণী ছিল বহুমূল্য। এর পরের বছর ঘটল ধর্ম বিষয়ে মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই তর্কে রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষেই ছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন ভারতীতে তাঁর এই বঙ্কিমবিরোধী প্রবন্ধ দুটোর জন্য। ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ বেরুলে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন। ১৮৯৩ সালে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করলেন

'ইংরেজ ও ভারতবাসী'। সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র। পাঠ করবার আগের দিন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বক্তৃতাটি দেখিয়ে এসেছিলেন, সম্ভবত রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতিগত নিরাপত্তার জন্যই। ১৮৯৪ সালের মে মাসে বেরুল তাঁর *রাজসিংহ* বিষয়ে প্রশস্তিমূলক লেখা। সেই মাসেই বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমশোকসভা আয়োজন করার চেষ্টা করলেন, নবীনচন্দ্র সেনের বিরোধিতায় সেই শোকসভা হল না। রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন তাঁর *বঙ্কিমচন্দ্র* প্রবন্ধ চৈতন্য লাইব্রেরিতে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে দানের জন্য বাঙালির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই *কৃষ্ণচরিত্র* প্রবন্ধে বঙ্কিমের মননশীলতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ প্রকাশ হল। এরপর ১৯০২ আবার বঙ্কিমের সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করলেন, শকুন্তলা প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাস ও শেক্সপীয়ারের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই সাদৃশ্য একেবারে অমূলক।

শ্রীসরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁর *জীবনের ঝরাপাতা* গ্রন্থে লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথই 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম সুর বসিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া সুরে ওই দুটি পদে গানটি সর্বত্র চালিত হল। একদিন মাতুল আমায় ডেকে বললেন, 'তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল না।' ওরকম ভার মাঝে মাঝে আমায় দিতেন। তাঁর আদেশে 'সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে ও গোড়ার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর দিয়ে ফুটিয়ে নিলুম। দুই একটা জাতীয় উৎসবে সমস্বরে বহুকণ্ঠে বহুজনকে গাইতেও শেখালুম। সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকল।
>
> 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি মন্ত্র হল সর্ব প্রথম যখন মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রোসেশন করে নিয়ে যাবার সময় ওই শব্দদুটি হুংকার করে যেতে থাকল। সেই থেকে সারা বাংলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ওই মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ল—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যখন গবর্ণর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল আহিমালয় কুমারিকা পর্যন্ত ওই বোলটি ধরে নিলে।

সরলাদেবীর স্মৃতিকথা থেকে মনে হয় ময়মনসিংহের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী অর্থাৎ ১৯০৫ সালের আগে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় মন্ত্র হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়নি। সরলাদেবী তাঁর স্মৃতিকথায় সনতারিখ কখনও উল্লেখ করেননি। ফলে কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। *বালক* পত্রিকায় 'বন্দে মাতরম্'-এর কিয়দংশের স্বরলিপি বের হয় ১৮৮৫ সালে। তখন সরলাদেবীর বয়স তেরো। ধরে নেওয়া যায় সেই সময়ে প্রকাশিত স্বরলিপি তাঁর নয়। তিনি এই স্বরলিপি যে আছে তা জানতেনও না। সুর হয়তো রবীন্দ্রনাথের হয়তো প্রতিভাসুন্দরী দেবীর, যাঁর নামে স্বরলিপি বেরিয়েছিল। ১৮৯৬

সালের কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ যখন 'বন্দে মাতরম্' গাইলেন, তখনকার সুর হয়ত, প্রথম পদদুটো রবীন্দ্রনাথের, পরবর্তী অংশ সরলাদেবীর।

তবে 'বন্দে মাতরম্' গানটি জনপ্রিয় করার ব্যাপারে সরলাদেবীই ছিলেন অগ্রণী। এলাহাবাদ কংগ্রেসে (১৯১০) তিনিই সপ্তকোটির স্থলে ত্রিংশকোটি বলে গেয়ে 'বন্দে মাতরম্'-কে সর্বভারতীয় করে নিলেন।

অবশ্য সরলাদেবী বহু পরে তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন। ফলে অনেক সময়েই তাঁর কালবিভ্রম ঘটে থাকতে পারে। ওই স্মৃতিকথায় কিছু আগেই তিনি লিখেছেন :

> 'বন্দে মাতরম্' এর প্রথম দুটি পদে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) সুর দিয়েছিলেন নিজে। তখনকার দিনে শুধু সেই দুটি পদই গাওয়া হত। একদিন আমার উপর ভার দিলেন। 'বাকি কথাগুলিতে তুই সুর বসা। তাই—'ত্রিংশকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত কথায় প্রথমাংশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমি সুর দিলাম। তিনি শুনে খুশী হলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু হল।

এমনও হতে পারে, এলাহাবাদ কংগ্রেসের আগেই, সরলাদেবী রবীন্দ্রনাথকে শোনানোর সময় ত্রিংশকোটি শব্দটিও যুক্ত করেছিলেন। অথবা এই শেষের উক্তিতে ভ্রমবশত তিনি সপ্তকোটি বলতে গিয়ে ত্রিংশকোটি বলে ফেলেছেন।

'বন্দে মাতরম্' কীভাবে চালু হচ্ছে তার কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছেন সরলাদেবী :

> পঞ্জাবেও আমি যাবার পর থেকে মেয়েদের সঙ্গীতচর্চা ভালরকম হতে থাকল। মাদ্রাজ, মহীশূর ভিন্ন আর কোনো অংশে মেয়েদের সঙ্গীতজীবন একেবারে বিকশিত দেখিনি—সে সঙ্গীতের তুলনা উত্তর ভারতে নেই। 'বন্দে মাতরম্'ও আমার গাইবার পর থেকে ক্রমে ক্রমে ভারতে সর্বত্র মেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। 'বন্দে মাতরম্' এর কথায় মনে পড়ে দিল্লী থেকে একজন বৃদ্ধ বড়ো ইংরেজ ব্যারিস্টার একবার লাহোরে একটা মকদ্দমায় এসেছিলেন। আমাদের বাড়ি চায়ে এসে সেই সময় বাঙলার অফিসারদের দ্বারা স্থানে স্থানে নিষিদ্ধ গানটি শুনতে কৌতূহল প্রকাশ করেন। আমি গাইলুম—পিয়ানো সহযোগে। তিনি শুনে বললেন—By Jove ! কথা বুঝি না বুঝি তোমার গাওয়া শুনে বুঝেছি কি তুমুল আলোড়ন আনতে পারে মনে। আমার স্বামীর দিকে ফিরে বললেন—আমি যদি Bengal Government হতুম তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে externment order জারি করতুম, যাতে আর কখনো বাঙালায় গিয়ে বাঙালীদের মাতিয়ে তুলতে না পারে।

সরলাদেবীর বিয়ে হয় ১৯০৫ সালে। এবং বাঙলার অফিসারদের দ্বারা 'বন্দে মাতরম্' স্থানে স্থানে নিষিদ্ধ হয়েছে ১৯০৬ সালেই। সুতরাং ধরা যায় এটা ১৯০৬ এর কাছাকাছি সময়।

১৯৩৭ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিবেচনা করতে বলেন 'বন্দে মাতরম্' কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লেখেন ২৬ অক্টোবর, তা থেকে আমরা এই খবর পাচ্ছি:

১ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্তবকে সুর দেন। যদুভট্টের দেওয়া সুর থাকলেও, তা তখনও পরিজ্ঞাত ছিল না, এখনও নেই।

২ কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ওই গান করেন, ১৮৯৬ সালে।

এই তথ্য যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাখীবন্ধন অবলম্বনে যে অনুমান করা হয় যে ১৮৮৬ সালেও 'বন্দে মাতরম্' গীত হয়েছিল, তা অগ্রাহ্য করতে হয়। ১৮৮৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এবং 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। বন্দেমাতরম্ সেই কংগ্রেসে গীত হলে রবীন্দ্রনাথের তা অজানা থাকার কথা নয়।

৩ 'বন্দে মাতরম্'-র প্রথম স্তবকটি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল কারণ, 'the spirit of tenderness and devotion ..... the emphasis it gave to beautiful and beneficial aspects of our motherland made special appeal.'

৪ গানটির অন্যান্য অংশ, আনন্দমঠের অনেক অংশ যার সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' গানটি বিশেষভাবে জড়িত, রবীন্দ্রনাথের কাছে ভালো লাগেনি, 'with all sentiments of which, brought up as I was in the monotheistic ideals of my father, I could have no sympathy.'

৫ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতের মতো হয়ে ওঠে।

৬ তরুণদের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় স্লোগান হয়ে ওছে।

৭ সমস্ত উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে 'বন্দে মাতরম্' -এর পুরো গানটি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট।

৮ কিন্তু গানটির প্রথম স্তবকটি পুরো গান থেকে আলাদা করে নেওয়া সম্ভব। এবং এই স্তবকটি স্বতন্ত্র এবং প্রেরণাদাত্রী বলে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত।

এইবার গানটি দেখা যাক্।

বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃত খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাং শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

রবীন্দ্রনাথ এবং সরলাদেবীর সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারছি রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন 'বন্দে মাতরম্' থেকে বরদাং মাতরম্ পর্যন্ত। বাকি অংশে সুর দেন সরলাদেবী এবং রবীন্দ্রনাথ সেটা শুনে খুশি নন। সভাসমিতিতেও পুরো গানটাই গাওয়া হত।

গানটির দ্বিতীয় স্তবকেও রবীন্দ্রনাথের আপত্তিজনক এমন কিছু নেই, যা প্রথম স্তবকে নেই। তৃতীয় স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'তোমারই প্রতিমা' এবং চতুর্থ স্তবকের দুর্গার ছবি ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের পৌত্তলিকতাবিরোধী সংস্কারকে আহত করে থাকবে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতের খবর দিয়েছেন— নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই গানটিকে পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক বা মুসলমানবিদ্বেষ-জনক বলে মনে করতেন না। সরলাদেবীর কথা যদি মানতে হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে সভাসমিতিতে পুরো গানটাই গাওয়া হত এবং প্রথম দিকে সেই অনেক সভাসমিতিতেই রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী অংশী ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত বাঙালি মনকে প্রচণ্ড উত্তেজনার খোরাক দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে দৃষ্টি এবং অনুভব বোঝার জন্য এই পারিপার্শ্বিকের সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ) থেকে কয়েকটি তথ্য দেখা যাক।

১. ওই দিন (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ ; ৩০ আশ্বিন, ১৩১২, অর্থাৎ যেদিন বঙ্গব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা আইন অনুসারে কার্যে পরিণত হইল) শোক প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ শিশু ও রোগী ব্যতীত সকলেই উপবাস করিবেন এবং কাহারও পাকশালায় রন্ধনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে না। সকলেই নগ্নপদে থাকিবে। দোকানপাট বন্ধ থাকিবে। ঘোড়ার গাড়ি বা গোরুর গাড়ি চলিবে না। যুবকগণ সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠিয়া 'বন্দে মাতরম্' সংগীত গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিবে।

২. (৩০ শে আশ্বিন) অপরাহ্নে অখণ্ড বঙ্গ-ভবন স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতার পার্শিবাগান মাঠে (এখন যেখানে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়) ফেডারেশন হল বা 'মিলন মন্দিরে'র ভিত্তি স্থাপিত হইল। রোগশয্যাগত আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্ব করিলেন। আরাম কেদারায় করিয়া তাঁহাকে সভাস্থলে আনা হইল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিলেন। ইংরেজিতে আশুতোষ চৌধুরি ও বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা পাঠ করিলেন।

৩. তিন সপ্তাহ পরে পশুপতি বসুর ভবনে বিজয়া দশমীর পরদিন (২১শে কার্তিক) বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হইল। ... এই সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তাহার উপসংহার উদ্ধৃত করিতেছি :

> ... আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণ যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দে মাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্।

৪. রংপুর। রংপুরের জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ৩১শে অক্টোবর (১৯০৫) এক বিজ্ঞপ্তি দিলেন যে, স্বদেশি আন্দোলনে পিকেটিং প্রভৃতি কোনরূপ সক্রিয় অংশগ্রহণ করিলে ছাত্রগণকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। ছাত্রেরা ইহা অগ্রাহ্য করিয়া ওই দিনই এক স্বদেশী সভায় যোগদান করিল। স্বদেশি গীত গাহিল এবং 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে সারা পথ মুখরিত করিয়া গৃহে ফিরিল।

৫. ১৯০৫ সনের ৮ নভেম্বর পূর্ববঙ্গের ছাত্র ও শিক্ষক দমনের জন্য চিফ সেক্রেটারি P. C. Lyon ঢাকা বিভাগের কমিশনারের নিকট দুইটি সার্কুলার পাঠাইলেন। তাহাতে

এই দমননীতি আরও প্রকট হইয়া উঠিল। ... নিষিদ্ধ আচরণগুলি এই ঃ রাস্তায় বা প্রকাশ্যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা।

৬. কলিকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় রিপোর্ট বাহির হইল—সারা অক্টোবর মাসে (১৯০৫), বিশেষত পূজার সময়, সমগ্র বরিশাল জেলায় ... শহরে ও জিলার সর্বত্র সভাসমিতির অধিবেশন হইতেছে এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করিতেছে। কোনো কোনো স্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হইয়াছে।

৭. হুকুমের পর হুকুম জারি করিয়া ফুলার সাহেব প্রকাশ্য স্থানে সভাসমিতি বন্ধ করিয়াছেন। কোনো ছাত্র বা অন্য কেউ রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিলেই পুলিশ তাহাকে ফৌজদারি কয়েদীর মতো গ্রেপ্তার করে।

৮. পরদিন দুপুরবেলা (১৯০৬ সনের ১৪ই এপ্রিল, বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে) সভাপতি এ. রসুল ও তাঁহার বিলাতী মেম গাড়িতে এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল ঘোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পদব্রজে চলিলেন। তাঁহাদের কেহ বাধা দিল না। কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে 'বন্দে মাতরম্' ব্যাজ ধারণ করিয়া যুবকের দল যেই রাস্তায় আসিল, অমনি ছয় ফুট লম্বা মোটা লাঠি দিয়া পুলিশ তাহাদের গুরুতর প্রহার করিতে লাগিল এবং 'বন্দে মাতরম' ব্যাজ জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে মারিতে মারিতে পার্শ্বের পুকুরে ফেলিয়া দিল। কিন্তু এই অবস্থাতেও সে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে বিরত হইল না।

৯. চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীর মুখপত্র 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় জ্বালাময়ী ও অনন্যসাধারণ ভাষায় তাঁহার (ফুলারের) বিরুদ্ধে যে সকল লেখা প্রকাশিত হইত তাহার জন্য সম্পাদক হিসেবে অরবিন্দ ঘোষ বিদ্রোহের অভিযুগে অভিযুক্ত হইলেন (১৯০৭, আগস্ট)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিবর্তনের পথ সন্ধান করা যেতে পারে। ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায় পরিচালিত শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন। ১৩১৪ সালের ৯ই ভাদ্র আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখছেন, 'Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দে মাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভালো কাগজ হয়েচে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানি নে।' মধ্যে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীর সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও বরিশালের সম্মিলনী পুলিশের তাণ্ডবে অনুষ্ঠিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সভাপতি হওয়া নিয়ে কাগজপত্রে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল, মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন *বঙ্গবাসী* সাপ্তাহিক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যোগ্য সভাপতি কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু বা নবীনচন্দ্র সেনকে আগে সভাপতি

করা উচিত ছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ২৫ চৈত্র ১৩১২ আগরতলা থেকে চিঠি লিখছেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ঘুরিয়া মরিতেছি। সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়ে গেছি। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা কিন্তু আমার মন বিদ্রোহী হইতেছে। বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে। শনি আমাকে ঘুরাইতেছে। রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না।'

এই বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

> পরযুগে অনেকে বলিতেন যে, গভর্মেণ্টের ধর্ষণনীতি অবলম্বনের পর হইতে কবি রাজনীতির পথ ত্যাগ করেন। সেকথা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সহিত যথার্থভাবে তিন মাস মাত্র যুক্ত ছিলেন—১৩১২ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'বিদায়' কবিতায় প্রকাশ করেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস : 'বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই। কাজের পথে আমি তো আর নাই।' এইটি লিখিত হয় চৈত্রমাসে (১৩১২)। তখনো বরিশালের যজ্ঞভঙ্গ হয় নাই, ইংরেজের রুদ্রশাসন দেখা দেয় নাই। বাংলাদেশে রুদ্রপন্থীদের রাজনৈতিক ইত্যাদি সংঘটিত হয় নাই। ... বাঙালি তাঁহার গানগুলি কণ্ঠে তুলিয়া লইল। তাঁহার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিল না।

গানগুলি কী? রবীন্দ্রনাথ এসময়ে প্রবলভাবে স্বদেশি গান লিখছেন। ১৩১২ ভাদ্র-আশ্বিনের ভাণ্ডারে প্রকাশ হল পনেরোটি স্বদেশি গান। ১৩১২ আশ্বিনের বঙ্গদর্শনে দুটো স্বদেশি গান। ১৩১২ কার্তিকের বঙ্গদর্শনে তিনটি স্বদেশি গান। এই সব গানগুলোর মধ্যে দেশকে 'মা' বলে ভাবা হয়েছে (বন্দেমাতরম্ গানের মতো) এই এই গানে : (১) আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি। (২) মা কি তুই পরের দ্বারে। (৩) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক। (৪) আমার সোনার বাংলা। (৫) ও আমার দেশের মাটি। (৬) সার্থক জনম আমার। (৭) আমরা পথে পথে যাব সারে সারে।

লক্ষ্য করবার বিষয়, গীতবিতানে যে ৪৬টি স্বদেশমূলক গান সংগৃহীত হয়েছে, তার ২৩টি গানই ১৩১২ সালে রচিত, ১০টি গান ১৩১২ সালে আগে এবং বাকি ১৩টি মাত্র ১৩১২-এর পর। পরবর্তী গানগুলো বেশির ভাগই নাটক রচনার সূত্রে প্রস্তুত। প্রমদারঞ্জন ঘোষ তাঁর 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন' (১৯৬৩) গ্রন্থে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের নাতি স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনেছি, ওই যুগে দেশের গান রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জল ঝরতো।'

পরবর্তীযুগে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশমূলক গান লেখেননি কেন? এলমহার্স্ট তাঁর Poet and Plowman গ্রন্থে ১৯২২ সালের ১৫ মার্চের দিনলিপিতে লিখেছেন

> My father was', Rathi said, "warned by the British Government not to compose any more songs that might fire patriotic fervour.'

রোটেনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলি রক্ষিত হয়েছে যে গ্রন্থে, Imperfect Encounter, সেই গ্রন্থেও আমরা খবর পাচ্ছি লর্ড কার্জন কী পরিমাণ ক্রুদ্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ওপর। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যাণ্ডে গেলেন তখন সেখানকার রবীন্দ্র-অনুরাগীরা চেষ্টা করেছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কোনো ডিগ্রি দেওয়ানোতে। অক্সফোর্ডের চ্যান্সেলর তখন লর্ড কার্জন। ফক্স স্ট্র্যাঙওয়েজ তাঁর ধারণা বলছেন :

লর্ড কার্জন did not wish a University of which he is Chancellor to take public notice of one who had added politically to the labours of the Viceroy.

এর আগে, ১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গ-আসাম সরকারের গোপন ইস্তাহারের ফলে শান্তিনিকেতন সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের পক্ষে শিক্ষার অনুপযোগী বিবেচিত হয়েছিল, ছাত্ররা দলে দলে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেছিল এবং শিক্ষক হীরালাল সেনকেও শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের জন্য একটা কোড নম্বরও ধার্য করেছিল পুলিশ।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ভয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের কথা ভাববেন না, এটা অনুমান করা শক্ত. অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *ঘরোয়া* গ্রন্থে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন অন্যদের সঙ্গে তখন পুলিশ প্রায়ই হানা দিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ্য সভায় পাঠ করেছিলেন অথবা প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

দেশনায়ক : ১৩১৩, ১৫ বৈশাখ, পশুপতি বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে।
স্বদেশি আন্দোলন : ১৩১৩, কার্তিক, ভাণ্ডার, ডন সোসাইটির সভায়।
সাহিত্য সম্মেলন : ১৩১৩ কলিকাতা কংগ্রেসের সাহিত্যসম্মেলন।
ব্যাধি ও প্রতিকার : ১৩১৪ শ্রাবণ, *প্রবাসী*
যজ্ঞভঙ্গ : ১৩১৪ *প্রবাসী*
পাবনা সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ : ১৩১৪
পথ ও পাথেয় : ১৩১৫, ১২ জ্যৈষ্ঠ, *চৈতন্য লাইব্রেরি*
সমস্যা : ১৩১৫, আষাঢ়, *প্রবাসী*
সদুপায় : ১৩১৫, শ্রাবণ, *প্রবাসী*
পূর্ব ও পশ্চিম : ১৩১৫, ভাদ্র, *প্রবাসী*
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সংক্ষিপ্ত) : ১৩১৫ ভাদ্র, *বঙ্গদর্শন*
দেশহিত : ১৩১৫ আশ্বিন, *বঙ্গদর্শন*

১৩১৫-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় বহু পরে ১৩২৬ সালে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতাপাঠের সময়।

রাজরোষের ভয়ে না হলেও, 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে রবীন্দ্রদৃষ্টি পালটাচ্ছে বোঝা যায়, এই সময়কার তাঁর বিবর্তন লক্ষ্য করলে। ১৩১৩ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সাহিত্যসম্মেলনেও তিনি 'বন্দে মাতরম্'কে মহামন্ত্র বলছেন। কিন্তু সুরাট কংগ্রেসের তাণ্ডবের পর ১৩১৪ সালের ২৩ পৌষ রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন—

> আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়, আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।

'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে মত পরিবর্তন দুটো কারণে ঘটছে। একটা, দেশের লোকের 'বন্দে মাতরম্' আওড়ানোই কেবল তাঁর ভালো লাগছিল না, সেই মন্ত্রের সঙ্গে প্রকৃত দেশসেবার কোনো যোগাযোগ ছিল না বলে। ২,৩ দ্বিতীয় কারণ, দেশকে মা বলে ভাবা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না।

দ্বিতীয় কারণটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনে সাকার দেশমাতৃকা কল্পনা কতটা কষ্টসাধ্য ছিল, তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে, রথীন্দ্রনাথের আচরণে। এলমহার্স্ট তাঁর Poet and Plowman-এর স্মৃতিচারণায় লিখছেন :

> Rathi Tagore once told me of how, after his return from studying in America in 1909, he was nearly persuaded to join the revolutionaries in Bengal who had decided that forceful methods were the sole means left to them of bringing about the overthrow of the Imperial Government. He had at the last moment been inhibited, however, by the form of oath he was told he would have to swear at his initiation in front of the image of the Goddess Kali.

সন্ত্রাসবাদীদের কাছে 'বন্দে মাতরম্' ছিল প্রিয় মন্ত্র।[৪]
প্রমদারঞ্জন ঘোষ লিখছেন :

> সে বছর দেশমাতার মূর্তি হিসাবে শিবাজীর পূজিত ভবানীদেবীর মৃণ্ময়ীমূর্তির পূজা নাকি ছিল উৎসবের অঙ্গ। প্রতিমা পূজা রবীন্দ্রনাথের সংস্কারে বাঁধে। তাই তিনি ভবানীপূজায় যোগ দিলেন না। ধূমধামের সঙ্গে পূজা হল। সেবার তিলক নাকি পঁচিশ হাজার লোকের সঙ্গে মিছিল করে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। মিছিলে আগে ছিল অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ভারতমাতার প্রসিদ্ধ ছবিখানা।

১৮৯৯ সালে সরলাদেবীরা অনেকে কাশী বেড়াতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখে প্রণাম করেছিলেন। 'এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে রবিমামার কানে যখন পৌঁছল তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোরা এই রকম করে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলি? মিথ্যাচার করলি?'

সরলাদেবী কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে ভোলেননি, রবীন্দ্রনাথের হাতে ব্রহ্মসঙ্গীতের বিপুল পরিবর্তন ঘটছিল। রামমোহন যুগের পরবর্তী ব্রহ্মোৎসবের রবীন্দ্রের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অপাণিপাদ নন, তিনি সর্বতো অক্ষি সর্বত্র শিরোমুখ। রামমোহন রায়ের সময়কার নিরাকার ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথের হাতে সাকার হয়ে গেছে। 'অথচ ভাবের চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেই—মাটি-খড়ে, ধাতু-প্রস্তরে, বর্ণে-চিত্রে ভাবের উপলক্ষ্য ভগবানকে পূর্ণ লক্ষ্য করে মূর্ত করে আঁকড়ে ধরলেই রবীন্দ্রনাথ উত্ত্যক্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন।

একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সংস্কারে দেশকে মূর্তিমতী মা বলে ভাবা কষ্টসাধ্য হচ্ছে, তার থেকেও বড়ো দুঃখের কারণ, রবীন্দ্রনাথের কর্মপদ্ধতি দেশের লোকে গ্রহণ করছে না।'

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ পাঠ করলে যে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল, রাজনৈতিক আন্দোলনের চাইতে তিনি গুরুত্ব দিতেন দেশগঠনের উপর বেশি। পল্লীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে প্রথমে, তার পর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন। একেই তিনি বরাবর বলে এসেছেন আত্মশক্তি।

রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি বনাম রাষ্ট্রশক্তির এই দ্বন্দ্ব বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামতে দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁরা তাঁর এই আত্মশক্তির ওপর জোর দেওয়াটা তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করতে পারেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পল্লি গঠনের কাজ অন্য দৃষ্টিতেও দেখা যেতে পারে, যাতে মনে হবে তাঁর এই দর্শন ছিল বিপ্লবাত্মক।

যে-কোনো যুগান্তকারী বিপ্লবের সময়ে দেখা যায়, একটা দেশে রাষ্ট্রশক্তির সার্বভৌমত্ব খণ্ডিত হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় দেখা গিয়েছিল রাজার হাতে সার্বভৌমত্ব পুরো আয়ত্তে নেই, ইংল্যাণ্ডের বহু লোকের আনুগত্য চলে গিয়েছিল পার্লামেণ্টের প্রতি। আমেরিকার স্বাধীনতা বিপ্লবের সময় জনসাধারণের আনুগত্য ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আর থাকেনি। ফরাসী বিপ্লবের সময় জনসাধারণের আনুগত্য চলে যায় এস্টেটস জেনারেলের দিকে। সোভিয়েট বিপ্লবের সময় জনসাধারণ অনুগত হয় বিভিন্ন সোভিয়েট সংগঠনের। চীনা বিপ্লবের সময় কুওমিনটাঙ্ সরকারের কথাবার্তা শোনার লোক কমে যায়।

এই সব বিপ্লব পর্যালোচনা করলে যেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল বিপ্লব শুধু সংহারমূলক ক্রিয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াও। যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা সংগঠন

ধ্বংস হচ্ছে তার পরিবর্তে কোন্ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা সংগঠন আসবে, তার প্রকাশ না হলে বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশাত্মমূলক সংগঠনের কাজ সচেতনভাবে এই দৃষ্টিতে না দেখলেও, তাঁর কাজ বিপ্লবের এই মূল নীতির অনুসারী। ইংরেজকে দূর করাই সবচেয়ে বড়ো কাজ নয়। ইংরেজকে দূর করার পর কে এই সৃষ্টি কাজে অগ্রসর হবে, এই চিন্তা তাঁকে বিব্রত করেছিল। পল্লির দারিদ্র্য, অনৈক্য, অবিদ্যা, সংগঠনের অভাব—এই অবস্থায় দেশবাসী কোনো মহত্তর সৃষ্টির দিকে এগুতে পারবে না। সুতরাং ইংরেজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হবার আগে দেশকে তৈরি হতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর যাবতীয় রাজনৈতিক প্রবন্ধের একমাত্র বক্তব্য। ইংরেজ সরকারের সার্বভৌমত্ব সংহার করার আগে বা সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের নিজের কোনো সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন তৈরি না হয়ে ওঠে, তাহলে কোনো বিপ্লবই সার্থক হবে না—বর্তমান পরিভাষায় বলা যায় এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯০৫-১৯০৬ সালে এই জাতীয় বক্তব্য আর কেউ রাখেননি। পরবর্তী যুগেও একমাত্র মহাত্মা গান্ধি এগিয়ে এসেছিলেন এই সৃষ্টিমূলক কাজে—তাঁর হরিজননীতি, চরকানীতি, পল্লি সংগঠন ইত্যাদির মধ্যে। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তব্যে মিল ছিল না। কিন্তু সৃষ্টিমূলক কাজে গান্ধির উৎসাহের জন্যই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে শ্রদ্ধা করতেন।

রাজনীতি থেকে রবীন্দ্রনাথের সরে আসার মূল কারণ, তিনি এই সৃষ্টিমূলক সংগ্রামে কোনো সমর্থন পাননি তদানীন্তন রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের তুমুল কোলাহলের পর যখন দেশ ঝিমিয়ে পড়ল, রবীন্দ্রনাথও ক্রমশঃ সরে আসতে লাগলেন এবং নিজের সাধ্যমতো শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের কাজে, নিজের জমিদারিতে সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটি তাঁর এই প্রসঙ্গে লেখা বলে রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন, অ্যানড্রুজকে লেখা চিঠিতে (৭ জানুয়ারি, ১৯২১)। ১৯০৮ সালের পর তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধের অনুপস্থিতির কারণ এটাই সবচেয়ে বড়ো বলে মনে হয়।

'বন্দে মাতরম্' এর প্রতি তাঁর বিরূপতাও সম্ভবতঃ এই কারণ থেকেই শুরু হয় এবং বাড়তে বাড়তে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র বিপক্ষতায় পরিণত হয়। প্রমদারঞ্জন ঘোষ লিখেছেন, শান্তিনিকেতন উপাসনায় বক্তৃতা করতে গিয়ে দেশের কথা এসে গেলে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। তাঁর মুখে যেন খই ফুটতে শুরু করত। প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি সময় তাঁরা শুনলেন রবীন্দ্রনাথের মুখে, 'বন্দে মাতরম্' নয়, নমস্তুতে।

১৯১৬ সালে, *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের শুরুতেই বিমলা জানিয়ে দেয় :

অথচ স্বদেশি কাণ্ডের সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন

> তা নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলতেন, দেশকে সেবা করতে রাজি আছি। কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

পুরো *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসটিই বলা যেতে পারে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখা।

নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার এক সাংবাদিককে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, " 'বন্দে মাতরম্' যথেষ্ট হইয়াছে। এখন 'বন্দে মাতরম্' স্থানে 'বন্দে মারতম্' বল। জাতীয় পতাকা উড়াইয়া কিংবা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা চরকায় কাটিয়া তোমরা স্বরাজ পাইবে না। জনসাধারণের জন্য গঠনমূলক কার্যের দ্বারা এবং তোমাদের দেশবাসীকে কার্যতঃ সেবা করিয়াই তুমি উহা অর্জন করিতে পারিবে।"[৬]

১৯৩৪ সালে *চার অধ্যায়* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

> শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি।

১৯৪০ সালে 'ল্যাবরেটরি' গল্পে লিখলেন :

> বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি?

১৯১০ সালে *গোরা* শেষ করেন রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে :

> গোরা কহিল, 'মা তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'

দেশকে মা ভাবা রবীন্দ্রনাথের এই বোধ হয় শেষ। এরপর ১৯১৪ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি দেশকে মা বলে ভাবতে বিরক্ত হতেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাঁর 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রতি অনুরাগ। শেষ পর্যন্ত গানটির প্রথম স্তবকটি যে তিনি অনুমোদন করেছেন, তা-ও বোধ হয় বাধ্য হয়ে।

'বন্দে মাতরম্'-এর অন্তর্লীন অর্থের জন্য ততটা হয়তো নয়, বিরূপতার বড়ো কারণই ছিল মন্ত্রটির অনুৎপাদক ব্যবহার। যে রবীন্দ্রনাথ একসময় তাঁর বক্তৃতা বা প্রবন্ধ শেষ করতেন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে, সেই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' শুনলেই ক্ষেপে যেতেন কিছুদিন পরেই।[৭] পরবর্তী কালে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের অর্থ যা-ই হোক, এটা হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক এবং দলীয় যুদ্ধ রব। 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লা হো আকবর' হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার যুদ্ধ-চিৎকার, যেমন 'বন্দে মাতরম্' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' হয়ে ওঠে পরে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নির্বাচনী দলধ্বনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটির কংগ্রেসের এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের এই ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের মন। এই বিক্ষোভের পরবর্তী ধাপ হল রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা থেকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

১. বহুদিন পূর্বে বর্তমান লেখকের গৃহে একবার কয়েকজন বিপ্লবী নেতা সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন •ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), • প্রতুল গাঙ্গুলি, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ প্রভৃতি। কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিলেন, "বিপ্লবী জীবনে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণির গীতি-কবিতাগুলি আমাদের যে কি সাহস ও সান্ত্বনা জোগাইত তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। সারা দিন পুলিশের হাত এড়াইবার জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রান্তদেহে অবসন্ন মনে কোনো জলাশয় দেখিলে তাহার জলে তৃষ্ণা দূর করিয়া একাকী এই সব গান গাহিতে গাহিতে দেহের শ্রান্তি দূর করিয়াছি।"

বোমার মামলায় আলিপুর আদালতের কাঠগড়ায় বিপ্লবী আসামীগণকে সমবেত করা হইত। একদিন বিচারক আসার পূর্বে একটি তরুণ বন্দী সহসা রবীন্দ্রনাথের গান গাহিয়া উঠিল: সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। ..... আদালতের সমস্ত লোক স্তব্ধ হইয়া এই গানটি শুনিল। *(বাংলা দেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, রমেশচন্দ্র মজুমদার)*

২. ... আমি যখন 'স্বদেশি সমাজ' লিখেছিলুম তখন তৎকালীন কংগ্রেসওয়ালারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। বিদেশি গভর্মেন্টের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রফানিষ্পত্তির কাজকেই তাঁরা ভারতবাসীর মোক্ষসাধন বলে স্থির করেছিলেন। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেছিলেন বেন্থাম প্রভৃতি পণ্ডিতরা স্টেট্ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেছেন আমি অশিক্ষাবশত সেসব কিছুই জানিনে বলেই এমন কথা বলতে পেরেছি যে

প্রজারা নিজেদের শাসনশক্তি নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারে।... বহুকাল থেকে এ কথা বলতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি যে দেশের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে আমি কেবল বিদেশের সঙ্গে সখ্যস্থাপনের জন্যে ব্যস্ত। তারা জানে অথবা জেনেও জানে না যে বিদেশের জনসভায় বিদেশি সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যা বলে থাকি তা একেবারেই শ্রুতিসুখকর নয়। (৪ কার্তিক, ১৩৩৯, হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি, চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড)

৩. ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিংবা ভারতবর্ষ কোনোদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবে না এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজী বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাকব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা religiously wrong অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলি নে। আমি বলি স্বাধীনতা বাইরের কোনো একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না ; দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়।

২২ মাঘ ১৩২৮, কাদম্বিনী দেবীকে চিঠি, চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড

৪. তোরা প্রাণ খুলে বল বন্দেমাতরম্।
তোদের ঘুমের নেশা ভাঙ্গিয়ে দিলে
ক্ষুদিরামের একটি বম্। *(রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসে উল্লিখিত)*

৫. ... আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাইনি—যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেচে সেই 'আমার জন্মভূমি'তে আমরা মানুষ। (প্রথম চৌধুরীকে চিঠি, ২ ফাল্গুন ১৩২৪, চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড)

৬. ... জরুরি চিঠি জরুরি প্রবন্ধ সমস্ত ঠেলে রেখে মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিষ নয়—মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্বুদের মত উঠেচে আর ফেটে গেছে—কিন্তু যে গানগুলোকে দেখতে বুদ্বুদের মত তারা আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্তার খেলনাগুলিব সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেইজন্যেই যখন তারা গড়ে উঠতে থাকে তখন কর্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আস্চে যে, "সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর।" যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুশি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্তারা বলেন, "তিনি আবার কে? এক ত আছে বন্দে মাতরম্।" তাঁদের গড় করে আমাকে আজ বল্‌তে হচ্চে—'আমার বন্দেমাতরং ভুলিয়েচেন ঐ তিনি। আমি দেশছাড়া ঘরছাড়ার দলে। আমি ভুগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে। (১৮ কার্তিক, ১৩২৮, প্রমথ চৌধুরিকে চিঠি)

৭. "...অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ সেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে।—বন্দে মাতরম্।"

(১৩৩২ ফাল্গুন, ভাণ্ডার, স্বদেশিদের উপর পুলিশের অত্যাচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ)

বন্দে মাতরম্ কি সাম্প্রদায়িক সংগীত

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

না স্বীকার করে উপায় নেই, বাংলায় Nation শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে একটি প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করেছিলেন, অধিপতি.... তা যে প্রচলন হয়নি সে তো রবীন্দ্রনাথ জেনেই গিয়েছিলেন...

Nation শব্দটির অন্তরাকৃতির খোঁজে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, Nation শব্দটি একটি মানস পদার্থ...জাতি, ভাষা, বিষয়, স্বার্থ, ধর্ম, ঐক্য, ভৌগোলিক অবস্থান Nation নামক পদার্থটির কোনো উপকরণই নয়...রবীন্দ্রমানস নিজের মতন একটা ব্যাখ্যাতত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন, তা এই রকম...অতীত সর্বসাধারণের স্মৃতি সম্পদ, বীরত্ব, মহত্ত্ব কীর্তির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে National ভাবের গাঠনিকতা...ধ্রুপদী গৌরব ও কাল সময়ের সর্বসাধারণের একত্রিত কর্মধারা ও কর্ম সঙ্কল্প ন্যাশনাল ভাবের ভিতরের প্রকৃতি সত্তা, এই নিরীক্ষণে হয়ত বলা যায় ভারতবর্ষীয় সমাজে এই ভাব শর্ত নিয়ত রয়েছে বলেই ভারত একটি Nation...

Nation নিয়ে সব ঝুটঝামেলা মিটে যায় ইংরেজরা গায়ের জোরে ভারত দখল করার পর পশ্চিমী আলোকিকতা থেকে অনেক কিছুই নিয়েছে ভারত। এই Western Impact যে প্রধান দুটি ভাবুকতা দিলে তার একটা হল National Issue জাতি-প্রতিষ্ঠা, জাতীয়তাবোধ, অন্যটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ...আবার পরশতার বিপরীতার্থক তত্ত্ব থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধের এই জাতীয়তাবাদের জন্ম...

Minority Ruler ইংরেজদের চিন্তা ভাণ্ডার থেকে এই Concept নেওয়া যা ইংরেজ আসার আগে সাতশো বছর মুসলমান Minority Rule না এলে এই Concept দিতে পারেনি...নীরদ চৌধুরী বলতেন ইংরেজ না এলে আমরা মানুষ হতাম না। বঙ্কিম এই দুই বোধের Icon ইংরেজদের হাত থেকে নিলেও এই স্বাতন্ত্র্য ছিল ভারতমুখী, তা ইংরেজদের ভোগমুখী, নয় ত্যাগমুখী....এর থেকেই জন্ম নেয় সংযম, সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্যধর্মী জীবনাচরণ....সাধারণ জীবনযাপনের শুদ্ধতাবোধ...একে বলা যায় উনিশ শতকী স্বাতন্ত্র্যবোধ ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া এই National Concept, কোনো আধারে ন্যস্ত না হলে অর্থাৎ National Conceptটি জাতীয় ভাব হয়ে উঠতে চাইলে একটা Icon-এর অনিবার্যতা এসে পড়ে...ভারতে সেই Iconটি পাওয়া যায় একমাত্র ধর্মভাবের পরিকাঠামোয়...অন্য কোনো গাঠনিকতা নিতান্ত বাড়ন্ত...

মধ্যযুগের পুরাণকল্পগুলি ধর্মভাব অভিব্যক্তির লোকায়ত সাহিত্য... এর মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে সামাজিক অনুশাসন ও শক্তির উপকরণ... প্রতীকী বলাও বুঝি যথার্থ নয়... এগুলি না রূপক, না প্রতীকী..., না সাঙ্কেতিক কোনো কিছুই নয়। সারা মধ্য যুগ একটানা মুসলিম শাসনের অবসিত কাল অবধি যা কিছু সংস্কৃতির সঞ্চয় পদকাব্য, কৃষ্ণকাব্য, রাধাকাব্য, মঙ্গকাব্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে...

এই সব মঙ্গল সাহিত্যে ম্যাজিক, দেবকল্পনা, কিংবদন্তী, লোকায়াত সংস্কৃতি আধারে কল্পলোকবাসী দেবদেবীর-ই রাজ্যপাট...জাতি ভাবনা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এই কল্পপুরাণগুলি নইলে মান্যতার সীমায় পৌঁছয় না...

বিশেষ করে ভাব জগৎটি সেই সব Romantic কবি মনের ঐশ্বর্য...ভারতে এই প্রত্ন ঐশ্বর্যের অন্ত নেই...বেদসাহিত্যমালা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ সংহিতাগুলি এই সব কল্পলোকের প্রান্তর।

তাই Nation ধারণাটি অক্লেশে পুরাণের কল্পভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়...জাতি নির্মাণ প্রকল্পেও তাই এই পুরাণপ্রতিমাগুলি যুক্ত হয়ে পড়ে...

২

দুর্গা Graphics যে সমাজে কল্পরূপ পেয়েছিল সে সমাজ কবেই ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায় হয়ে গেছে...সে সমাজ আর নেই, প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাও শূন্য...কিন্তু রেখে গেছে এই Graphicsটা...এক সময় এই Graphics দেববংশভূতা ছিল...একালে উনিশ শতকে কবি-কল্পনার ডানায় এই Graphics বিচিত্ররূপিনী হতে থাকে...আর তার বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা হতে থাকে দেবতা প্রিয় হতে পারে, হতে পারে প্রিয় দেবতা...কোনো বিঘ্ন নেই এই রূপ থেকে রূপান্তরে যাওয়া আসায়, দেবতা মানবে এই মিলন সাধনের পালায় তত্ত্ব গড়ে ওঠে যেমন একটা তত্ত্ব, শুভ-অশুভের সংঘাত, দেবাসুরের যুদ্ধ কল্পনা এক সময়ে সামাজিক Milieu-তে ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়...যেমন বিনাশায়ত দুষ্কৃতার গীতায় তেমনি দুর্গা Graphics-এ সেই দুষ্কৃতি বিনাশে Motif ব্যঞ্জনা বেজে যায়...

বঙ্কিমে এসে এই দুর্গা Graphics-কে দেশানুরাগের ভরা প্লাবনের দিনে যা জাতীয়তাবাদ নয়, দেশকল্পনা মাতৃকল্পনায় স্বপ্ন জাগাতে থাকে... যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীই প্রধান, দুর্গা-কালী, সেই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রতিকল্প হয়ে ওঠে সহজেই...

বলার হেতুই থাকে না যে, কোনো দেশ, কোনো জাতির মধ্যে দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করায় নন্দনসুখ যদি থাকে, ভারতবর্ষ সেই দেশ...তাই ভারতমাতা অবন ঠাকুরের হাতে ছবি হয়ে ওঠে, অতুলপ্রসাদের 'ওঠ গো ভারতলক্ষ্মী', দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী' আর রবীন্দ্র নাথের 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা...' ইত্যাদি এমন অন্তহীন রূপময়তা

দেখা যাবে...এছাড়াও মাতৃসম্বোধনের মত মধুর সম্বোধন আর কী আছে জগতে....এই সম্বোধনই তো একটা সংস্কৃতি...

বঙ্কিমে এসে দেশকে 'মা' নামে ডাকার যে রোমাঞ্চ...এ এক আলঙ্কারিতা...এখানে দুর্গা Graphics দেবী নয়, ঈশ্বরী নন পুরাণকল্পিতা দেববংশোদ্ভুতা কেউ নয়...বঙ্কিমে এসে এই Graphics সৌন্দর্যালঙ্কার মানবায়িত প্রতিতুলনায় পৌঁছে যায়... দেশ এবং দুর্গা ভাবব্যঞ্জনায় নিজের নিজের শব্দার্থ হারিয়ে বিমিশ্রণে এসে Third Dimension-এ ভিন্ন অর্থময়তায় যা হয়ে দাঁড়ায় তা একটা Metaphor...শক্তি সৌন্দর্য দেশশক্তি দেশমাতার এই অভিধা ডুবে যায়। দশশক্তির অভিজ্ঞানে এই দেশশক্তির অভিব্যক্তি দুর্গা Graphics-এর মধ্যে যে যুদ্ধ ছবির তীব্র ব্যঞ্জনা অনুভবোরণিত হয়...বঙ্কিমের এই দেশবর এই Milieu-তে প্রকাশ সামর্থ্য অর্জন করেছে...এর মধ্যে ঈশ্বর-ঈশ্বরীর কোনো ভাবঅস্তিত্ব তো নেই-ই, বরঞ্চ ঈশ্বরবঞ্চিত...

বাইরের দুর্গোৎসব, দেবী বন্দনার সঙ্গে এ দূরত্ব অনেক যোজন...এ তো দুর্গোৎসবের দেবী নয়, দেশালঙ্কার Metaphor যা কোনো সমাজের উর্ধ্বে ...জাতি, ধর্ম বর্ণের উর্ধ্বে.......ধর্মভাবের অতীত এক প্রগাঢ় ধ্রুপদী সৌন্দর্যশক্তি...সৌন্দর্যরূপিণী দেশ আনন্দমঠে

ভবানন্দ গাইছেন :

বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্...

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন : মাতা কে?

ভবানন্দ গাইলেন :

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র বললেন :

এ ত, দেশ এ ত মা নয়...

ভবানন্দের গানও বলছে...এই দেশই সুখদাং বরদাং....ইনিই মা।

৩

অবিনির্মিত 'বন্দে মাতরম্', কালছায়া এক কালধ্বনি, দেশশক্তির উন্মোচনের সৌন্দর্যময় মহাজাগরণের গান...

ছাব্বিশ চরণের এই ধ্রুপদী সংগীতটির ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রাক্ষরে সংগীতটির প্রকাশের ১২৫ বছর পূর্ণ হল...বঙ্গদর্শনে এই গানটি মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে... ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে গানটি প্রথম রচিত হয়...১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ডিসেম্বরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে প্রকাশিত হয়...গানটি আনন্দমঠে Theme song হিসেবে স্থাপিত হয়।

এ সংগীতটির মর্মস্বর, রাজশক্তির বিপ্রতীপে দেশশক্তির উত্থান, পরিশেষে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল...

ভবানন্দ ও মহেন্দ্রর সংলাপে লক্ষিত আছে : মহেন্দ্র বলছে...রাষ্ট্রশক্তি দখল করবে কী করে?

ভবানন্দ বলল, মেরে...

মহেন্দ্র বলল,...একা...

ভবানন্দ : সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে

দ্বিসপ্তকোটি ভুজে ধৃতখরকরবালে

এরপরেই যা বললেন, ভবানন্দ, যেখানে বঙ্কিমের দেশ ও মা, মা ও দেশ সমার্থক হয়ে ওঠে... অবলা কেন মা এত বলে...

ভবানন্দ যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথা বলে, যা পরবশতার থেকে মুক্তির কথা বলে...জাতীয়তাবাদের রণধ্বনি বলি আমরা...

জাতীয়তাবাদ যদি সত্যি হয় অথবা সত্য বলে গ্রহণ করি, সত্য যদি হয় স্বাধীনতা কামনা, সত্য যদি হয় দেশমুক্তি তাহলে যে রণধ্বনি দিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিজাতিকে পরাধীনতার শেকল ভাঙার পণে ভাব ঐক্যে আনা সম্ভব, সেই ধ্বনি বা গীত বা Slogan-কে গ্রহণ করব না কেন? যদি এই গীতধ্বনি প্রেরণার গভীর বাণী হয়, তাহলে গ্রহণ করতে বাধা কোথায়? যদি এই বাণী জাতীয়তাবাদের ব্যঞ্জনাকে দেশমনে ঝঙ্কৃত প্রকাশসমর্থ ধ্বনি হয়ে উঠতে পারে...এবং দেশ যদি তা চায়, তবে সে তো আপনিই দেশধ্বনি হয়ে উঠবেই...

এখানেই সেই প্রশ্নটি তোলা যেতে পারে...জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণের প্রশ্নে তার অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল... রবীন্দ্রনাথ যেটুকুতে দেশ প্রকৃতি সৌন্দর্য ও মাধুর্যে প্রকাশমান, সেইটুকুই গ্রহণ করতে মতামত দিয়েছিলেন... প্রয়োজনের জন্যে

খণ্ডাংশটি যথার্থ...কিন্তু বন্দেমাতরমের সত্যার্থটি এই খণ্ডাংশে নেই...ভবানন্দের দেশভাবনা মাতৃভাবনা সমার্থক হয়ে যখন জাতীয়তাবাদের রণধ্বনি হয়ে ওঠে...অধিজাতিক মুক্তিগীতিহয়ে ওঠে এই মর্মধ্বনি অনুপস্থিত থাকলে...বন্দেমাতরমের সার্থকতাই ফুরিয়ে যায়...জাতির গান হয়ে উঠতেও ব্যর্থই হয়...

সম্ভবতঃ 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সমগ্রটি যে আলঙ্কারিকতার বাঁধনে প্রগাঢ় ঐশ্বর্যময় সেইখানেই বাঁধা...আর সেইখানেই বঙ্কিমমানসের এবং বন্দেমাতরমের সত্য...

৪

প্রশ্ন : 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি কী Secular ? একশো পঁচিশ বছরেরও এই প্রশ্ন চিরঅমীমাংসিত রয়েই গেছে...কেন না ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুর নয়...বহু ধর্ম, জাত ও বর্ণের দেশ ভারতবর্ষ...সমগ্র সংগীতটিকে গ্রহণের পক্ষে বাধা এখানেই... 'বন্দে মাতরম্' হিন্দু গীতি 'বন্দে মাতরম্' সাম্প্রদায়িক গীতি

এখানেই প্রশ্ন তোলা যায় : 'বন্দে মাতরম'-এর Motif কী?

১ 'বন্দে মাতরম্' সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত কী?

২ সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ নিয়ে রচিত কী...?

৩ জাতি বিদ্বেষ, জাতিগত ঘৃণা, বৈরিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত কী?

৪ কোনো সম্প্রদায় বিশেষকে পরোক্ষে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কিংবা তাচ্ছিল্যভরে লেখা কী?

৫ জাতিসংঘর্ষ সৃষ্টির লক্ষ্যে রচিত কী?

৬ হিন্দুত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত কী?

বঙ্কিম নিজে 'বাঙলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'-এ লিখেছেন ঃ

'যাহা অসত্য, ধর্ম বিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন ও স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনো হিতকর হইতে পারে না সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য।'

রাজসিংহ উপন্যাসের উপসংহার-এ লিখেছেন বঙ্কিম, 'কোনো পাঠক না মনে করেন হিন্দু মুসলমানের কোনোপ্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।' এই বঙ্কিমই বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী*-তে আয়েষার মুখে বলিয়েছেন 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।'

সুতরাং প্রশ্নই ওঠে না বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ প্রসঙ্গে বহু উদাহরণ বঙ্কিম সাহিত্য থেকেই দেওয়া যায়...তার অভাব হবে না...

তবে কেন আনলেন বঙ্কিম, দেশের জাতিবিন্যাস, বর্ণবিন্যাস, ধর্মবিন্যাস, আচার-সংস্কারবিন্যাস জানা সত্ত্বেও দুর্গা Graphics-কে।

বঙ্কিমের হিন্দু উৎস...বঙ্কিম বাঙালি বাংলা ও বাংলা ভাষা বঙ্কিমের দ্বিতীয় উৎস

বঙ্কিমের ছিল আপন ধর্মবিশ্বাস... সেই সঙ্গে ছিল জাতীয়তাবাদের এই সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল ইংরেজের সোনার শেকলে বাঁধা বঙ্কিমের ডেপুটি অলঙ্কার, বরাবর যার প্রতি বঙ্কিমের ছিল তীব্র ধিক্কার যা ছিল দেশানুরাগের আঁতুড় ঘর... সংঘাত প্রবৃত্তি...এই সংঘাত-ভাব রূপ পেতে চাইছিল...এই যুদ্ধ প্রবৃত্তি শেষে হয়ে ওঠে সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে দ্বিসপ্তকোটি ভূজৈর্ধৃত খর করবাল...হয়ে ওঠে বহু বল ধারিণীম, ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী... মেলানো মেশানো দেশশক্তি মাতৃশক্তির আধারে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি' এই অপরূপরূপে বাহির হলে 'জননী দেখে দেখে আঁখি না ফেরে' কিংবা 'ডান হাতে তোর খড়গ ঝলে...ললাট নেত্র আগুন বরণ' ইত্যাদি এ সকলের হৃদয় উৎস তো একটাই...পুরাণ-প্রতিমার শক্তি সৌন্দর্য রূপিনী এই Icon ছাড়া এই যুদ্ধ ধ্বনি এর চেয়ে আর কোনো অপরূপে প্রকাশ সম্ভব ছিল...?

এই সর্বভাব পূর্ণকরা শব্দবদ্ধ 'বন্দে মাতরম্' আর কী কোনো আধারে প্রকাশ সম্ভব ছিল...এই যে সাহিত্যিক স্বপ্নময় ভাবময় রূপময় প্রত্নপ্রতীক-এর বিকল্প আর তো কোথাও দেখিনি...বহুজাতি বহুবর্ণ ধর্মধারিণী এই ভারতে আছে কী কোথাও এমন দেশশক্তি সৌন্দর্যের উন্মোচন।

তাই বাঙলার পটে বিধৃত এই সমরঋদ্ধ ছবি সপ্তকোটির মধ্যেই মিলিয়ে নিয়েছেন বঙ্কিম। হিন্দু, মুসলিম, পারসিক বৌদ্ধ, জৈন ক্রীশ্চান ও সর্বজাতিবর্ণধর্মের মানুষ বাঙালীকে...

বঙ্কিমের দুর্গা structurality-র মধ্যে চিরজাগরুক সমরস্মৃতি জেগে থাকে যা শক্তির আহ্বান....এমন অনন্তমুখী কল্পকলা আর কী কবে পেরেছে দিতে এই আর্যাবর্তে দক্ষিণাবর্তে।

দেশ শাসনের রুদ্রতারা পাশে নিঃস্বরিক্ত দলিত দুর্গতদেশ দেশভালোবাসায় উদ্দীপনী ভাবকেই তীক্ষ্ণ জাতীয়বাদী তীব্র চেতনা প্রকাশ করতে গিয়েই এই পৌরাণিক অভিকর্ষ থেকে কোনো কবিসাহিত্যিক কেউ-ই দূরে যেতে পারেননি...গ্রীসেও পুরাণ প্রকল্প দিয়ে সমাজ দেশ ধর্ম নীতি নির্ধারণ করতে দেখি....তাদের ইলিয়ড ওডিসি-তে যেমন দিয়েছিল ভারতে রামায়ণ, মহাভারত ও প্রত্নপুরাণগুলি।

৫

'বন্দে মাতরম্' বঙ্কিমের কোনো এক প্রগাঢ় মুহূর্তের রচনা...প্রগাঢ় অনুভব ও Imagery গানটিতে ধ্বনিত হয়েছে...মহাভারতের খিল হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব ২য় অধ্যায়ে আর্যস্তবের ছায়া আছে তবু 'বন্দে মাতরম্' গীতটি কখনোই নয় কোনো ঈশ্বরস্তব ....

নয় কোনো সম্প্রদায়ের দেবদেবীর ধ্যানের মন্ত্র...নয় কোনো জাতি-সংকীর্ণতার শীর্ণ দেশাত্মগীতি...এ গান কোনো শাস্ত্রীয় সংগীতও নয়, এ গান সময়হারানো কোনো এক কালের পানে ছুটে চলা সৌন্দর্যরূপিণী শক্তিময়ী দেশবন্দনবাণী, এ গান হিন্দু মনের উচ্ছ্বাস নয়, চিরকালের শক্তিসৌন্দর্যের কাব্য...সার্বভৌম শক্তিগীতি...এ গান শুধু বাঙালির নয়, সর্বমানবজাতির গান...বিশ্বায়ত গান...এই সুন্দরময় গীতিময়তার মধ্যে জেগে আছে সত্যবোধ, মূল্যচেতনা, এক অনন্যপূর্ব সত্তায় পুনর্রণন...

এই গান জাগিয়ে রাখে ধ্রুপদী প্রশান্তি, যখন ধ্বনিত হয়...'অমলাং অতুলাং'...কিংবা 'সরলাং, সুস্মিতাং ধরণীম ভরণীম...তখন তো বিশ্বলোকের সাড়া পাই প্রচ্ছন্ন বৈভব, শক্তি, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য নান্দনিক স্বাচ্ছন্দ্যে দীপ্ত ধরনীম ভরণীম, বিশ্বদার্শনিকতা প্রসারিত এই গান যে থেমে নিয়ে যেতে চায়, সেখানে কোনো ঈশ্বর-ঈশ্বরী পৌঁছতে পারেন না...মানবের অন্তর্লীন সত্তার সৌন্দর্যের অভিব্যক্তির ঘনঘন বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে...সৌন্দর্যের রহস্যে উন্মোচিত হতে থাকে অপরূপা অরূপ...শেষ পর্যন্ত এই দুর্গা 'মিথ', মিথকেই অতিক্রম করে যায়...

এই গীতি-প্রতর্ক আজও শেষ হয়নি...তখনি অনুভব করা যায়...এই গানের আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের শক্তি কত।

এই গীতিবন্দনা তার নিজের কাল পেরিয়ে এমন একটি অনন্তবিধৃত নির্মিতি যা নির্মাণকারী বঙ্কিমচন্দ্রকেও বহুদূর পিছনে ফেলে, অলখকালের দিকে ছুটে চলেছে...

নমামি ত্বাং...

বন্দে মাতরম্

জ্যোতিভূষণ চাকী

আমাদের জাতীয় জীবনে 'বন্দে মাতরম্' গানটি মন্ত্র-গানের মতোই। দেশকে মা বলে কল্পনার উৎস কী?—এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের অথর্ব বেদ-এ যেতে হবে যেখানে একটি মন্ত্রে আছে। মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মাতৃমন্ত্রের জন্যে অথর্ব বেদ-এর এই সূক্তের কাছে ঋণী নাও হতে পারেন। এটা তাঁর অন্তর থেকে স্বতউৎসারিতও হতে পারে। 'বন্দে মাতরম্' গানটি সংস্কৃত বাংলা মিশিয়ে লেখা। প্রথম যখন বঙ্কিমচন্দ্র এ-গানটি লেখেন তখন অনেকেই এই মিশ্রণ পছন্দ করেননি। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এক কন্যাও ছিলেন। পরে ঠিক কখন এই গানটি আনন্দমঠ উপন্যাসে স্থান পেয়েছিল তা নিয়েও মতান্তর আছে। তবে অধিকাংশ গবেষকেরই মত, ১৮৭২ থেকে '৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি তিনি রচনা করেন। প্রথমে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে যে কাহিনিটি প্রচলিত তা হল এই—*বঙ্গদর্শন*-এর এক পৃষ্ঠা ম্যাটার কম পড়ে যাওয়ায় তার তত্ত্বাবধায়ক বঙ্কিমের কাছে স্থানপূরণের জন্যে একটি লেখা চান। বঙ্কিমচন্দ্র তার কিছুক্ষণ আগেই এই গানটি টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় লেখাটির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই তা পড়ে ফেলেন এবং মন্তব্য করেন—এ লেখাটি দিব্যি চলবে। বঙ্কিমচন্দ্র লেখাটি নিয়ে ড্রয়ারে রাখেন এবং তাঁকে বলেন, এ লেখার মূল এখন বুঝবে না, একদিন এই গানটিই দেশকে মাতিয়ে তুলবে। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এই ভাষাতেই কথাটি বলেছিলেন এমন নয়, তবে তার তাৎপর্য এই। এই কাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিম-গবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর একটি রচনায় বলেন, এক পৃষ্ঠা ম্যাটার কম পড়ে যাওয়ার কাহিনি ভিত্তিহীন। প্রতিটি সংখ্যা বিশ্লেষণে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন। অমিত্রসূদন আনন্দবাজার পত্রিকায় পরবর্তী লেখায় গুরুতর একটি প্রশ্ন তোলেন। 'বন্দে মাতরম্' কী বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা? (আ. বা. পত্রিকা ৭-১১-০৬)। 'বন্দে মাতরম্' গানটির সংস্কৃতে লেখা প্রথম বারোটি চরণ উদ্ধৃতিচিহ্নবদ্ধ, বাকি ষোলোটি চরণ বাংলা-সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষায় রচিত। অমিত্রসূদন এই উদ্ধৃতিচিহ্নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, গানটি আদৌ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরচিত কী না। আনন্দবাজারে লেখা একটি চিঠিতে (অগ্রহায়ণ ৭, ১৪১৩) দীনেশচন্দ্র সিংহ উদ্ধৃতিচিহ্ন দেখেই যে স্বরচিত বলা যাবে না, এ মতের সমর্থনে বলেন, 'উদ্ধৃতিচিহ্ন যদি স্বকীয় বা পরকীয় রচনা চেনার একমাত্র মাপকাঠি হয়, তা হলে অপরের রচিত আরও অনেক গান-কবিতা বঙ্কিম নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন

বলা যায়। *দুর্গেশনন্দিনী*-তে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের গান, কপালকুণ্ডলায় শ্যামাসুন্দরীর কবিতা, মৃণালিনীতে গিরিজায়ার গান, বিষবৃক্ষে লম্পট দেবেন্দ্রের গান, সবই উদ্ধৃতিচিহ্নবদ্ধ। পত্রকার কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য তাঁর চিঠিতে (৬ অগ্রহায়ণ) অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মত উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গানটির প্রথম অংশ যা *আনন্দমঠ* উপন্যাস-নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্রভাবে রচিত। এবং তা ১৮৭২ থেকে '৭৫-এর মধ্যে কোনো একসময়ে রচিত হয়েছে, পরে উপন্যাসে পরবর্তী অংশ যুক্ত হয়েছে। আদি অংশটিতে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত। ৭ অগ্রহায়ণ, অর্থাৎ পরের দিনই নির্মলকুমার দাস প্রশ্ন তুলেছেন যে এটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা কী না ; 'ভূদেবভবন'-এর গঙ্গার ঘাটের প্রশস্ত চাতালে সে সময় সান্ধ্য আসর বসত, সেখানে নদীর ওপারের নৈহাটি-ভাটপাড়া এলাকার অনেকে নৌকো করে আসতেন। বঙ্কিমও আসতেন। সম্ভবত ওই সময়েই বঙ্কিম ভূদেবের কাছ থেকে গানের একটি প্রতিলিপি পান, পরে আরও কয়েকটি চরণ যোগ করে প্রকাশ করেন। এই তথ্যের ওপর নির্ভর করলে বোঝা যায় 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম বারো চরণ ভূদেবের লেখা।" দেখা যাচ্ছে, জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই গানটির রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা মত ও মতান্তরের গোলকধাঁধায় পড়েছি। তবে, ৬ অগ্রহায়ণে লেখা পার্থসারথি রায়ের মতটিকে আমরা আপাতত সমর্থনযোগ্য বলে মনে করছি :

> 'বন্দে মাতরম্' গানে বঙ্কিমচন্দ্র যে দেশপ্রেমের বাণী শুনিয়েছেন তার বীজ নিহিত ছিল তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যে।

আনন্দমঠ প্রথম ছাপা হয়েছিল জন্‌সন প্রেস থেকে, মুদ্রক হিসেবে ছিলেন রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্দে মাতরম্ : একটি ইঙ্গিত

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। এই যুগেই ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়, পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উদগাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বাঙালিকে জীবনমন্ত্রে দীক্ষাদাতা স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ, অনন্য জননায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন তাঁর অতুলনীয় মাতৃবন্দনা 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত উনবিংশ শতাব্দীর সপ্ত দশকের মধ্যভাগে। শুধু সঙ্গীত নয় 'বন্দে মাতরম্' সারা ভারতের পুনরভ্যুত্থানের সন্দীপন মন্ত্র। রচনার প্রায় একবিংশতি বৎসরান্তে ১৮৯৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় দ্বাদশ অধিবেশনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই 'বন্দে মাতরম্' উদ্বোধন সংগীত রূপে সুললিত কণ্ঠে পরিবেশন করে উপস্থিত জননায়কদের মুগ্ধ করেন ও দেশমাতৃকার বন্দনায় উৎসাহিত করেন।

তারও আগে ১৮৮৩ সনে আগস্ট মাসে কলিকাতায় তিনদিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে 'বন্দে মাতরম্' আহ্বান সঙ্গীত রূপে গীত হয়। মনে রাখতে হবে যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' প্রকাশিত হয় তার মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে।

এই 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সংগ্রামী ভারতে চলেছিল অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ। ভারতসন্তান 'বন্দে মাতরম্' বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে একদিন ফাঁসীর মঞ্চে আরোহন করে দেশমাতৃকার বেদীমূলে হাসিমুখে আত্ম-বলিদান দিয়েছে। অজস্র বন্ধন মাঝে দেশকে, জাতিকে, মানুষকে পরিপূর্ণ সজ্জায় সাজিয়েছে এই মন্ত্রধ্বনি। আর সেই মহাধ্বনি ভারতের আকাশে বাতাসে তুলেছে এক অভিনব সুরের মূর্চ্ছনা। সেই মহামন্ত্র, সেই মহাধ্বনি যে শুনেছে কানে সেই হয়েছে সংগ্রামের সাথী—মনোমুকুরে পেয়েছে নব জীবনের স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ, মর্মে মর্মে অনুভব করেছে এক অদ্ভুত অনুরণন। ১৯০৮ সালে বরিশাল সহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মিলনেই শুরু হ'ল ম্যাজিস্ট্রেট ফুলার সাহেবের নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র সঙ্গীতের জয়যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ, সেই সঙ্গে সংগ্রামী বাঙালি জাতির ভারতের রণক্ষেত্রে প্রথম দর্পভরে পদচারণা, কে এ কাহিনীকে অস্বীকার করতে পারে?

নেপোলিয়ন পরবর্ত্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগই ইউরোপের বিচ্ছিন্ন ও

বিক্ষিপ্ত রাষ্ট্রগুলিতে স্বাভাবিক, ভৌগলিক, প্রাকৃতিক ও ভাষাভিত্তিক কারণে এক নূতন ধরনের জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়। তারই চেতনাবোধের তরঙ্গ ভারতের সুমুদ্রসৈকতে আছড়ে পড়লো, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী একদল ভারতীয় সেই চেতনাকে সাদরে বরণ করে নিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। অগ্রগামীদের মধ্যে ছিলেন হিন্দুকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মনীষী রাজ নারায়ণ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ; অবশ্য এর পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

এরূপ জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সরকারি কাজে নিযুক্ত থাকলেও প্রায়ই কলিকাতা সহরে যাতায়াত করতেন এবং রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষী-সংস্পর্শে এসে জাতীয়তাভাবে উদ্বুদ্ধ হন। সে সময়ে এই সহরে হিন্দুমেলা বা স্বদেশি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই *নবজাগরণ*-এর সূত্রপাত। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় লোকশিক্ষার খানিকটা প্রসার ঘটলেও জাতীয় শিক্ষাবোধ ছিল অনেক পিছিয়ে। জাতীয় বীজমন্ত্র উচ্চারণে দীক্ষালাভ করেনি ভারতবাসী।

তাইত ১৯০৪ সনে এই কলিকাতা সহরেই অনুষ্ঠিত হ'ল 'শিবাজী উৎসব' শুধু পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের নিয়ে নয় জাতি-ধর্মনির্বিশেষে যারা ভারতকে একই জাতীয়তাবোধ মন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এক সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করলেন। প্রসঙ্গত :

> আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
> দক্ষিণে ও বামে
> একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
> এক পুণ্য নামে।।

কেননা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও মারাঠাবীর শিবাজীর প্রথম ও প্রধান ভাবনা ছিল 'এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেধে দিব আমি'।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙাল জাতি হিসাবে তারা সর্ব্বস্ব পণ করে লড়েছিল। যে সকল মহান দেশনেতা সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আনন্দ মোহন বসু এবং আরও অনেকে, আন্দোলনে একটি মাত্র বীজমন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম'। আর সেই মন্ত্র উচ্চারণের সার্থকতা ছিল একমাত্র তাঁদেরই যাঁরা এই পুণ্য স্বদেশভূমিকে মাতৃস্বরূপিনী জ্ঞান করে মাতৃপূজায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতে স্বদেশজননীকে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর সম্মুখে মাতৃপূজার অর্ঘ্যস্বরূপ স্বীয় মন-প্রাণ ও জীবনকে তুচ্ছ করে মনে সর্ব্বস্ব নিবেদন করেছিলেন।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের অলৌকিক শক্তি দর্শন করে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, The

whole people had been converted into the Religion of Patriotism. এই ত ঋষি বাক্য।

সেকালেই শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ করেন 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা। সম্পাদক বিপিন চন্দ্র পাল প্রচার করেন ভারতের জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য :

> Blessed is the life of the individual. Blessed that larger and diviner life the Nation wherein the individual finds its highest fulfilment, and blessed, thrice blessed, is that universal life of Humamity wherein is the fulfilment and fruition of all national life and aspirations
>
> Bande Mataram *16 October 1906*

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন বাংলার স্বদেশি আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে:

> The *Anand Math* which contained the ymn '*Bande Mataram* re-acted strongly in the minds of Bengali youths, fired with Patriotism. and awakened National sentiments and imbued with the spiritual teachings of Swami Vivekananda who had asked them to shed fear, gather strength and energy, serve the cause of the country and make supreme sacrifices for it.. and no matter whether it involves suffering or even destruction of the body.

'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ শুধু একটি শ্লোগান দেওয়া নয় বা সাধারণ মানুষের ভাব উচ্ছ্বাসও নয়। ইহার যে অতুলনীয় শক্তি, যে অভাবনীয় ভাবনা ও চেতনা, যে অনমনীয় দৃঢ়তা হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল—সারা মনে যে দ্যোতনা তুলেছিল, শরীরে যে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিল—আজও কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। এ প্রশ্ন শুধু আপনার আমার নয়—এ প্রশ্ন বোধ হয় সকল স্বদেশপ্রেমিকের—সকল দেশভক্তের।

স্বদেশমন্ত্রের গান : বন্দে মাতরম্

মণীন্দ্রনাথ আশ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত *দুর্গেশনন্দিনী* ১৮৬৫ সালে ও ১৮৮২, ১৫ আগস্ট *আনন্দমঠ* উপন্যাসের প্রকাশ কাল। তখনও জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়নি, অর্থাৎ *আনন্দমঠ*-এর প্রকাশের ৩ বছর পর ১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৭৫ সালে হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র সুমধুর সরল বাংলা-সংস্কৃত ভাষায় 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি রচনা করেন। ১৮৯৬-এ কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অভিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গানের প্রথম ৭ পঙ্‌ক্তি গেয়ে শোনান। আবার *আনন্দমঠ*-এর মুলমন্ত্র ছিল এই 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি। উপন্যাসের নারী চরিত্রটি সেখানে অসহায় অবলা নয়—শক্তিময়ী। আবার *আনন্দমঠ*-কে নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায় একসময়। এর বিষয়বস্তুতে হিন্দুত্ববাদের প্রচার ও ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দকে নিয়েও আপত্তি। তাদের প্রশ্ন—একেশ্বরবাদী অন্য সম্প্রদায়ের যুবকরা কি করে এই মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করবে? সেজন্য অনেক পণ্ডিত গবেষক বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে একথা ঠিক যে আপামর জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত না করতে পারলেও, দেশের বৃহৎ অংশকে এই ধ্বনিটি যে উদ্বেলিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং বিরুদ্ধবাদীদের চেয়ে সমর্থনকারীদের সংখ্যাই বেশি। এবং সম্প্রতি দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম বিরোধিতার প্রেক্ষাপট' নামে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, উৎসাহী পাঠক তা থেকে অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

আসলে এখানে জগদ্ধাত্রী বা দুর্গামূর্তি একটি প্রতীকমাত্র-জন্মভূমি-দেশমাতৃকার বন্দনাই এর প্রাণস্বরূপ। সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলছেন :

> যে মানুষ জননী ও জন্মভূমিকে প্রণাম না করে, ভক্তি না করে অথবা প্রণতি ও ভক্তির পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে, সে অকৃতজ্ঞ, অমানুষ—সে নরাধম। বুদ্ধিনাশ না হইলে কাহারও এহেন দুর্মতি ঘটে না। সে নরাধম। বুদ্ধিনাশ না হইলে কাহারও এহেন দুর্মতি ঘটে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে যুগমানব বাঙালিকে আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, মৃত্যুপথযাত্রীকে অমৃতের সন্ধান দিয়েছিলেন, যিনি জননীকে বিশ্বজননী মূর্তিতে এবং বিশ্বজননীকে

জন্মভূমির বিগ্রহে প্রত্যক্ষ করে তার সহিত বাঙালির প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হেতু হয়েছিলেন, তিনি 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রের উদগাতা আচার্য বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্কিমের স্বদেশ প্রীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। *আনন্দমঠ*-এর সন্তানদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হলেন জননী জন্মভূমি। *আনন্দমঠ*-এর মহেন্দ্র যে দেবীমূর্তি ত্রয় দর্শন করেছেন তা জন্মভূমির ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্পিত বাক্‌প্রতিমা। 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের মা এই দেশমাতা ভিন্ন আর কিছু নয়। তাই বিস্মিত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছেন—'মাতা কে?' ভবানন্দ 'বন্দে মাতরম্'-এর অংশ বিশেষ গেয়ে উঠেছেন। মহেন্দ্র বললেন,—'এত দেশ এত মা নয়' ভবানন্দ বুঝিয়ে বললেন, '-আমরা অন্য মা জানি না...। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী...।' 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিটি মন্ত্রের মতো কাজ করেছে। আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে, উৎসাহিত করেছে। দিয়েছে নিষ্ঠা, করেছে নির্ভীক। সমস্ত দেশবাসীকে নিয়ে মানবসমাজের যে ঐক্যবোধ তাই হল জাতীয় বোধ। 'বন্দে মাতরম্'-এর আগে আমাদের স্বদেশ প্রীতি ছিল। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও ছিল, কিন্তু প্রতিটি দেশবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে, রাষ্ট্র ধর্ম, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির সুদৃঢ় বন্ধনের একটি 'একক' যেন ঠিক সেইভাবে গড়ে ওঠেনি। ঋষি অরবিন্দও দেশকে মা বলেছেন—'Mother Inida is not a piece of earth, she is power, a god head.' বহু ভাষাবিদ অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ঋষি অরবিন্দকৃত 'বন্দে মাতরম্'-এর ইংরেজি অনুবাদের অংশবিশেষ :

> BANDE MATARAM—I bow to thee, Mother,/Richly watered, richly fruted/cool with winds of the south/Dark with the crops of the her vests/the Mother

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি আজও প্রাসঙ্গিক। এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। একটি সংবাদে [আলিপুর বার্তা ২৬ পৌষ-৩ মাঘ ১৪০৯] জানা যায় যে, 'বন্দে মাতরম্' বিশ্বের দ্বিতীয় জনপ্রিয় সঙ্গীত। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং সার্ভিসেসের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ই-মেল গৃহীত ভোটে এই তথ্য জানা যায়। যদিও বর্তমানে এটি স্লোগান হিসাবে আকছার ব্যবহার করে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা যেন এই ধ্বনিটির যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারি।

ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস

ক্ষীরোদকুমার দত্ত

প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই পতাকার প্রয়োজন। পতাকার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী মৃত্যুবরণ করেছেন। এ-যে একপ্রকার মূর্তিপূজা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ মূর্তিপূজা লোপ করা মহাপাপ। পতাকা এক আদর্শের প্রতিমূর্তি। ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলনে ইংরেজের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয় তা অবর্ণনীয়। তারা এবং ধারাযুক্ত মার্কিন পতাকা মার্কিন দেশবাসীর নিকট অমূল্য নিধি। তারা এবং অর্ধচন্দ্রযুক্ত ইসলামের পতাকা তার বীরত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমাদের ভারতবাসী—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি এবং পার্সি প্রভৃতি সকল অধিবাসী, ভারত যাদের মাতৃভূমি তাদের একটি পতাকা স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন—'যে পতাকা নিয়ে তারা বেঁচে থাকবে এবং যে পতাকার জন্য তারা মরবে।' মহাত্মা গান্ধি।

আমাদের জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত অশোকচক্র লাঞ্ছিত পতাকার উদ্ভবের পশ্চাতে একটা চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রয়েছে। এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আজ কোটি কোটি ভারতবাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং জাতীয় চেতনার প্রতীক এবং অতীতে পরাধীন ভারতে এ পতাকা আমাদের জাতীয় জাগরণে উদ্‌বুদ্ধ করত, আমাদের আত্মবলি দানে উদ্‌বুদ্ধ করত। এ পতাকা আমাদের সেদিনের জাতীয় সংগ্রামের আত্মবলিদানের স্মারক। এই পতাকা লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের সাধনার প্রতীক, জহরলালজির কথায় যাঁরা সেদিন ছিলেন জাতীয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্য কৃতসংকল্প, এই পতাকাই তাঁদের মৃত্যুর পথে অগ্রসর হবার পথ প্রদর্শন করেছে।

আমাদের গর্ব ও আনন্দের বিষয় এই জাতীয় পতাকার স্মৃতি আমরা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে বহন করে আসছি। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কারের অন্ধকার ভেদ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার উদয়ালোকে তিনিই প্রথমে দেশকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। তিনিই প্রথমে জাতীয় জীবনকে মুক্তির পথে অগ্রসর হবার পথ দেখিয়েছিলেন।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারত পরাধীনতার বেড়িতে শৃঙ্খলিত হবার সূচনা হয়। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে আমাদের মিলনের সূত্রপাত এখানেই। পলাশির যুদ্ধের মাত্র ১৭ বৎসর পরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে

রাজা রামমোহনের জন্ম আর এর মাত্র ১৫ বৎসর পরে পশ্চিম জগতে ফরাসি বিপ্লব জগতের চিন্তার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে দিল। মানুষ এই প্রথম দিন শুনল—'জগতে রাজা-প্রজার পার্থক্য নাই, মানুষে মানুষে পার্থক্য নাই। জগতে সব মানুষই সমান, সব মানুষই ভাই-ভাই, সব মানুষই স্বাধীন।' পাশ্চাত্য জগতের সে স্বাধীনতার বাতাস প্রাচ্য জগতকেও আন্দোলিত করতে লাগল। সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে পড়তে লাগল সর্বত্র। সমগ্র জগতে বইতে লাগল মুক্তির বাতাস। পরাধীনতার বিরুদ্ধে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল সবার অন্তরে। ওই আগুন কোথাও ছিল প্রকাশ্য বিদ্রোহরূপে, কোথাও ছিল জাতির অবচেতনায়। সাম্য, মৈত্রী, এবং স্বাধীনতার ধ্বনি নিয়ে ফরাসি বিপ্লবের বিদ্রোহের আগুন ক্রমে পরিব্যপ্ত হল সমগ্র জগতে। সমগ্র চিন্তা জগতকে অধিকার করে ফেলল এ-বাণী। ফরাসি প্রজাতন্ত্র গভর্নমেন্ট সমগ্র জগতের জনগণের সরকার বলে পরিগণিত হল। সমগ্র জগতের নিপীড়িত লাঞ্ছিত জনতা একে আপনাদের মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করল।

এই মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ ভারতের তটভূমি অতিক্রম করে আন্দোলন তুলল ভারতের বুকেও। এ আন্দোলনে সাড়া দিতে রামমোহন রায়ের অন্তর দ্বিধা করল না। কিশোর রামমোহন ক্রমে এই ভাবধারার মধ্য দিয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন। ফরাসি প্রজাতন্ত্রের তেরঙ্গ ঝান্ডা ক্রমে সমগ্র জগতের মতো রামমোহন এবং তার বন্ধুদের নিকটও সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা বলে বরণীয় হয়ে উঠল। ফরাসি বিপ্লবের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা এইভাবে প্রবর্তিত হল ভারতের বুকে। রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলার এক শ্রেণির যুবক বহুদিন পর্যন্ত এই পতাকাকে অগ্রগামী জগতের পতাকা বলে স্মরণ করে আসছিলেন। কলকাতার মনুমেন্টের পাদদেশে প্রতি বৎসর 'বাস্তিল' দিবস বা 'ফরাসি বিপ্লব দিবস' উদ্‌যাপিত হত। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পরেও তার বন্ধুরা নিয়মিতভাবে এই দিবস উদ্‌যাপন করতেন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকেই এর ওপর ফরাসি পতাকার প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রাম যতই প্রবল আকার ধারণ করতে লাগল, পতাকার অভাব ততই অনুভূত হতে লাগল। সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ কিছু পরিবর্তিত আকারে ফরাসি পতাকাকে এর জন্য গ্রহণ করার প্রয়োজন প্রথমেই অনুভব করলেন।

১৯০২ সালের মার্চ মাসের দোলপূর্ণিমার দিনে কলকাতায় বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সমিতি ঢাকাতে সম্প্রসারিত হল এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সুযোগে ঢাকাতে সম্প্রসারিত হল এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সুযোগে অল্পদিনের মধ্যেই সমিতি সমগ্র পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। বিপ্লবী সমিতিরও একটা পতাকার প্রয়োজন দেখা দিল। ভারতীয় জাতীয় পতাকার কী নমুনা হবে এ নিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যেও নানা আলোচনা চলতে লাগল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো বোমা তৈরি শেখবার জন্য ফরাসি দেশে

মাডাম কামার কাছে যান। ওই সময় বাংলার বিপ্লবীদের পতাকার এক নমুনা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান।

হেমচন্দ্রের ফরাসি দেশে অবস্থানকালে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট জার্মানির স্টাটগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনৈক রুশ বৈপ্লবিকের মাধ্যমে ইউরোপের ভারতীয় বিপ্লবীরাও সম্মেলনে আমন্ত্রিত হলেন। স্থির হয় যে, মাডাম কামা এবং এবং সর্দার সিং রাণা ভারতের পক্ষে সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং ভারতীয় পতাকা সম্মেলনে উত্তোলন করা হবে। ফ্রান্সে ভারতীয় বিপ্লবী মহলে এজন্য বক্তৃতা তৈরি এবং পতাকা প্রস্তুতের হিড়িক পড়ে গেল। বিশেষ করে হেমচন্দ্র, সাভারকার এবং মাডাম কামা এই পতাকা প্রস্তুতের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের কয়েকদিন আগে মাডাম কামা, সর্দার সিং রানা এবং তাদের সহকর্মীরূপে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্টাটগার্টশহরে উপস্থিত হলেন। সম্মেলনে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রীদলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রামজে ম্যাকডোনাল্ড। ভারতীয় বিপ্লবীগণ যাতে সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে গৃহীত না হন তিনি সেজন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও ফরাসি সমাজতন্ত্রী নায়ক অধ্যাপক জয় রে, জার্মানির কার্ল লিবনেক্ট এবং মাডাম কামার বন্ধু রোজা লুক্সেমবার্গ এবং ব্রিটিশ মনীষী হাইন্ডম্যান প্রভৃতির চেষ্টায় ভারতীয় বিপ্লবীগণ সম্মেলনে পূর্ণ প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হলেন। পতাকা অভিবাদন করে মাডাম কামা কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন :

> That the continuance of British rule in India is positively disastrous and extremely injurious to the best interest of India, and lovers of freedom of all over the world ought to co-operate in freeing from slavery the fifth of the whole human race inhabiting that oppressed country, since the perfect social state demands that no people should be subject to any despotic ot tyrannical form of Government.

প্রস্তাবের সমর্থনে মাডাম কামা এক উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতায় সভামণ্ডপকে মুগ্ধ করলেন। ঘন-ঘন করতালির ধ্বনিতে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হল। প্রস্তাবটি যথাসময়ে কংগ্রেসের নথিভুক্ত হয়নি, এজন্য এ প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হল না। কিন্তু উপস্থিত সদস্যগণ প্রায় সকলেই জয়ধ্বনি দিয়ে প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। এই দেখে সভাপতি বললেন, প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ভাব কংগ্রেস ও তার কমিটি অনুমোদন করেছেন। ফলে ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাবটি আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল।

এ দিকে লর্ড কার্জনের জনমত উপেক্ষায় বাঙালি জাতিকে সজাগ করে তুলেছিল এবং বাংলার নব জগরণ সমগ্র ভারতকে জাগিয়ে তুলল। নব অনুরাগের এক অভিনব দ্যোতনা আশা ও আনন্দে বাঙালি জাতি মেতে উঠল। নব-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ জাতি

সেদিন নতুন করে অনুভব করল, সংগ্রামে তার পতাকা নেই।

স্বদেশি আন্দোলনের অধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন তরুণ নেতা শচীন্দ্রনাথ বসু। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে একদিন তিনি এবং তার এক বন্ধু গিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে ধরলেন—আমাদের একটি জাতীয় পতাকা চাই। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা একটি পতাকা তৈরি করে এনে আমাকে দেখাও।' বাংলার জাতীয় জীবনে তখন জোয়ার এসেছে। তাই তরুণ কর্মীদল কালবিলম্ব না করে পতাকা তৈরির কাজে গেলে গেল। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা নির্মিত হল—রং ওপর থেকে নীচে সবুজ, পীত এবং লাল। পতাকা দেখে সুরেন্দ্রনাথ এক পরামর্শ সভা ডাকলেন। আশুতোষ চৌধুরী, আবদুল হালিম গজনভী এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হল। কমিটির পরামর্শক্রমে স্থির হল মূল পতাকা তিন রং-এরই থাকবে। কিন্তু পতাকার তিন রং-এর ওপর ভারতের সাতটি প্রদেশের প্রতীক সাতটি পদ্ম থাকবে। সর্বসম্মতিক্রমে পতাকা গৃহীত হল। স্থির হল পরবর্তী ৭ আগস্ট গ্রিয়ার পার্কে পতাকা উত্তোলন করা হবে। পতাকা উত্তোলনের দিনে নরেন্দ্রনাথ সেন প্রথমে পতাকার জন্য প্রার্থনা করেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু পতাকাটি সুরেন্দ্রনাথের হাতে দেন এবং তিনি ১০১টি তোপধ্বনির মধ্যে তা উড্ডীন করেন। পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন দাদা ভাই নৌরজি। সেখানে এই পতাকা উত্তোলন করা হয়। অধিবেশনে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ব্যাজেও এই তিন রং ছিল। সুতরাং দেখা যায়, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকার রূপ পেয়েছে।

গ্রীয়ার পার্কে এই পতাকা উত্তোলনের সংবাদ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ২১ শ্রাবণ *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় চিত্রাঙ্কিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে :

> স্কোয়ারের চতুপার্শ্বস্থ গৃহোপরি সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই জাতীয় উৎসব দেখিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে শঙ্খধ্বনি শোনা যাইতেছিল এবং বোমার আওয়াজ হইতেছিল। সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে নরেন্দ্রবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রবাবু সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে আকুল কণ্ঠে একটি প্রার্থনা করিলেন। জলদ্গম্ভীর কণ্ঠের সেই প্রার্থনা শুনিয়া সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রবাবু আসন গ্রহণ করিলে হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ হতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও মি. আবদুল হালিম গজনভি সুরেন্দ্রবাবুর হস্তে নবনির্মিত জাতীয় পতাকাটি প্রদান করিলেন। সবুজ, পীত ও লাল রং-এর জমির ওপর প্রথম লাইনে আধ ইঞ্চি পদ্ম, দ্বিতীয় লাইনে সংস্কৃত অক্ষরে 'বন্দে মাতরম্' এবং শেষ লাইনে সূর্য ও অর্ধচন্দ্রাকৃতিই জাতীয় পতাকার চিহ্ন হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া সকলকে এই জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে বলিলেন এবং গগনবিদারী 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা

> উড্ডীন করিলেন। অপরাহ্নে কলেজ স্কোয়ারেও এই পতাকা উড্ডীন করা হল। এই পতাকা উত্তোলন সম্পর্কে যুগান্তর পত্রিকা লিখলেন—জাতীয় বৈপ্লবিক পতাকারূপে আমরা ইহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

ফরাসি দেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্যোগে এবং মাডাম কামার সম্পাদনায় *তলোয়ার* পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার বহিঃপটে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত একটি জাতীয় পতাকা ছিল। তার ওপর ছিল সাদা পদ্ম, সূর্য, চন্দ্র ও তারা। দেবনাগরী অক্ষরে বন্দেমাতরম্ও অঙ্কিত থাকত। লন্ডনে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার ইন্ডিয়া হাউসে এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে মাডাম কামা এই পতাকা উত্তোলন করে বক্তৃতা করলেন—'This is the Flag for which Khudiram and Prafulla Chaki died.' ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' পুস্তকে লিখেছেন, 'ইহার পর এই পতাকা বার্লিনে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে আবির্ভূত হয়। বার্লিন বৈপ্লবিক কমিটি এই পতাকা জাতীয় পতাকারূপে ব্যবহার করে।' তিনি বলেন যে, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বার্লিনে গিয়ে তিনি কমিটির বাড়িতে এই পতাকা উত্তোলিত দেখেন। কিন্তু তখন তা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা মাত্র ছিল। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভূপেন্দ্রনাথকে বলেন যে, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি তাঁরাই অপসারিত করেছেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে অ্যানি বেসান্ত তাঁর Home Rule League-এর প্রতীকরূপে একটি জাতীয় পতাকা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বাঙালি জাতিই ভারতকে প্রথম জাতীয় পতাকা উপহার দিয়েছিলেন এবং এর পশ্চাতে রয়েছে রামমোহন রায় এবং ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাবধারার প্রভাব।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় পতাকার প্রয়োজন নতুন করে অনুভূত হয়। মছলি পট্টনম ন্যাশানাল ইন্স্টিটিউটের ডিরেক্টার শ্রী পি. বেঙ্কটায়া এই সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা লেখেন। তিনি ওই পুস্তকে ভারতীয় জাতীয় পতাকার এক নক্সার প্রস্তাব দেন। এর পরে পাঞ্জাবের লালা হংসরাজ আর একটি নমুনা প্রকাশ করেন। হংসরাজের কথাটায় চক্র অঙ্কিত ছিল। এজন্য এই পতাকাটি গান্ধিজির নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের বেজওয়াদন অধিবেশনে গান্ধিজি ও শ্রীবেঙ্কটায়ার উপরই জাতীয় পতাকা প্রস্তুতের ভার অর্পিত হয়। তাঁদের বলা হয়, এই পতাকার লাল রং থাকবে হিন্দুদের জন্য, সবুজ রং থাকবে মুসলমানদের জন্য এবং এর সঙ্গে থাকবে চরকা। কিন্তু সময় অভাবে এই পতাকার নমুনা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি। পরে গান্ধিজি ভাবলেন যে, জাতীয় পতাকায় ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়েরও প্রতীক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এজন্য তিনি জাতীয় পতাকার নিম্নলিখিত নক্সার প্রস্তাব করেন—সর্বোপরি শ্বেত রং থাকবে সকল সম্প্রদায়ের জন্য তার সঙ্গে থাকবে সবুজ রং মুসলমানদের জন্য এবং সকলের নীচে থাকবে লাল রং হিন্দুদের জন্য।

এর পশ্চাতে এই মনোভাব ছিল যে, দুর্বল জাতিই প্রথম স্থান পাবে এবং শক্তিমান হবে দুর্বলের সহায়। দুর্বল যেন শক্তিবানের ওপর অনায়াসে নির্ভর করতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধী দাবি সকল ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এজন্য জাতীয় পতাকা সম্পর্কে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক সাব-কমিটি নিয়োগ করে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে এই সাব-কমিটির প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং ভারতের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

> ভারতের জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণরঞ্জিত হবে। ওপর থেকে নীচে রং হবে গৈরিক, শ্বেত এবং সবুজ। শ্বেত অংশের মধ্যভাগে থাকবে ঘন সবুজ বর্ণে অঙ্কিত চরকা। বিভিন্ন রং কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক তাৎপর্যমূলক হবে না। গৈরিক হবে সাহস ও আত্মত্যাগের প্রতীক, শ্বেত হবে শান্তি ও সত্যের প্রতীক এবং সবুজ হবে বিশ্বাস ও বীরত্বের প্রতীক। চরকা থাকবে জনতার আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতের জাতীয় পতাকার সুদীর্ঘ দিনের ইতিহাস মহত্ত্বপূর্ণ। এই পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে ভারতবাসী বড়ো বড়ো আত্মবলির কার্য করেছে। ভারতীয় জনসাধারণ এবং ভারতীয় তরুণ সমাজ মহত্ত্বপূর্ণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। হয়তো ভবিষ্যতেও এর নীচে দাঁড়িয়ে আমাদের বহু সংগ্রাম করতে হবে এবং বহু আত্মত্যাগ করতে হবে। এই পতাকা আমাদের বিজয়ের পথ দেখাবে এই আশা আমরা রাখি। স্বাধীনতোত্তর ভারতে এই চরকার আরও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। ভারতের জাতীয় পতাকায় চরকার স্থান পেয়েছে ঐতিহাসিক অশোকচক্র।

বিতর্কিত জাতীয় সংগীত বন্দে মাতরম্

অভ্র ঘোষ

সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে যোগ দেবার জন্য যে-আমন্ত্রণপত্রটি পেয়েছি তাতে লেখা হয়েছে, ...a national seminar on the centenary of the adoption of Vande Mataram as the national song ইত্যাদি। শতবর্ষের তারিখটি অবশ্য উল্লেখ করেননি কর্তৃপক্ষ, তবে ধরে নেওয়া যায়, ২০০৬-এর কোনো এক তারিখ হয়তো কর্তৃপক্ষের নজরে রয়েছে। মাস-দুয়েক আগে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নের মাননীয় মন্ত্রী ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখটিকে 'বন্দে মাতরম্'-এর জাতীয় সংগীত হয়ে ওঠার শতবার্ষিক দিন বলে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রীয় অনুদানপুষ্ট বিদ্যায়তনগুলির ছাত্রছাত্রীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওই দিনটিতে 'বন্দে মাতরম্' গেয়ে যেন যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। ইউপিএ সরকারের মন্ত্রীর নির্দেশটি তৎক্ষণাৎ লুফে নেয় বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এই দলের সভাপতি রাজনাথ সিং বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেন 'বন্দে মাতরম্' শতবার্ষিক অনুষ্ঠান পালন করা যেন ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও বিজেপি-র সোৎসাহ সমর্থন ইত্যাদির বিরুদ্ধে গোটা দেশে দুরকম প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

এক, প্রত্যাশিতভাবেই মুসলিম ল বোর্ড-সহ বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক সংগঠন এই সরকারি বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং মাদ্রাসাগুলি-সহ মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মীয় কারণে 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। শিখ সংগঠন শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটিও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে 'বন্দে মাতরম্' গানে এক বিশেষ ধর্মের মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে তার সংগতি নেই, তাই এই জাতীয় সংগীত বাধ্যতামূলকভাবে গাওয়ানো যাবে না। এসজিপিসি-এর প্রধান অবশ্য এ কথা বলার কয়েক ঘণ্টা বাদেই সুর বদল করে বলেছেন যে, 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া তাঁর পক্ষে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা সম্ভব নয় কারণ সমগ্র শিখসমাজের মানুষের প্রতি এই নির্দেশ জারি করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা তাঁর নেই *(সূত্র :* 7 Sept 2006, *The Statesman)*। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি যেমন ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া বাধ্যতামূলক হয়েছিল, কর্ণাটক ও উড়িষ্যায় বিজেপি সরকারের এক প্রধান শরিক দল, অতএব সেখানেও 'বন্দে মাতরম্' উৎসব পালন করা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষিত

হয়েছিল এবং মহাসমারোহে সেসব রাজ্যগুলিতে এই উৎসব পালিত হয়েছে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, আসাম, পাঞ্জাব, হরিয়ানাতে রাজ্য সরকারগুলি এই উৎসব-পালন ঐচ্ছিক বলে ঘোষণা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে সরকার বিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছেন এ কথা জানিয়ে যে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এমন কোনো বিজ্ঞপ্তি পাননি। সব মিলিয়ে স্বাধীনতার ষাট বছর বাদে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে ঘিরে আরও একবার রাজনৈতিক বিবাদ দানা বেঁধে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটি এসেছে ইতিহাসবিদদের তরফ থেকে। ঐতিহাসিকেরা জানিয়েছেন, ২০০৬-এর ৭ সেপ্টেম্বর তারিখটি কীভাবে 'বন্দে মাতরম্' গানটির জাতীয় সংগীত হয়ে ওঠার শতবার্ষিক দিবস হয়ে উঠল তার কারণ বোধগম্য হচ্ছে না। অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেছেন, 'কেন ওই তারিখটি বেছে নেওয়া হল, তা রহস্যজনক। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে নির্দেশ পাঠানোর আগে কেন কোনো বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া হল না, তাও জানি না। মোটরে ওপরে এটা যে ভুল, তা জোরের সঙ্গেই বলতে পারি। এবং এ ধরনের ভুল হওয়া উচিত নয়।' (সূত্র : *আনন্দবাজার,* ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। সরকারের তরফ থেকে অবশ্য এখনও ভুল স্বীকার করা হয়নি, তবে সরকারের প্রধান শরিক কংগ্রেসের সম্পাদক জানিয়েছেন যে এই তথ্যে কিছু গোলমাল থাকতে পারে।

ভ্রান্তিটি আসলে কোথায়—সে-কথা জানতে হলে এই গানটির ইতিহাস ঈষৎ বিশ্লেষণ করতে হবে। তথ্যগতভাবে দু-ধরনের ভুল আমাদের চোখে পড়ছে। ২০০৬-এর ৭ সেপ্টেম্বরকে যদি 'বন্দে মাতরম্'-এর জাতীয় সংগীত হয়ে ওঠার শতবার্ষিক দিন বলে স্বীকার করতে হয়, তাহলে ১৯০৬-এর ৭ সেপ্টেম্বর-এ কী ঘটেছিল তা যাচাই করা জরুরি হয়ে পড়ে। বস্তুত ওই তারিখটির তাৎপর্য, ইতিহাসকারেরা শনাক্ত করতে পারেননি, তেমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি ওই দিন। দ্বিতীয় গোলমাল, 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেল কবে? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য তিনটি উত্তর হতে পারে। প্রথমত, জাতীয় সংগীতের ধারণাটিকে যদি রাষ্ট্র-স্বীকৃত জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৫০-এর ২৪ জানুয়ারি। গণপরিষদের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিষদের সভায় স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত-বিষয়ে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন :

> There is one matter which has been pending for discussion, namely the question of National Anthem. At one time it was thought that the matter might be brought up before the House and a decision taken by the House by way of a resolution. But it has been felt that, instead of

> taking a formal discussion by means of a resolution, it is better if I make a statement with regard to the National Anthem. Accordingly I make this statement.
>
> The composition consisting of the words and music known as Jana Gana Mana is the National Anthem of India, subject to such alterations in the words as the Government may authorise as occasion arises ; and the song Vande Mataram which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. (জগদীশ ভট্টাচার্য · বন্দেমাতরম্, জুন ১৯৭৮, পৃঃ ১০৭-১০৮)।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেহেতু ১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের সংবিধান গ্রহণ করেছিল এবং তার প্রায় দু-মাস বাদে আমাদের জাতীয় সংগীত গণপরিষদে সভাপতির বিবৃতির পর গৃহীত হয়, তাই আইনগতভাবে আমাদের জাতীয় সংগীত সংবিধানের অংশ নয়। ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের পর যখন ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্যের তালিকা সংবিধানে সন্নিবেশিত হল (Art 51A) তাতে জাতীয় সংগীতকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে (clause-a)—এ কথা বলা হল্। কিন্তু আইনের বিচারে তা নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মতো, প্রয়োগ করতে হলে সরকারকে নির্দিষ্ট স্ট্যাটুইটারি আইন তৈরি করতে হবে। নচেৎ এ এক সাধারণ নির্দেশমাত্র।

'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সংগীত হয়ে ওঠার বিষয়ে আমাদের দ্বিতীয় উত্তর হতে পারে, এই গানকে যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস resolution করে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। সে তারিখটি হল ২৮ অক্টোবর ১৯৩৭। ব্যাপারটা এমন নয় যে এর আগে জাতীয় কংগ্রেস এই গান ব্যবহার করেনি। বস্তুত ১৯০৩-০৮-এর আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' গান ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি জাতিকে উদ্‌বেলিত করেছে এবং তারও আগে এই গান কংগ্রেসের মঞ্চে গাওয়া হয়েছে। এবং উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে শুধু বাংলা দেশেই নয়, সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র। সে-কথায় আমরা পরে আসছি। কিন্তু আইনগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মতন্ত্রের মাধ্যমে কংগ্রেস ১৯৩৭-এর আগে 'বন্দে মাতরম্'-কে গ্রহণ করেনি। কেন হঠাৎ ২৮ অক্টোবর ১৯৩৭-এ এই resolution করতে হল তার পটভূমি ব্যাখ্যা করার অবকাশ এখানে আছে। অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর সুলিখিত একটি বইতে *Vande Mataram : The Biography of a Song* (Penguin, 2003) এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার বিশদ পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। আপাতত মূল ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক। একটু আগেই উল্লেখ করেছি ১৯০৫-এর আন্দোলনের সময় থেকেই 'বন্দে মাতরম্' জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল। সব্যসাচী ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'The song that united also divided... .' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১)। 'বন্দে মাতরম্'-এর ইতিহাসে এই কথাটি

বারেবারেই ঘুরে ঘুরে এসেছে। বঙ্গচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের পর্বে তা যেমন দেখা গেছে অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান বিরোধের এক সূত্র হিসেবে কাজ করেছে এই গান, তেমনই তা এক জোরদার বিতর্ক তৈরি করেছে ১৯৩০-এর যুগে। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন চালু হবার পর ১৯৩৭-এ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন নিষ্পন্ন হল। বেশ অনেকগুলি প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিল, মুসলিম লিগের প্রাধান্য তৈরি হল কিছু কিছু রাজ্যে। এই নির্বাচনের পর্বে কংগ্রেস-লিগের রাজনৈতিক বিরোধ এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। সেই সময়ে কংগ্রেস প্রভাবিত রাজ্যগুলিতে এক রেওয়াজ ছিল প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশনের শুরুতে 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়ার, স্বায়ত্তশাসনমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার রীতি ছিল। মুসলিম লিগ এই রীতির বিরোধিতায় উচ্চকিত হল। ওই সময়ে করাচি কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কংগ্রেস অবলম্বিত কোনো বিধির প্রতিবাদ করলে কংগ্রেস তার যথাবিহিত সংশোধন করতে বাধ্য ছিল। 'বন্দে মাতরম্' প্রশ্নে এই বিতর্ক নিরসন করার দায় বর্তেছিল কংগ্রেসের ওপর।

দ্বিতীয়ত, ১৯৩৬-এ নেহরু দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তাঁর মনে হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসে মুসলমান নেতৃবর্গ আছেন ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মুসলমান সমাজের সঙ্গে কংগ্রেসের যথেষ্ট ব্যবধান তৈরি হয়েছে, ফলে কংগ্রেসের তরফ থেকে এমনকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন যাতে এই ব্যবধান কমানো যায়। নেহরু গ্রহণ করলেন Muslim Mass Contact Programme ; এক প্রেস-বিবৃতিকে তিনি বললেন :

> We talk of approaching the Muslim masses. That is no new programme for us although the stress may be new....It must be remembered that the Congress has always had large number of Muslims in its fold....Some of our most eminent national leaders have been and are Muslims. But it is true that the Muslim masses have been largely neglected by us in recent years. We want to correct that omission and carry the message of the congress to them.
>
> (সব্যসাচী ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৯-৩০)।

এরই প্রেক্ষিতে ১৯৩৭-এর অক্টোবর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মুসলমানদের কাছে আপত্তিজনক 'বন্দে মাতরম্' সংগীত নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তবে আলোচনা শুরুর আগে সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলাল 'বন্দে মাতরম্'-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত জানতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। বাস্তবিকপক্ষে নেহরু কলকাতায় পৌঁছোবার আগেই সুভাষ আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন যে ওয়ার্কিং কমিটি হয়তো 'বন্দে মাতরম্' গানটিতে পৌত্তলিকতা আছে এই সন্দেহে ভিন্ন কোনো নীতি অবলম্বন করতে

পারে। উপরন্তু এই সময়েই *Viswa-Bharati News*-এ কৃষ্ণ কৃপালনী 'বন্দে মাতরম্'-এর সাম্প্রদায়িক চরিত্র নিয়ে লিখেছিলেন এক প্রবন্ধ। সুভাষ এই লেখা পড়ে শঙ্কিত হয়ে কার্শিয়াং থেকে রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি লেখেন ১৬ অক্টোবর ১৯৩৭-এ—
'...কংগ্রেস মহলে 'বন্দে মাতরম্' গানের বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। ২৬ তারিখে Congress Working Committee-র যে সভা কলিকাতায় বসিবে, সেখানে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। হয়তো উক্ত কমিটি এই গান বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে আপনার মতামত আমি জানি না এবং জানিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি। বাঙলাদেশে, এবং বাঙলার বাহিরে হিন্দু সমাজে, খুব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে এবং বহু বন্ধুর অনুরোধে আপনার উপদেশ পাইবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি।

৯ অক্টোবরের 'comrade' পত্রিকায় বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত কৃপালনী *বিশ্বভারতী* পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়োছেন। তিনি 'বন্দে মাতরম্' গানের বিরুদ্ধেই লিখিয়াছেন। তাঁহার মত বিশ্বভারতীর মত কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

'আপনার যদি এই শর্ত হয় যে 'বন্দে মাতরম্' গানের বর্তমান মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত তাহা হইলে আপনি যদি পণ্ডিত জওহরলাল ও মহাত্মা গান্ধিকে এ বিষয়ে লেখেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়।..'

একটি তথ্য এখানে জানিয়ে রাখা দরকার যে কৃষ্ণ কৃপালনীর প্রবন্ধ 'Bande Mataram and Indian Nationalism' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *Viswa-Bharati News*-এ (অক্টোবর ১৯৩৭), *comrade* পত্রিকায় তা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে প্রায় একই সঙ্গে। প্রবন্ধটি বিতর্কের সূত্রপাত করাতে *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকায় (২৪ অক্টোবর ১৯৩৭) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছিলেন :

> ...The views on 'Bande Mataram' that had found expression in Prof. Krishna Kripalani's article in the Viswa, Bharati magazine represent the official view of Viswa-Bharati or of the poet.
>
> (*রবীন্দ্রজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয় সুভাষচন্দ্র একই সঙ্গে এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন *প্রবাসী* সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। ইতিমধ্যে নেহরুও কবির মত জানতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরুর মাত্র ছ-দিন আগে বিশে অক্টোবর নেহরু সুভাষকেও লিখেছিলেন :

> I have managed to get an English translation of Anandamath and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims.
>
> (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩২)

এই চিঠিতে নেহরু সুভাষকে আরও জানিয়েছিলেন যে 'বন্দে মাতরম্‌' গানের ভাষা বোঝার জন্য তাঁকে বারবার অভিধানের সাহায্য নিতে হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। তারই মধ্যে কবি এই বিতর্কের অবসানের জন্য নেহরুকে যে ঐতিহাসিক চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে তাঁর তিনটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি এখন সহজপ্রাপ্য, তার সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। চিঠিতে তাঁর মূল তিনটি বক্তব্য ছিল এরকম : (ক) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্‌' গানের প্রথম স্তবকে তিনিই প্রথম সুর দিয়েছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র তখন জীবিত। তিনিই কংগ্রেসের জাতীয় সভায় প্রথম এই গান গেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে 'বন্দে মাতরম্‌' যখন জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয় তার পর থেকে বহু বিশিষ্ট মানুষের স্বার্থত্যাগের ঘটনাবলি এই গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। (খ) এই গানের প্রথম স্তবকে যে ভক্তি ও কোমলতার ভাব আছে, তাতে ভারতমাতার যে সুন্দর রূপ বর্ণিত হয়েছে তা কবির হৃদয়কে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাই এ-গানের প্রথম স্তবককে পুরো গানটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে তাঁর অসুবিধে হয় না। অবশ্য তিনি আবাল্য একব্রহ্মবাদের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত বলে সমগ্র গানটির প্রতি তাঁর ভালোবাসা নেই। চিঠির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু কবির ভাষাতেই উল্লেখ করি :

> (গ) I freely concede that the whole of Bankim's 'Vande Mataram' poem, read together with its context, is liable to be interpreted in ways that might wound Moslem susceptibilities, but a national song, though derived from it, which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original poem, need not remind us everytime of the whole of it, much less of the story with which it was accidentally associated. It has acquired a separate individuality and an inspiring significance of its own in which I see nothing to offend any sect or community.
>
> (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪)

স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সংগীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম্‌'-কে গ্রাহ্য করার আগে 'বন্দে মাতরম্‌'-এর ব্যবচ্ছেদ চেয়েছেন। কবিতার শেষ দুই স্তবকে পৌত্তলিকতার চিহ্ন আছে বলে তা তিনি সংখ্যালঘুর ওপর চাপিয়ে দিতে চাননি। সুভাষচন্দ্রের চিঠির উত্তরে কবি লিখেছিলেন, *আনন্দমঠ* উপন্যাসটি সাহিত্যের বই, তার মধ্যে এই গানের সুসংগতি আছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সর্বজনীনভাবে সংগত হতেই পারে না। বাংলাদেশের একদল মুসলমানের মধ্যে যখন অযথা গোঁড়ামির জেদ দেখতে পাই তখন সেটা আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়। তাদের অনুকরণ করে আমরাও যখন অন্যায় আব্দার নিয়ে জেদ ধরি তখন সেটা আমাদের পক্ষে

লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে। বস্তুত এতে আমাদের পরাভব।...'

'বন্দে মাতরম্' ব্যবচ্ছেদের এই অভিমত তদানীন্তন হিন্দুসমাজকে খুশি করতে পারেনি। প্রবল ঝড় উঠেছিল কবির বিরুদ্ধে। এমনকি কবিবন্ধু ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও কবির এই সিদ্ধান্ত সমালোচনামুখর করে তুলেছিল।[১] কবির মত জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার সদস্য কাউকেই খুশি করেনি বরং তীব্র উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল সর্বত্র। কংগ্রেস সভাপতি নেহরু অবশ্য পছন্দ করেছিলেন কবির অভিমত। তা কেবল মুসলিম লিগের বিভেদাত্মক রাজনীতিকে ঠ্যাকাবার কৌশল হিসেবে নয়, 'বন্দে মাতরম্'-এর Text তাঁর কাছে পৌত্তলিকতার দোষে দুষ্ট বলেই মনে হয়েছিল। তাই জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মনোভাবের কথাও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এ কথা মনে রাখা জরুরি যে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩৪-এ 'বন্দে মাতরম্' দিয়ে তাঁদের সভাপতির ভাষণ শেষ করতেন। নেহরু ১৯২৯ বা ১৯৩৬-এ কখনোই সভাপতি-ভাষণের শেষে 'বন্দে মাতরম্ ধ্বনি ব্যবহার করেননি। (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৩)। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মনোভাবের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য AICC-র দলিল উদ্ধার করে যে খবরটি দিয়েছেন সেটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তরুণ জাতীয়তাবাদী মুসলিম ইতিহাসবিদ এবং কংগ্রেসকর্মীকে এম. আশরফ যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি মহাবীর ত্যাগীকে জানিয়েছিলেন, We should appoint a committee to select a number of National songs and Flag songs acceptable and intelligable to both Hindus and Muslims. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩০)। বাস্তবিকপক্ষে আশরফের এই মত তখনকার বেশির ভাগ জাতীয়তাবাদী মুসলমানের মনোভাবের সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য সমসাময়িককালে রেজাউল করিমের চিন্তাকে উপেক্ষা করা চলে না, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো যিনি মনে করতেন, বন্দেমাতরম্-এ দেশমাতৃকার বন্দনাই মুখ্য, পৌত্তলিকতার আবাহন হিসেবে তার বিচার যুক্তিহীন।[২] এক শ্রেণির মুসলমান সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কলকাতার রাস্তায় *আনন্দমঠ* বই পোড়ানোর উৎসবে মত্ত, এটা মুসলিম সমাজের কলঙ্ক বলে গণ্য করতে হবে। উল্লেখ্য আরও এই যে কাজি আবদুল ওদুদ, মোহম্মদ শহিদুল্লাহ্ কিংবা সাম্প্রতিককালে আহ্মদ শরিফ, আনিসুজ্জামান, হাসান আজিজুল হক এবং এরকম আরও অনেকের বঙ্কিম-সাহিত্য-বিষয়ে যে-দৃষ্টিভঙ্গি তার গুরুত্ব কম নয়, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' বা বঙ্কিমচন্দ্র-বিষয়ে সাধারণ মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি তা ছিল না। বস্তুত 'বন্দে মাতরম্' প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক এই বিতর্কেও আমরা সে-পরিচয় পাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের মত পাবার পর ২৮ অক্টোবর ১৯৩৭-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তার চেহারাটি ছিল এরকম :

Working Committee feel that past associations, with their long record of suffering for the cause, as well as popular usage, have made the first two stanzas of this song a living and inseparable part of our national movement and as such they must command our affection and respect. There is nothing in these stanzas to which anyone can take exception. The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India.

The committee recognise the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song. While the committee have taken note of such objection in so far as it has intrinsic value, the committee wish to point out that the modern evolution of the use of the song as part of national life is of infinitely greater importance than its setting in a historical novel before the national movement had taken shape. Taking all things into consideration therefore the committee recommend that wherever the Bande Mataram is sung at national gatherings only the first two stanzas should be sung, with perfect freedom to the organisers to sing any other song of an unobjectionable character, in addition to, or in the place of, the Bande Mataram song. (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫-৩৬)

ওয়ার্কিং কমিটি আর-এক সিদ্ধান্ত করল যে আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু এবং নরেন্দ্র দেবকে নিয়ে একটি উপসমিতি গঠন করা হবে যাঁরা 'any other song of an unobjectionable character'-এর কথা বিবেচনা করতে পারবেন। এবং এই উপসমিতি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ বা উপদেশ গ্রহণ করবেন। দেশবাসীর কাছে নতুন গান রচনার আহ্বানও জানানো হল। সব্যসাচী ভট্টাচার্য সঠিক উল্লেখ করেছেন যে resolution-এর এই দ্বিতীয়াংশে এক ধরনের আমলাতান্ত্রিকতার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। জাতীয় সংগীত ফরমায়েশ দিয়ে লেখানোর বিষয় নয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে এই আমলাতান্ত্রিকতা যে নেহরুর পছন্দসই ছিল না সে-কথা জানিয়ে তিনি উর্দু কবি আলি সর্দার জাফরিকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

...great songs and anthems cannot be made to order. It requires a genius for the purpose... (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭)

যাই হোক ১৯৩৭-এর অক্টোবরে কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুই স্তবক গ্রহণ করার পর দেশময় তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। হিন্দু নেতারা অনেকেই এর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং মুসলিম লিগও আদৌ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি। কারণ জিন্না ১৯৩৮-এর মার্চে নেহরুকে লিখেছিলেন যে এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত এক concession-মাত্র যা

মুসলমানদের কাছে গ্রাহ্য নয়। এবং স্পষ্ট ভাষায় তাঁর পুরোনো অবস্থান জানিয়ে লিখলেন :

> Pandit Jawaharlal Nehru cannot be unaware that Muslims all over have refused to accept the Vände Mataram or any expurgated edition of the anti-Muslim song as a binding National Anthem.
>
> (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯)

মুসলিম লিগ বারবার দাবি উত্থাপন করতে শুরু করল যে 'বন্দে মাতরম্'-কে পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে গান্ধি এক গোপন বার্তায় কংগ্রেস-নেতাদের জানালেন :

> As to the singing of the long established national song, Vande Mataram, the Congress, anticipating objections, has retained as national song only those stanzas to which no possible objection could be taken on religious or other grounds. But except at purely Congress gatherings it should be left open to individuals whether they will stand up when the stanzas are sung. In the present state of things, in local Board and Assembly meetings which their members (are) obliged to attend the singing of Vande Mataram should be discontinued (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০)

গান্ধি চাননি 'বন্দে মাতরম্'-এর মতো মহান সংগীতটিকে কর্দমাক্ত রাজনীতির সংকীর্ণ বিষয় করে তুলতে।

এতক্ষণ যে ইতিহাসটির কথা বললাম তার প্রেক্ষিতে বলা চলে যে, তাহলে জাতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মঞ্চ জাতীয় কংগ্রেস আইনসম্মতভাবে 'বন্দে মাতরম্' গ্রহণ করল ১৯৩৭-এর ২৮ অক্টোবর, তীব্র বাদবিতণ্ডা সত্ত্বেও।

কিন্তু এর পরেও কথা থেকে যায়। 'বন্দে মাতরম্-'কে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার কি অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? আমি তৃতীয়-যে সম্ভাব্য উত্তর খোঁজার কথা বলেছি এই নিবন্ধের শুরুতে সেটি এবার দেখা যাক। জননেতা, সাহিত্যিকগোষ্ঠী, ইতিহাসকার সকলেই একমত যে 'বন্দে মাতরম্' জনমানসে জাতীয় সংগীত হয়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গের পর্বে। ওই আন্দোলনের ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করলে ছত্রেছত্রে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে সে-কথায় যাবার আগে এটাও খেয়ালে রাখা জরুরি যে, এই আন্দোলন শুরু হবার বেশ আগে থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ এ-গান গেয়েছেন। প্রধানত সরলা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষ্য মেনেই ইতিহাসকারেরা জানাচ্ছেন যে ১৮৯৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে কবি প্রথম এই গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়েছেন।

কিন্তু কেউ কেউ অন্য কথাও বলেছেন। ১৯৪১-এ প্রকাশিত অমল হোম সম্পাদিত *Calcutta Municipal Gazette : Tagore Memorial Special Supplement*-এ প্রকাশিত কবির জীবনালেখ্যতে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ attends the sixth session of the Indian National Congress in Calcutta (December 1890) under the presidentship of Pherozshah Mehta, when he sings the Bande Mataram on the opening day. (পৃঃ ৬৭)। এই সিদ্ধান্তের শরিক সংগীতবিশেষজ্ঞ অনন্তকুমার চক্রবর্তীও, তাঁর *গানের ভেলায় বেলা অবেলায়* গ্রন্থে। *রবিজীবনী*-কার প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, 'কিন্তু রথীন্দ্রনাথের ও অন্যদের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান দিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের সূচনা হলেও সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অন্য কথা বলে।' (*রবিজীবনী*-৪, পৃ. ১২৫)। প্রশান্তকুমার *অমৃতবাজার পত্রিকা* (২৯ ডিসেম্বর ১৮৯৬) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : Before the proceeding commenced, a party of gentlemen headed by Babu Rabindranath Tagore sang a number of songs composed to suit the occasions। সেই গানগুলি কী? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'চল্ রে চল্ সবে ভারতসন্তান', সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' ইত্যাদি। পত্রিকার প্রতিবেদনে বন্দে মাতরম্-এর উল্লেখ না থাকলেও অবশ্য প্রমাণ করা শক্ত যে সে-গান গাওয়া হয়নি। কেন-না রথীন্দ্রনাথ পরিষ্কার লিখেছেন যে সরলা দেবী অর্গান বাজিয়েছিলেন এবং কবি উদাত্তকণ্ঠে মাইক ছাড়া বন্দেমাতরম্ গেয়েছিলেন। *On the Edges of Time*-এ আমরা এ কথা পাচ্ছি।[৩] ১৮৯০ বা ১৮৯৬ যাই হোক না কেন এ বিষয়ে মতান্তর বোধহয় নেই যে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কংগ্রেস-মঞ্চে এ গান গেয়েছেন। কিন্তু আরও এক খটকা রয়ে গেল শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা পড়ে। তিনি লিখেছেন, 'ঐ অধিবেশনের (১৮৯৬) এক প্রস্তাবে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।' ('বন্দে মাতরম্ ও স্বদেশী আন্দোলন' : *দেশ,* সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৫)। এই তথ্যের ভিত্তি কী, তা অবশ্য জানাননি লেখক। সত্যিই কি এমন কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কংগ্রেসের সভায়? ইতিহাসে তেমন কোনো তথ্যের হদিস পাচ্ছি না।

১৯০৫-এর আন্দোলন-পর্বে 'বন্দে মাতরম্'-কে জাতীয় মন্ত্রে পরিণত করার প্রধান উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ১৯০৭-এ প্রকাশিত 'Rishi Bankimchandra' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

> Among the Rishis of the later age we have at least realised that we must include the name of the man who gave us the reviving Mantra which is creating a new India, the Mantra Bande Mataram. অরবিন্দ

> এই প্রবন্ধে আরও লিখেছেন, The religion of patriotism—This is the master idea of Bankim's writings.
>
> ('বন্দে মাতরম্' : জগদীশ ভট্টাচার্য থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩)

আনন্দমঠ-এর অনুপ্রেরণায় অরবিন্দ ভবানী মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিপ্লবী গুপ্তসমিতিগুলির ধ্যানধারণায় *আনন্দমঠ*-এ বর্ণিত সন্তানদলের কাজকর্মের ছায়াও দেখতে পাওয়া যেত। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আন্দোলনকারীদের icon হয়ে উঠেছিলেন এবং 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের প্রচার বিদ্যুদ্‌গতিতে ছড়িয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার প্রতিষ্ঠিত সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে ১৮৮২ সালে *আনন্দমঠ* প্রকাশিত হবার পর 'বন্দে মাতরম্' তেমন প্রচারের আলোয় আসেনি। মানুষের কাছে বিপুলভাবে আদৃত হতে শুরু করেছে এই মন্ত্র ১৯০৫-এর আন্দোলনে।

১৯০৫-এ এইচ. বোসের উদ্‌যোগে রবীন্দ্রনাথের গলায় 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম রেকর্ড তৈরি হয়। পুরো গানটি নয়, প্রথম কটি পঙ্‌ক্তি। ভাগনি সরলা দেবীকে তিনি বলেছিলেন বাকি কবিতাংশে সুর বসাতে, সেটা অবশ্য আগেই। সরলা দেবী দিয়েছিলেন সেই সুর এবং বিভিন্ন সভাসমিতিতে গাইতেন এই গান। অন্যদিকে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি বিভিন্ন সভাসমিতি-মিছিলে ধ্বনিত হতে থাকে, বিশেষত ছাত্র-যুবমহলে। ১৯০৫-এর উনিশে জুলাই সরকারিভাবে বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব ঘোষিত হবার পর কলকাতার টাউন হলে পরপর পাঁচটি জনসবা হয়। প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭ আগস্ট রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে—ছাত্র ও যুবকদের অংশগ্রহণ এই সভায় ছিল চোখে পড়ার মতো এক ঘটনা। ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন, সমস্ত স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্ররা মিলিত হয়েছিলেন কলেজ স্কোয়ারে এবং তাঁদের মাথায় ছিল গেরুয়া উষ্ণীষ, বুকে 'বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে হইবে' লেখা ব্যাজ, খালি পা এবং হাতে কালো পতাকা যেগুলিতে প্রধানতম স্লোগান ছিল 'বন্দে মাতরম্'। রবীন্দ্রনাথের *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে আমরা যে ছবির বর্ণনা পড়েছি। তবে এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে 'বন্দে মাতরম্' স্লোগান ব্যবহারের ঘটনা *এটাই* প্রথম ছিল না। সরলা দেবী তাঁর *জীবনের ঝরাপাতা*-য় লিখেছেন, *'বন্দে মাতরম্' শব্দটি মন্ত্র হল সর্বপ্রথম যখন মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রোসেশন করে নিয়ে যাবার সময় ওই শব্দদুটি হুংকার করে করে যেতে থাকল। সেই থেকে সারা বাঙলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ওই মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ল—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যখন গভর্নর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল আহিমালয়-কুমারিকা পর্যন্ত ওই বোলটি ধরে নিলে।'* (পৃ. ৪৮)। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯০৪-এ।

১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গবিভাগ কার্যকর হল। ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছেদ ঘটলেও বাঙালি যে এক অখণ্ড জাতি ধর্ম বা জাতপাত নির্বিশেষে—সে-কথা প্রতিষ্ঠার

জন্য রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন এই-জাতীয় শোকের দিনে পরস্পর পরস্পরকে রাখিবন্ধনে জড়িয়ে রাখতে। ১৬ অক্টোবর সকালে খালিপায়ে 'বন্দে মাতরম্' গান ও স্লোগানসহ কলকাতার রাস্তায় ঐতিহাসিক মিছিল বেরোল—গঙ্গাস্নানের পর সেই মিছিল রাখি-সংগীতে ভরিয়ে দিয়েছিল আকাশ-বাতাস। কৃষ্ণকুমার মিত্র, অবনীন্দ্রনাথের রচনায় এই দিনটির ঘটনাবলি বিধৃত রয়েছে।[৪] রামেন্দ্রসুন্দরের প্রস্তাবক্রমে ঘরে ঘরে অরন্ধন পালিত হল, অন্তঃপুরের মেয়েরা পড়লেন *বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা*, আগে-পরে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে। দোকান-বাজার-যানবাহন সবই ছিল বন্ধ। বিকেলে পারসিবাগানের বিরাট জনসভায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাঙালির 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্য দিয়ে জাতীয় নেতারা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ভেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এরপর শ্যামবাজারের পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির প্রাঙ্গণে বাঙালি স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল। কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন, প্রায় ৭০ হাজার লোকের '...উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ নিনাদিত ও চতুর্দিকের বাটী হইতে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। সকলের মন যেভাবে বিভোর হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না' (*আত্মস্মৃতি*)। রবীন্দ্রনাথ ওই অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণের এক অংশে বলেছিলেন, '...তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দে মাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে অপর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক।' ওই একই দিনে কালীঘাটের মন্দিরেও উদ্‌যাপিত হয়েছিল। বঙ্গচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের অনুষ্ঠান। মন্দিরের পুরোহিতের গলায় ঝোলানো হয়েছিল এরকম কথা 'অন্য দেবদেবীর পূজার পূর্বে, জন্মভূমির পূজাই প্রশস্ত'। মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্য দিয়ে মন্দিরেও বিলেতি দ্রব্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা নেওয়া হয়।

বয়কট আন্দোলন ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল। কলকাতায় তো বটেই গ্রামে-গঞ্জে-মহকুমা-জেলাশহরগুলিতে আন্দোলন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বাপেক্ষা বেশি তৎপর ছিল সে-আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্র-যুবারা। সরকার ভয় পেয়ে কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার জারি করলেন ১৯০৫-এর ১০ অক্টোবর। ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক সভাসমিতি-বক্তৃতা-পিকেটিং ইত্যাদি থেকে বিরত করার জন্য এই সার্কুলার। 'বন্দে মাতরম্' গান ও স্লোগান এই নিষেধের তালিকায় এল। ১৯০৫-এর ডিসেম্বরে গোখলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল বারাণসী কংগ্রেস। ইতিমধ্যে কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয়ে গেছে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি, জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনও ধাপে ধাপে তৈরি হতে শুরু করেছে। বয়কট তো চলছিলই। বাংলায় নেতারা কংগ্রেসে বয়কট প্রস্তাব জাতীয় স্তরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব নিয়ে এলেন, কিন্তু গোখলে-মালব্য প্রমুখের বাধায় সে-প্রস্তাব গ্রাহ্য হল না। তাঁরা বললেন বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতায় বয়কট রণকৌশল হিসেবে গ্রাহ্য হলেও সমগ্র ভারতে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত সাবধানপন্থী কংগ্রেসি নেতারা বয়কটকে আদৌ সমর্থন করতে পারছিলেন না। যাই হোক, এই অধিবেশনের শেষেই সভার ডেলিগেটদের তরফ

থেকে দাবি এল যে সরলা দেবী সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান শোনাতে হবে। সভাপতি গোখলে স্পষ্টতই দ্বিধাগ্রস্ত, মানতে চাইলেন না এই দাবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন তাঁকে ডাকতে এবং এক টুকরো কাগজে লিখে জানালেন যে গানটি যেন তিনি ছোটো করে গান, কারণ সময়সংক্ষেপ। সরলা দেবী গাইলেন 'বন্দে মাতরম্' এবং 'সপ্তকোটি কণ্ঠ'র জায়গায় 'ত্রিংশকোটি' শব্দটি ব্যবহার করলেন। কারণ এ গান যখন লিখেছিলেন বঙ্কিম ১৮৭৫ বা '৭৬-এ, তখন বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জনসংখ্যা ছিল সাত কোটির কাছাকাছি, ১৯০৫-এ সমগ্র ভারতবর্ষে তা তিরিশ কোটিতে পৌঁছেছিল। লক্ষণীয় যে সরলা দেবী সাত থেকে তিরিশ—এই আঙ্কিক পরিবর্তনটুকুই শুধু করেননি, বাংলার জাতীয়তাবাদী মন্ত্রটিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত করেছিলেন।

'বন্দে মাতরম্' গান এবং বঙ্কিমের সাহিত্যকৃতি কেবল বাংলা দেশে নয়, ইতিমধ্যে তার প্রসার ঘটেছে সমগ্র ভারতবর্ষে। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বঙ্কিমের রচনার অনুবাদ প্রকাশের তালিকা দাখিল করে। 'বন্দে মাতরম্' গানটির অনুবাদ হয়েছিল মারাঠি ও কানাড়ি ভাষায় ১৮৯৭-তে. ১৯০১-এ গুজরাটি, ১৯০৫-এ তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীয় অনুবাদ, ১৯০৬-এ হিন্দি, ১৯০৭-এ তেলুগু, ১৯০৯-এ মালয়ালাম ইত্যাদি। কোনো কোনো ভাষায় একাধিক অনুবাদ। শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের রচনায় ('ভারতীয় সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব' : *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৫) এই অনুবাদ-সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র পৌঁছে দিয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র পালও। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পর্বে তিনি তাঁর তেজোদৃপ্ত ভাষণ পৌঁছে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে। এরই পাশাপাশি উল্লেখ করতে হবে ১৯০৫-এর ২ ডিসেম্বরে *Indian Opinion* কাগজে দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনরত গান্ধিজির এই উক্তি :

> The song, it is said, has proved so popular that it has come to be our National Anthem...Just as we worship our mother, so is this song a passionate prayer of India.. (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৪)

'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি বিস্ফোরক চেহারা নিয়েছিল ১৯০৬-এর এপ্রিলে বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনির যুগে। সমগ্র জেলা উদ্‌বেলিত হয়ে উঠেছিল এই ধ্বনিতে। এবং সেটা এতটাই যে ছোটোলাট ব্যামফিল্ড ফুলারের আদেশে সভা-সমিতি-মিছিলে নিষিদ্ধ হল 'বন্দে মাতরম্'। এই মন্ত্র-উচ্চারণের জন্য আহত হলেন ছাত্র-যুবকেরা, গ্রেফতার হলেন এবং জরিমানা দিতে হল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবং

'বন্দে মাতরম্' স্লোগানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা না মানার জন্য শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়েছিল বরিশাল প্রাদেশিক কংগ্রেস। সেসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় হীরালাল দাশগুপ্তের দু-খণ্ডের বই *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*-এ। 'বন্দে মাতরম্'-কে কেন্দ্র করে এই পীড়ন-কাহিনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতে, বম্বের *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ২৮ এপ্রিল ১৯০৬-এ মন্তব্য করেছিল যে বরিশালের ঘটনা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দালনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯০৬-এর মার্চে সাভারকার বম্বের এক সাময়িকপত্রে 'বন্দে মাতরম্' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার অপরাধে এবং অন্যান্য বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের জন্য আন্দামানে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এপ্রিলে তিলককে জেলে পাঠানো হল 'বন্দে মাতরম্'-এর সমর্থনে রচনা লেখার জন্য। কলকাতা, দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে *বন্দেমাতরম্* নামে পত্রিকা বেরোতে শুরু করল। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি ১৯০৬-এর ৭ আগস্ট 'বন্দে মাতরম্' পতাকা তৈরি করে তুলে দিলেন সুরেন্দ্রনাথের হাতে। পতাকাটি লাল হলুদ ও সবুজ রঙে রঞ্জিত ছিল। ওপরে ছিল আটটি অর্ধস্ফুট পদ্ম, নীচে বাঁদিকে সূর্য, ডানদিকে বাঁকা চাঁদ। মাঝে দেবনাগরীতে লেখা 'বন্দে মাতরম্'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পতাকাই মাদাম কামা ১৯০৮-এ আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলনে উপস্থিত করেছিলেন।

১৯০৬-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন। সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরজি। সে-সভার শুরুতেও গাওয়া হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্'। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত লেখায় পাচ্ছি 'এ গান পরিবেশন করেছিল সম্ভবত নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীরা'। সতেরো দফা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই কংগ্রেস কিন্তু তাতে 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে না।

এত-কিছু সত্ত্বেও ১৯০৩-০৮-এর আন্দোলন এড়াতে পারেনি সাম্প্রদায়িকতার বিষ। 'বন্দে মাতরম্' ও *আনন্দমঠ* ছিল সেই বিদ্বেষচিন্তার এক বিশেষ সূত্র। সরকারি নথি উদ্ধার করে সব্যসাচী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, ১৯০৬-এর নভেম্বরে প্রবল উদ্দীপনার যুগে বরিশালে সাম্প্রদায়িক গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল কোনো-এক মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে হিন্দুদের মিছিলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেবার কারণে। তা ছাড়া সকলেরই জানা যে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়কটকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিরোধের ঘটনা খুব দ্রুত ছড়াচ্ছিল ১৯০৭ থেকে। ময়মনসিংহ থেকে বেরিয়েছিল *লাল ইস্তাহার* নামে এক পুস্তিকা যাতে লেখা হল, মুসলমানেরা যেন যোগ না দেন হিন্দুদের বিকৃত স্বদেশি কার্যকলাপে, আর কেউ যেন 'বন্দে মাতরম্' গান না করেন, ইত্যাদি।[৫] সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি স্বদেশি আন্দোলনকে সংহার করেছিল অনেকটাই আর এ কথাও ঠিক যে বয়কট আন্দোলনকে ঘিরেই সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপ বাড়ছিল বেশ ভালোরকম। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে আন্দোলন তেজি হবার বছরখানেক আগেই বঙ্কিমের *আনন্দমঠ* হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণ

হয়ে উঠেছিল। ১৯০৪-এ ময়মনসিংহে সুহৃদ সমিতির এক অনুষ্ঠানে সরলা দেবীর অভিজ্ঞতা তার প্রমাণ। সে-বছর প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন ছিল ময়মনসিংহে, বীরাষ্টমীব্রতী যুবকেরা স্থির করেছিলেন যে এইসঙ্গে সরলা দেবীকে সংবর্ধনা দেবেন এবং সে-সভায় অভিনীত হবে *আনন্দমঠ*। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা জানান যে অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ নিয়ে এসেছেন জনকয়েক মুসলমান বন্ধু, তাঁরা কেউ সম্মেলনে যোগ দেবেন না যদি *আনন্দমঠ* অভিনীত হয়। নেতারা সরলা দেবীকে অনুরোধ করেন অভিনয় বন্ধের জন্য ব্যবস্থা করতে, তিনি রাজি না হওয়ায় নেতারা পুলিশের সাহায্য নিয়ে নাটক বন্ধ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য *জীবনের ঝরাপাতা*, পৃ. ১৭১-৭৪)। ঘটনাটা সামান্য নয়, *আনন্দমঠ* বা 'বন্দে মাতরম্'-বিষয়ে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি লিগের জন্মের আগেও যে আদৌ অনুকূল ছিল না, এটা সে-কথাই প্রমাণ করে। ইতিহাসবিদদের মতে, 'বন্দে মাতরম্' বা *আনন্দমঠ*-এর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ঘটনা বঙ্গভঙ্গের পর্বে ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যাপার, বঙ্কিম রচনার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মুসলমানসমাজের তাত্ত্বিক বিরোধ জমাট বাঁধতে শুরু করেছিল বিশের দশকে। আর তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তিরিশের যুগে।

এই বৃত্তান্ত থেকে তাহলে বুঝতে পারছি যে, ফরাসি দেশে ফরাসি জাতীয় সংগীত মার্সাই যেমন রণক্ষেত্র থেকে উঠে এসেছিল জনগণের কাছে, ঠিক তেমনই 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সংগীত হিসেবে মানুষের কাছে গৃহীত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের পর্বে। Nationalist War-cry হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সংখ্যালঘুর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও হিন্দু জনসমাজের কাছে আদৃত হয়েছে খুব। কিন্তু জাতীয় সংগীত হিসেবে এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এসেছে অনেক পরে ১৯৩৭-এ। আর এ কথাও মনে রাখা জরুরি যে, সে-আমলে জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ; ১৯০৬-এও ২৬, ২৭, ২৮ তারিখে সে-সম্মেলন হয়েছিল, তাহলে ৭ সেপ্টেম্বর তারিখটি এল কোথা থেকে—এ এক বিরাট রহস্য।

প্রসঙ্গ : 'বন্দে মাতরম্' এবং জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'

অমলেন্দু দত্ত

'সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্বিত, কিছু কৌতূহলী।... ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাক্ময়, প্রিয় সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্তার জন্য বড়ো ব্যস্ত। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন:

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম।

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না।—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন :

"শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানিনা—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,— স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।'

এরপর ভবানন্দ সম্পূর্ণ গানটিই গেয়েছিলেন।

অনুমান করতে পারি, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাসটি সকল বাংলাভাষীই পড়েছেন। এই উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদ থেকে উপরের উদ্ধৃত অংশটিও হয়তো বারবারই পড়েছেন। কারণ গত ১২৫ বছর ধরে 'বন্দে মাতরম্' গানটি বাংলা তথা ভারতের প্রায় সব রাজ্যের মানুষের কাছেই কেবল পরিচিত—তাই নয়, এই গানকে কণ্ঠে নিয়ে কিংবা 'বন্দে মাতরম্' এই ললিত শব্দটিকে সশ্রদ্ধ উচ্চারণে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে মনপ্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। এখনো কয়েকটি রাজনৈতিক দল 'বন্দে মাতরম্' শব্দবন্ধটিকে শ্লোগান রূপে ব্যবহার করে থাকেন। সে যুগে অহিংস এবং সহিংস সকল স্বদেশানুরাগীই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও সংগীতকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তথা স্বদেশের মুক্তি কামনায় সংগ্রাম আন্দোলনে ব্রতী হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাই এই গানটির তাৎপর্য বিশেষভাবেই স্বীকৃত। এই গানটিই যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তদান ও আত্মদানের প্রতীক হয়ে আছে।

সে সময়ে দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক মঞ্চ সারা ভারত কংগ্রেস দলও যে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের প্রশ্নে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশনে এই গানটিকেই গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল সঙ্গতভাবেই। জাতীয় কংগ্রেসের সভা সমিতি ও অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি ছাড়াও বিভিন্ন দিনে অন্যান্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীতও গাওয়া হত। একবার টাউন হলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজের আরোপিত সুরে 'বন্দে মাতরম্' গেয়েছিলেন। একজন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীর কাছে পাওয়া তথ্যে জানা যায় তিনি দেশ রাগে গানটি স্বকণ্ঠে পরিবেশন করেন। অন্যান্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মধ্যে থাকত 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' এবং 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে,' 'ভারততীর্থ' কিংবা সরলা দেবী রচিত 'অতীত গৌরব কাহিনি' প্রভৃতি।

সকলেই জানেন কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে দুটি মতবাদ পাশাপাশি বিরাজ করত—এবং একেক সময় প্রাধান্য লাভ করত দুইয়ের মধ্যে একটি। সাধারণ্যে এঁরা চিহ্নিত ছিলেন 'নরমপন্থী' (moderate) এবং চরমপন্থী (extremist) রূপে। খোলসা করে বলতে গেলে বলা যায় প্রবীণরা ছিলেন নরমপন্থী এবং নবীনরা পরিচিত ছিলেন চরমপন্থী রূপে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশন হয় কলকাতায়। তখন কংগ্রেসে চরমপন্থীদেরই প্রতিপত্তি। অধিবেশনের প্রথম দিনে (২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭) চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মতো 'বন্দে মাতরম্' গান দিয়েই শুরু হয় তবে ওই দিন 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটিও গাওয়া হয়। দ্বিতীয় দিনে গাওয়া হয় সরলা দেবীর 'অতীত গৌরব কাহিনি' এবং তৃতীয় দিনে আবার রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির

সভায় সংগীত পরিবেশন সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার বয়ানে ছিল :

> Taking all things into consideration, therefore, the committee recommends that wherever the 'Bande Mataram' is sung at national gatherings only the first two stanzas should be sung, with perfect freedom to the organisers to sing any other song of an unobjectionable character, in addition to or in place of the 'Bande Mataram song.

অর্থাৎ 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুটি স্তবক মাত্র গাওয়া হবে এবং উদ্যোক্তারা চাইলে 'বন্দে মাতরম্' ছাড়াও তদতিরিক্ত কিংবা তার বদলে অন্য কোনও গানও গাওয়া যাবে— তবে দেখতে হবে তার মধ্যে যেন আপত্তিকর কিছু না থাকে। 'বন্দে মাতরম্'-এ প্রথম দুটি স্তবক গাওয়ার কথা বিশেষভাবে বলার উদ্দেশ্য, মনে হয়, কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যদের উক্ত গানটির কোনো কোনো অংশ সম্পর্কে আপত্তি ছিল বলেই এই ব্যবস্থা। উপরন্তু অন্য গান সম্পর্কেও যেন তা 'unobjectionable character'-এর হয়— এরূপ সাবধানবাণীও উচ্চারিত।

ওই একই ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আরও প্রস্তাব গৃহীত হয় যে 'বন্দে মাতরম্'-এর অতিরিক্ত কিংবা তার বদলে অন্য যে গান গাওয়া হবে তা নির্বাচন করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি উপসমিতি (sub-committee) করা হবে। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে ওই সাবকমিটি গঠিত হল। গান নির্বাচনের ব্যাপারে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শ গ্রহণ করার কথাও বলা হয়েছে। ওই একই সময়ে কলকাতাতে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশন ছিল—সেখানেই ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত করিয়ে নেওয়া হয়।

বেশ বোঝা যাচ্ছে 'বন্দে মাতরম্' নব্যপন্থীদের 'প্রথম পছন্দের' গান রূপে মর্যাদা হারিয়েছে—কিন্তু সম্পূর্ণ পরিত্যক্তও হয়নি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র উভয়েরই পছন্দ রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি। পরবর্তীকালে এই গানটিকেই ভারতের 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে জার্মানিতে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন করার সময়ে এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদহিন্দ সরকার গঠনকালেও 'জনগণমন'-এর হিন্দিসংস্করণটিকেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ ও মর্যাদা দান করেছিলেন।

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুটি স্তবক গাওয়া হবে—এই মর্মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'বন্দে মাতরম্' গানটিকে খণ্ডিত করার প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্রেরও সায় ছিল। তাঁর অভিমত ছিল :

> The congress cannot consider anything from the point of view of Bengal

> or any particular community alone—to-day all problems must be considered from an all-India view-point.' He also had no objection to accepting any other songs as the National Anthem if that song were found to be more suitable and appropriate in tune and idea than 'Vande Mataram'.

সুভাষচন্দ্রের কথায় পরোক্ষভাবে 'বন্দে মাতরম্' গান সম্পর্কে কোনো মহলের আপত্তি তথা এর সুর সম্পর্কেও বলা হয়েছে। একথা সত্য যে মুসলিম সদস্যগণের গানটির কোনো কোনো অংশে আপত্তি যেমন ছিল, তেমনি এই গানের সুরেও সহজতার বদলে কিছু কাঠিন্যও ছিল, যার ফলে খুব পারদর্শী শিল্পী ছাড়া এ গান সর্বসাধারণের গাইবার উপযুক্ত নয়। আরও একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য—'বন্দে মাতরম্' ব্যান্ডে বাজানোর পক্ষেও কঠিন অথচ জাতীয় সঙ্গীত-এর সুর এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সেনাবাহিনীর ব্যান্ড-এ সহজেই তোলা যায় এবং বাজানো সম্ভব হয়—এটা আবশ্যিক-এর মধ্যেই গণ্য। 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি এই প্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গ্রাহ্য।

স্বাধীনতালাভের (১৫ আগস্ট,. ১৯৪৭) পর গণপরিষদ অর্থাৎ Constitunent Assembly গঠিত হয় (উল্লেখ্য এই পরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত দিয়ে এবং শেষ হয় 'জনগণমন' দিয়ে)। Constituent Assembly থেকেই একটি কমিটি গঠন করা হয়—যে কমিটি জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের সর্বশেষ প্রস্তাব (recommendations about the final selection of a National Anthem) দেবে। কিন্তু আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয় যে President স্বয়ং জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ে সিদ্ধান্ত Assembly-তে ঘোষণা করবেন। তদনুসারে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি constitution বা গঠনতন্ত্রে সাক্ষর দানের সময় Constitution Hall-এ President ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তার ভাষণের শুরুতেই ঘোষণা করলেন : একটা বিষয় অর্থাৎ জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা বাকি রয়ে গেছে। এক সময়ে ভাবা হয়েছিল যে ব্যাপারটা House-এ প্রস্তাব আকারে উপস্থাপিত করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখা গেল তার চেয়ে জাতীয় সঙ্গীত ব্যাপারে আমিই যেন একটি বিবৃতি দিই। আমি সেই বিবৃতি এখন দিচ্ছি :

> The composition consisting of the words and music known as Janaganamana is the National Anthem of India subject to such alteration in the words as Government may authorise as occasion arises ; and the song Vande Mataram which has played a historic part in the struggle for Indian freedom shall be honoured equally with Janaganamana and shall have equal status with it.
>
> (Constituent Assembly Debate, XII. ii)

অর্থাৎ শব্দ ও সঙ্গীতে উৎকর্ষের বিচারে 'জনগণমন' হবে জাতীয় সঙ্গীত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্য 'বন্দে মাতরম্' লাভ করবে 'জনগণমন'-এর সঙ্গে সমমর্যাদা।

অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বুঝি দুটি—'জনগণমন' এবং 'বন্দে মাতরম্'। তাদের এই ভ্রান্তির হয়তো নিরসন হবে। বহু ভাষাভাষী দেশের মধ্যে বাঙালি কবি ও লেখকের রচিত সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হওয়ায় (তথা একটিকে জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদায় বিবেচিত করায়) আমাদের স্বাভাবিকভাবেই গর্ব ও আনন্দের কারণ আছে।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' (অর্থাৎ 'ভারতবিধাতা' শীর্ষক কবিতা) সম্পর্কে এক সময়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াবার যে উদ্দেশ্যমূলক প্রয়াস ছিল পরবর্তীকালে তা হয়তো অনেকাংশেই অসত্য প্রমাণিত। তথাপি কারোর কারোর মনে এখনও সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দেয়। এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন বলে এখানে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হল।

'ভারত বিধাতা' কবিতা/সঙ্গীত ঠিক কবে এবং কোথায় রচিত হয়েছিল তা জানা যায় না, কেননা রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রশান্ত পাল লিখেছেন, 'গানটিকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে রবীন্দ্রবিরোধীরা প্রচার করেন, গানটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে রচিত। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র পুলিনবিহারী সেন গানটি রচনার উপলক্ষ্য জানতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখলে তিনি 20 Nov. 1937 (রবি ৪ অগ্র, ১৩৪৪) তাঁকে লেখেন :

> সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথী, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথ পরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক বুদ্ধির অভাব ছিল না।

গানটি গাওয়া হয়েছিল ২৭ ডিসেম্বর ১৯১১ কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের

২৬তম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সমবেতকণ্ঠে।

পঞ্চম জর্জ কলকাতায় আসেন ৩০ ডিসেম্বর, শনিবার ১৯১১। ৫ জানুয়ারি শুক্রবার ১৯১২ ময়দানে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। ৮ জানুয়ারি ১৯১২ দুপুরে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত প্রশান্ত পাল উল্লেখ করেছেন যে, 'কংগ্রেসের উক্ত দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সমবেতকণ্ঠে 'জনগণমন' উদ্বোধনী সংগীতের পর রাজদম্পতিকে স্বাগত জানিয়ে ও বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা করার জন্য পঞ্চম জর্জের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দুটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয় এবং তারপরে 'A Hindi song paying heartfelt homage to their Majesties was sung by the Bengali boys and girls [The Bengalee, 28 Dec.] এই তথ্যই বিকৃতভাবে The Englishman ও The Statesman পত্রিকায় ও রয়টারে টেলিগ্রাম অবলম্বনে বিলেতের India পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'জনগণমন' রাজপ্রশস্তি উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল, এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের জন্য এই তিনটি পত্রিকাই দায়ী। কলকাতার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিকৃত সংবাদগুলির প্রতি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তিনি মাঘ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে 'ভারতবিধাতা/(ব্রহ্ম সঙ্গীত) (পৃঃ ২১৯) শিরোনামায় গানটি ছাপিয়ে তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। কয়েকদিন পরে ১১ মাঘ (বৃহ. ২৫ জানুযারি) গানটি মাঘোৎসবে ব্রহ্মসঙ্গীত হিসবেই গীত হয়"

সঞ্চয়িতা-য় এটি সংযোজন রূপে সংকলিত এবং রচনার তারিখঃ ১৩১৮' রূপে মুদ্রিত।

তথ্যপঞ্জী :

১. *আনন্দমঠ*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। *বঙ্কিমরচনাবলি*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, একাদশ প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ (যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত ভূমিকা সংবলিত)

২. *India's National Anthem*, Probodh Chandra Sen, Visva Bharati Calcutta - 1972

৩. *রবিজীবনী*, ষষ্ঠখণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১৩৯৯

৪. *সঞ্চয়িতা*, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৬ আশ্বিন পৃ. ৭২৫-৭২৬

জাতীয় সংগীত বনাম জাতীয় সংগীত

সুজয় বাগচী

প্রবন্ধটির নাম অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হবে। যদি ইংরেজিতে রূপান্তরিত করে বলা হয় National Anthem VS National Song কিংবা National Song VS National Anthem তাহলে নামটি অনেকের কাছে সহজবোধ্য হত। আমাদের জাতীয় সংগীত কোনটি এ প্রশ্নের উত্তরে 'বন্দে মাতরম্' এবং 'জনগণমন' দুটির নামই শোনা যাবে। পরে সূত্রের ভাষ্যের মত যোগ করা হবে 'জনগণমন' National Anthem এবং 'বন্দে মাতরম্' National Song। তাহলে দুটির মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কেন?

Anthem শব্দটির অভিধানগত অর্থ 'Choral Composition for church use, Song of Praise esp. for nation' আর Song এর অর্থ 'Words set to music for vocal singing'। শব্দের খোলস ছাড়িয়ে যদি অর্থটাকে বিস্তৃত করা যায়, তবে অর্থটা দাঁড়ায় Anthem কোন্ বিশেষ অনুষ্ঠানে, বিশেষত পবিত্র বা সম্মানীয় অনুষ্ঠানে গেয়, আর Song শুধুই সুর সংযোজিত শব্দ সমষ্টি। দুটি সংগীতই দেশের প্রশস্তিমূলক। তবুও এদের কেন্দ্র করে এক সময়ে বিতর্কের যে ঝড় উঠেছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন দেশের একাধিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবী। স্বাধীনতার অর্ধশত বার্ষিকীতে এবং নেতাজির জন্ম শতবার্ষিকীতে এই বিতর্কের কথা স্মরণ করা যেতে পারে এই জন্যই যে এই বিতর্কে সুভাষচন্দ্রের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। কারণ বিতর্ক যখন তুঙ্গে তখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি (তখন বলা হত রাষ্ট্রপতি)। স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাও। যদিও রবীন্দ্রনাথ তখন জীবন-সায়াহ্নে, তবুও রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতের সাংস্কৃতিক গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। বিশেষত প্রথম যে অবস্থান নিয়েছিলেন, আমৃত্যু তা থেকে তিনি সরে আসেন নি। সন্ধেবেলার প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সকালবেলায় সলতে পাকানোর কাহিনি থাকে, তেমনি 'বন্দে মাতরম্'-জনগণমনের বিতর্কের ইতিহাস আলোচনা করার আগে এই দুটি সংগীতের সংগীত রচনার ইতিহাস বলা প্রয়োজন।

২

অনেকেরই ধারণা 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠ* উপন্যাসের জন্য রচনা করেছিলেন। বাস্তব ঘটনা তা নয়। *আনন্দ মঠ* রচনার বেশ কয়েক বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র সংগীতটি রচনা করেন। *আনন্দমঠ বঙ্গদর্শন*-এ ১৮৮০ সালের মার্চ-এপ্রিল থেকে ১৮৮২ সালের মে-জুন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বন্দে মাতরম্' রচিত হয় ১৮৭৫ সালে। মূলত *বঙ্গদর্শন*-এর পৃষ্ঠা-পূরণের জন্য সংগীতটি রচিত হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত সেভাবে এটি ছাপা হয়নি। সংগীতটি যে বাঙালির জাতীয়তাবোধের উন্মেষকালে এবং পরবর্তীকালে জনমানসে বিরাটপ্রভাব বিস্তার করবে এমন একটি আশা এবং বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। এ তথ্য জানা যায়, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে। কার্যত সেটিই ঘটেছিল। সে ইতিহাস আজ সকলেরই জানা আছে। সংগীতটিতে দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে দুর্গার সঙ্গে তাকে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সমসাময়িককালে রচিত *কমলাকান্তের দপ্তর*-এর 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে, দুটির ভাবগত সাদৃশ্যের জন্য। *আনন্দমঠ*-এ সংগীতটি পরে সংযোজিত।

পরবর্তীকালে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। স্বাধীনতাকামী এবং স্বাধীনতাযোদ্ধাদের মূলমন্ত্রই হয়ে ওঠে 'বন্দে মাতরম্'। কংগ্রেস তখন সকল স্বাধীনতাকামী এবং যোদ্ধাদের সাধারণ প্ল্যাটফর্ম। কংগ্রেসের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে গানটি গাওয়া হত। কিন্তু রচয়িতার ভাবকল্পনার মধ্যেই ছিল সম্প্রদায় বিশেষের আপত্তি এবং বিতর্কের অঙ্কুর, যা পরে মহীরুহের রূপ ধারণ করেছিল। সংগীতটির মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রভাব রয়েছে, এবং *আনন্দমঠ*-এ মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করা হয়েছে, এই অভিযোগে বাংলার মুসলিম সমাজের এক অংশ সংগীতটির বিরোধিতা করতে থাকেন। এই বিরোধিতাই পরে বিতর্কের রূপ ধারণ করে।

'বন্দে মাতরম্' রচিত হওয়ার ছত্রিশ বৎসর পরে ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'জনগণমন'। বহুকাল পরে সুসংগঠিত ভাবে একটি প্রচার চালানো হয় যে ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চমজর্জ যখন দিল্লির দরবার (১২ ডিসেম্বর, ১৯১১) উপলক্ষ্যে ভারতে আসেন তখন সম্রাটের স্তুতি করে রবীন্দ্রনাথ সংগীতটি রচনা করেন। বস্তুত দুটি ঘটনা সমাপতন মাত্র এবং এ দুটির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কও রয়েছে। একথা ঠিক সিমলার একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী সম্রাটের ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে সম্রাটের স্তুতিবাচক একটি সঙ্গীত রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে রাজকর্মচারীটির অনুরোধ রক্ষা করেননি তা স্পষ্ট বোঝা যায় ১২/১১/৩৭ তারিখে পুলিনবিহারী সেনকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে :

> সিমলার সেই রাজকর্মচারীর অনুরোধ শুনে আশ্চর্য হয়েছিলুম। এই বিষয়ের সঙ্গে মনে উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারত-ভাগ্য বিধাতার জয় ঘোষণা করেছি। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চির-সারথি, যিনি অন্তর্যামী পথ পরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্য-রথচালক যে পঞ্চম জর্জ বা ষষ্ঠজর্জ হতে পারেন না, সেকথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেন না তার ভক্তি প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না। এ গান কংগ্রেসের জন্য লেখা হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ গানটির 'মর্ণি সঙ্গ অফ ইন্ডিয়া' নাম দিয়ে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। গানটি কংগ্রেসের জন্য লেখা না হলেও, ১৯১১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে গানটি গাওয়া হয়েছিল। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী (রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী) এবং অমলা দাশ (চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী)। পরেও কংগ্রেস অধিবেশনে গানটি গাওয়া হয়েছে। 'বন্দে মাতরম্' এবং 'জনগণমন' এ দুটির মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় এ নিয়ে অল্প-বিস্তর বিতর্কের সূত্রপাত তখন থেকেই। আবেগাপ্লুত স্বাধীনতাকামী এবং বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে গ্রহণীয় বলে মনে করেন (সাধারণত বন্দে মাতরমের প্রথম দুটি স্তবকই গাওয়া হত)। তার সঙ্গে মুসলিম সমাজের এক অংশের বিরোধিতা মিলিত হয়ে অবস্থা আরও জটিল করে তোলে।

৩

'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি সর্বপ্রথমে গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গানটির প্রথম দুটি স্তবকে সুর সংযোগ করে ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তিনি সংগীতটি পরিবেশন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশিত সুরে এবং তালে ('মল্লার' রাগ, 'কাওয়ালী' তাল) তিনি গানটি গেয়েছিলেন কি না তা জানা নেই। প্রথম গাইলেও সমগ্র সংগীতটির অন্তর্নিহিত ভাব রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিনই খুব আকর্ষণ করেনি। তার অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মপরিবেশের প্রভাব। বঙ্গভঙ্গের যুগে রবীন্দ্রনাথ যে সব দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন তার কিছু গানের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম'-এর ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ আর এ জাতীয় দেশাত্মবোধক গান রচনা করেননি। কারণ কবিমানসে বিশ্বমানবিকতা এবং আন্তর্জাতিকতা বোধের ক্রম-উন্মেষ। 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা যত বাড়তে থাকে মুসলিম সমাজের এক অংশের উষ্মাও তত বাড়তে থাকে। অবশ্য রেজাউল করিম প্রমুখ কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী এ বিষয়ে মুক্তমনা ছিলেন। কিন্তু সেটি সে যুগে ব্যতিক্রম মাত্র। অসহযোগ আন্দোলনও রবীন্দ্রনাথের

সমর্থন পায়নি। এ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব খুব স্পষ্ট। চিঠিটির তারিখ ১৮ কার্তিক, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ :

> দেশের কর্তা ব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসছে বাঁশি ছেড়ে লাঠি ধর। যদি তা করি কর্তারা খুশি হবেন। কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন, কর্তাদের অনেক উপরে। তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্তারা বলবেন, তিনি আবার কে? আছে তো এক বন্দে মাতরম। তাঁদের গড় করে আমায় বলতে হচ্ছে আমায় বন্দে মাতরম ভুলিয়েছেন ঐ তিনি।

এ চিঠি লেখার দশ বৎসর পরে সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরমের পরিবর্তে 'বন্দে মাতরম্' স্লোগানের আবেদন জানান। সংবাদটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালে ২৬ বৈশাখের আনন্দবাজারে। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' বির্তক তখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত স্লোগান জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু এই বির্তক থেকেও রবীন্দ্রনাথ দূরে থাকতে পারেননি।

৪

বন্দে মাতরম বির্তক তীব্রতর হয়ে উঠে ১৯৩৭ সাল নাগাদ। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে মুসলমানদের জন্য (এবং তার সাথে তপশিলি হিন্দুদের জন্যও) পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরিণতিতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা আরও বেড়ে যায়। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সংগীত হবে, না জনগণমন হবে, সে প্রশ্নটি বড়ো ছিল তা নয়। তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন ছিল সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হবে, না আংশিক গাওয়া হবে—যা সকল ধর্মাবলম্বীদের কাছে গ্রহণীয় অর্থাৎ প্রথম দুটি স্তবক। ১৯৩৭-৩৯ সালে এই বিতর্ক তুঙ্গে উঠে। মনে রাখা দরকার এই সময়ে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৩৮ সাল), রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এ দিকে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দীনেশ সেন, রায়বাহাদুর খগেন্দ্র নাথ মিত্র, যতীন্দ্র মোহন বাগচী এবং জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সমূহ সমগ্র বন্দে মাতরম সংগীতটি গ্রহণীয় বলে বিতর্কে নেমে পড়েন। এঁদের নেতা ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। গোঁড়া ব্রাহ্ম হয়েও তিনি জনসাধারণের আবেগের অংশীদার হলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের অবস্থান সম্পর্কে অবিচলিত রইলেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর সংখ্যার বিশ্বভারতী পত্রিকায় কৃষ্ণ কৃপালনী মতপ্রকাশ করেন 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সঙ্গতি নেই। রবীন্দ্রনাথেরও এই মনোভাব ছিল এটা স্পষ্ট। তবুও এই বিতর্কে যাতে বিশ্বভারতী

জড়িয়ে না পড়ে সেই জন্য তিনি মত প্রকাশ করেন যে, প্রবন্ধটি কৃষ্ণ কৃপালনীর ব্যক্তিগত মত মাত্র। নান্দনিক দিক থেকে বিচার করে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, যেহেতু আনন্দ মঠ একটি উপন্যাস, সেই হেতু সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' গানটি তাঁর কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুভাষচন্দ্রকে ১৯/১০/৩৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> বালাদেশের একদল মুসলমানের মধ্যে যখন অযথা গোঁড়ামির জেদ দেখতে পাই তখন সেটা অসহ্য বোধ হয়। তাদের অনুকরণ করে আমরা যখন অন্যায় আবদার নিয়ে জেদ করি তখন সেটা লজ্জার বিষয় হয়ে উঠে। উভয় পক্ষের ক্ষোভ যেখানে প্রবল, সেখানে অপক্ষপাত বিচারের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রীয় সাধানায় আমাদের শান্তি চাই, ঐক্য চাই, শুভবুদ্ধি চাই। কোন পক্ষের জেদকে দুর্দম করে হার জিতের অন্তহীন প্রতিযোগিতা চাই নে।

সারা দেশ জুড়ে যখন বিতর্কের ঝড় চলছে, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি তখন নীরব থাকতে পারে না। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্র, জহরলাল, মৌলানা আজাদ, আচার্য নরেন্দ্রদেব প্রমুখকে নিয়ে একটি সাবকমিটি গঠন করে। সাবকমিটিকে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নিতে অনুরোধ করা হয়। অক্টোবরের শেষের দিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুটি স্তবক কংগ্রেসের সভাসমিতিতে গাওয়া হবে। কারণ এই অংশ সকলেরই গ্রহণ-যোগ্য। দেশব্যাপী বিক্ষোভের পরোয়া না করে রবীন্দ্রনাথ ৩০/১০/৩৭ তারিখে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। আনন্দ বাজার পত্রিকায় ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলা হয় এটি 'না গ্রহণ, না বর্জন' নীতির এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য একটি সম্প্রদায় বিশেষের তুষ্টি সাধন। সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' পক্ষীয়রা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি নিয়ে কলকাতায় মিছিল বের করেন। জহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র, দুজনেই তখন কলকাতায়, কিন্তু দুজনেই ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে অটল।

এই সময়ে মাদ্রাজ থেকে ডঃ জে. এইচ কুইজিন (Dr. J. H. Couisine) ৩/১১/৩৭ তারিখের মাদ্রাজ মেলে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটির বক্তব্যে বোঝা যায় 'জনগণমন'ও এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সমর্থন করেও তিনি 'জনগণমন' সম্পর্কে মতপ্রকাশ করেন 'জনগণমনের বৈশিষ্ট্য হল যে সুর ও ছন্দের মিশ্রনে এ গানটিকে দৃঢ় কণ্ঠে এক হয়ে গাওয়া যায়। অথচ 'বন্দে মাতরম্' কখনোই বহু কণ্ঠে এক সঙ্গে গাওয়া যায় না। এঁর ওঠানামা একক কণ্ঠেই সম্ভব।' চিঠিটি প্রায় ভীমরুলের চাকে ঘা দেওয়ার মতোই হয়ে দাঁড়াল। সুভাষ চন্দ্রের সমর্থন লাভের আশায় ১৬/১১/৩৭ তারিখে সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' সমর্থক সাহিত্যিকদের এক সভায় সুভাষ বসুকে প্রধান

অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। সাহিত্যিকদের সমস্ত আশাকে ধূলিসাৎ করে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করলেন। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯৩৮ সালের ২৯ থেকে ৩১ জানুয়ারি বিষ্ণুপুরে যে প্রাদেশিক সম্মেলন হয় সেখানে সুভাষচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে কোনো প্রস্তাবই তুলতে দিলেন না। যাঁরা আশা করেছিলেন হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত পালটে দেবেন তাঁদের নিরাশ হতে হল। ওয়ার্কিং কমিটির যৌথ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি। বছর দুয়েক পরে যতীন্দ্র মোহন বাগচীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত সাহিত্যিকদের এক মজলিশে (১১/৮/৩৯) প্রশ্নোত্তরে সুভাষচন্দ্র জানান যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। তিনি স্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেন যে বাংলার দিক থেকে বা কোনো ধর্মের দিক থেকে কোনো বিষয়ে বিচার কংগ্রেস করতে পারে না, সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোন থেকেই যে কোনো সমস্যাকে বিচার করতে হবে। 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের প্রথম দুটি স্তবককে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করায় সংগীতটির মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৫

এর পরই শুরু হয় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসে এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়। যুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক দর কষাকষি, মন্বন্তর। উত্তাল স্বাধীনতা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, ইত্যাদির মধ্যে জাতীয় সংগীত বিতর্কে স্তিমিত ভাব এল। ইতিমধ্যে জানা গেল আজাদহিন্দ সরকার জাতীয় সংগীত হিসেবে যেটি গ্রহণ করেছে তার সুর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথাও জনগণমনেরই। তবে আজাদ হিন্দ এটিকে Anthem ঘোষণা করেনি। নাম দেওয়া হয়েছিল Azad Hind Fauj Anthem। আজাদ হিন্দ সরকার ছিল একটি অস্থায়ী সরকার যার লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করা। যে-কোনো বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, ভারতবর্ষ বিদেশি শাসনমুক্ত হলে যে স্থায়ী সরকার হবে তারা। সে দিক দিয়ে বিচার করলে Azad Hind Fauj anthem নাম দেওয়া নিঃসন্দেহ সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তার সঙ্গে প্রমাণ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে যাতে সাম্প্রদয়িক অনৈক্য ঢোকবার সামান্যতম সুযোগও না পায় এ বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা ও দূরদৃষ্টি।

৬

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সংগীত (National Anthem) নির্বাচন করার প্রশ্নটি জরুরি হয়ে দাঁড়াল। এরপর বন্দে মাতরম এবং জনগণমন মুখোমুখি। সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিদের সুপারিশ অনুযায়ী স্বাধীনতা লাভের পরই জনগণমনকেই সাময়িক ভাবে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু বিতর্ক চলতেই থাকে। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে জহরলাল জনগণমনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন তাতে ডঃ জে. এইচ কুইজিনের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'দেখা গেছে যে জনগণমন'র অর্কেস্ট্রেশন অনেক সাবলীল' অবশ্য এর সঙ্গে তিনি এ-ও ঘোষণা করেন যে 'জনগণমন ও বন্দে মাতরম কে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক চলছে তা দুর্ভাগ্যজনক। নিঃসন্দেহে, 'বন্দে মাতরম্'-এর অবদান অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসে যে স্থান 'বন্দে মাতরম্' গানটির সেখান থেকে কেউ তাকে সরাতে পারবে না।' গণপরিষদে বিতর্ক চলে। কিন্তু সিদ্ধান্ত কী হবে সেটা জহরলালের বক্তব্যেই প্রতিফলিত। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে শেষপর্যন্ত জনগণমনকেই National anthem বলে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্'-এর অবদান এবং দেশের 'সেন্টিমেন্ট' এর কথা মনে রেখে তাকে একই সম্মান বা মর্যাদা দেওয়া হয়। প্রথমে বলা হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্'-এর হবে 'Same honoured place' কিন্তু পরে সংশোধন করে বলা হয় 'Same Status'। অবশ্য জনগণমনকে জাতীয় সংগীত বলে গ্রহণ করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রস্তাব পাস করানো হয়নি। প্রতিনিধিদের আলোচনা এবং বিতর্ককে একীভূত (Sum up) করে সভাপতি ড: রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি পরিষদে ঘোষণা করেন :

> জনগণমন নামে যে সেটা আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম বলে স্বীকৃত হবে। কোনো সময় যদি সরকারের মনে হয় যে এর কথার কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন তাহলে সেটা স্বীকৃত হবে। বন্দে মাতরম গানটির, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে তাই জনগণমন যে স্বীকৃতি পাচ্ছে তা এই গানটিকেও দেওয়া হবে। আশাকরি সকলেই এই প্রস্তাবে খুশি হবেন।

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের ঘোষণা যবনিকা টেনে দিয়ে একটি দীর্ঘ বিতর্কের অবসান ঘটাল। সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হল 'National Anthem'-কে সম্মান করা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য-কর্তব্য।

কীর্তনখোলা তীরে 'বন্দে মাতরম্' সংকীর্তন

ড. পবিত্রকুমার গুপ্ত

বাংলার সমাজ বিপ্লবের প্রথম মহানায়ক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্য দ্বিতীয়বার পুরীধামে যান। সঙ্গী তাঁর নিত্যানন্দ। চৈতন্য আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন নিত্যানন্দ। নীলাচল থেকে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে তাঁর প্রেমধর্ম ও সাম্যের বাণী প্রচারের জন্য নবদ্বীপ পাঠান। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় শ্রীচেতন্যের নির্দেশ :

এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও।।
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন।

দেশবাসীকে শ্রীচৈতন্য একটি মহামন্ত্র প্রদান করেন। মহামন্ত্রটি হল হরিনাম :

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ   কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম   রাম রাম হরে হরে।

আড়াইশ' বছর যেতে না যেতে বাঙালির জীবনপ্রবাহে অনিবার্যরূপে ভাঁটার টান দেখা গেল। তখন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ। বাংলার সিংহাসনে এক তরুণ। আলিবর্দির নীতি। রাজনীতি এবং প্রশাসনে একেবারে অনভিজ্ঞ। দেশের অর্থনীতি চরম সংকটের মুখে। রাজনীতি অস্থির। প্রশাসন অভিজ্ঞ শাসকের অভাবে পঙ্গু।

ধূর্ত ক্লাইভের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার মসনদের দিকে তাকিয়ে। লন্ডনের চেয়ে অনেক উন্নত, সমৃদ্ধ, জাঁকজমকপূর্ণ মুরশিদাবাদ যেনতেন প্রকারেণ দখল করে নিতে হবে। সিরাজের মন্ত্রী, সেনাপতি সহ দেশের অভিজাতবর্গ অর্থের বিনিময়ে বিদেশি বণিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। উদ্দেশ্য সিরাজকে অপসারণ করা। এর চেয়ে অন্ধকার

জাতির জীবনে আর কী হতে পারে? জীবনের কোনো লক্ষণই নেই জাতির মধ্যে। পলাশির আম্রকাননে স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গেল।

জাতীয় জীবনের সেই চরম দুর্দিনে এক মাতৃসাধক জাতির গ্লানি ও বেদনায় কেঁদে উঠলেন। জীবন-নিঙড়ানো যন্ত্রণায় গাইলেন :

মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পড়ে,
আবাদ করলে ফলত সোনা।।
কালী নামে দেও রে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
(মন রে আমার কৃষিকাজ জান না।)
সে মুক্ত কেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।
অদ্য শত-শতান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে না।
(মন রে আমার কৃষিকাজ জান না।)
আছে একতারে মন এই বেলা,
তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু বীজ রোপণ করে, বীজ
ভক্তি বারি তায় সেঁচ না।।
(মন রে আমার কৃষিকাজ জান না।)

ভারতের পতিত মানব জমিনে আবাদ করতে আবির্ভূত হলেন ভারত পথিক রামমোহন রায়। অখণ্ড ভারত চেতনা, জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার বার্তা তিনিই প্রথম বহন করে আনেন। বহু মনীষীর দীর্ঘকালের নিরলস তপস্যার ফলে ভারতবাসী হিসেবে আমরা জেগে উঠলাম। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ভারতবাসীকে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধিকারে দীক্ষা দেয়। পতিত মানব জমিন সোনার ফসলে ভরে গেল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের শেখালেন, 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই মা।'

অরবিন্দ যথার্থই বলেছেন যে জাতিকে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃমূর্তি দান করেছেন। বঙ্কিম প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দানই হল দেশমাতৃকার মূর্তি।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের একটি বাক্যই যথেষ্ট :

'রাজমোহন্স্ ওয়াইফ-এর সৃষ্টিকর্তা অন্তিমে একেবারে স্বদেশি হইয়া গিয়াছেন।'

বঙ্কিম মাতৃভূমি স্বদেশজননীকে এমনভাবে দেশবাসীর মানস নেত্রে স্বর্গীয় মাতৃত্বে, শক্তিতে, বাৎসল্যে, সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন যে পরাধীন জাতি শৃঙ্খলিতা জননীকে উদ্ধারের জন্য প্রাণ বিসর্জনের তাগিদ অনুভব করে।

তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

'সকল ধর্মের ওপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।'

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠ*-এর মধ্য দিয়ে জাতিকে মাতৃভক্তিতে দীক্ষা দিয়েছেন।

'আমার মনস্কাম কী সিদ্ধ হইবে না?'

'এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল।

তখন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কী?'

প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।'

প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

'আর কী আছে? আর কী দিব?'

তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি'।

ভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবন্দনা জাতির মন্ত্র। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সঙ্গে কেবলমাত্র ফরাসি জাতীয় সংগীত 'মার্সেলজ' তুলনীয়। মৃন্ময়ী দেশজননীকে চিন্ময়ী জননীরূপে পূজা করার মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্।'

আদ্যাশক্তিকে স্বদেশের আধারে প্রতিষ্ঠিত করে উপাসনা করাই 'বন্দে মাতরম্' এর মূল বীজ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় যা ছিল প্রতিভাত, স্বামী বিবেকানন্দ সেই দেশজননীকে আরাধ্য দেবীতে পরিণত করলেন। দেশবাসীকে বললেন ঃ 'ভুলি না, তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত' ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ঐতিহাসিক আহ্বান ঃ আগামী পঞ্চাশ বৎসর স্বদেশ জননীই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবীতে পরিণত হোন।

শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে 'আমার মৃত্যুর পর এই গানে (বন্দে মাতরম্) দেশ মেতে উঠবে।' জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং 'Patriot-Prophet' স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে জাতি নব জন্মলাভ করল।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন 'বন্দে মাতরম্' এবং স্বদেশজননীকে একসূত্রে বেঁধে দেয়।

'বন্দে মাতরম্' নতুন নামধ্বনিতে পরিণত হল।

জাতির জীবনে নতুন গতি সঞ্চার হল। মাতৃ উদ্ধারে ব্রতী সন্তান দলের কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে রণধ্বনিতে পরিণত হল।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' (নিজ সুরে) অন্য গায়কদের সঙ্গে সমবেতভাবে প্রথম গীত হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সার্বজনীনতা লাভ করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করেন যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪-১৫ এপ্রিল একদা 'Oxford of Bengal' নামে খ্যাত বরিশাল শহরে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি দেশপ্রেমিকদের, মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

বরিশাল শহর পদ্মার পূর্বতন খাত আড়িয়াল খাঁর শাখা কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত।

বরিশালের মুকুটহীন রাজা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময় স্বাদেশিকতার যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, লন্ডনের টাইমস্ পত্রিকা তাঁর মৃত্যুর পর ২৭ নভেম্বর, ১৯২৩ লিখেছিল :

> No where in the new provincial area did the flames of anger rise higher than at Barisal under his leadership. Lord Morley then at the India office found it most distasteful to sanction in December, 1908, the application to this scholarly man of the Regulation of 1818, authorising deportation without trial, for reasons of state.

অশ্বিনীকুমারের প্রভাব প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেনের মন্তব্যটি তাৎপর্যমণ্ডিত :

> তখন সমগ্র বরিশাল এক নেতার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হইত। একটি কল টিপিয়া দিলে যেমন হাজার হাজার বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠে, তেমন লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইত অশ্বিনীকুমারের ইচ্ছা দ্বারা।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মৈমনসিংহ শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে বাখরগঞ্জ জিলার, অধিবাসীদের পক্ষ থেকে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ সেন পরবর্তী অধিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ সাদরে গৃহীত হয়।

অশ্বিনীকুমার কংগ্রেস অধিবেশনকে 'তিনদিনের তামাশা' বলতেন। বরিশাল সম্মেলনকে তিনি কোনো মতেই 'দাদনের তামাশা'য় পরিণত হতে দিবেন না।

বরিশালের গ্রামে, গঞ্জে, হাটে, বাজারে, মেলায়, ধর্মীয় উৎসবে—কর্মীরা ছড়িয়ে পড়ে। 'বন্দে মাতরম্ তলা' স্থাপিত হল গ্রামে গ্রামে। স্বাদেশিকতার বার্তা, বঙ্গভঙ্গের

বিপদ, বাঙালির ঐক্য ও সংহতি বিধান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা সভা পরিচালিত হয়।

সরকার ছাত্রসমাজকে নিবৃত্ত করার জন্য নানাবিধ সার্কুলার জারি করলে অশ্বিনীকুমার দৃঢ়ভাবে জানান :

> কলেজের ছাত্রগণ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিলে আমার কলেজের যদি কোনো অনিষ্ট হয়, এমন কী কলেজ যদি উঠিয়াও যায়, আমি তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইব না।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪-১৫ এপ্রিল বাংলা ১৩১৩, ১লা ও ২রা বৈশাখ কীর্তনখোলা নদীর তীরে বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিগণ বরিশালে উপস্থিত হন।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের শাসনকর্তা ফুলার সাহেব নির্দেশ জারি করলেন যে প্রকাশ্যে কেউ 'বন্দে- মাতরম্' ধ্বনি দিতে পারবে না।

জেলাশাসক ইমারসন্ সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে নদীর তীর থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে যাবার সময় রাজপথে শোভাযাত্রা ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা যাবে না। একান্ত ক্ষোভে ও দুঃখে এই শর্ত মানা হয়। মূল সম্মেলনে, যাতে বিঘ্ন না হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

১৩ এপ্রিল রাতে নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা মেলে ব্যারিস্টার রসুল (সস্ত্রীক), সুরেন্দ্রনাথ মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র নেতা ও Anti-circular সমিতির সদস্যগণ ও বহু শত প্রতিনিধি উপস্থিত হন। স্টিমারের মধ্যে প্রতিনিধিগণ' 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে কীর্তনখোলার তরঙ্গকে আলোড়িত করেন।

তীরে অবতরণ করেও তাঁরা মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করতে চান। অশ্বিনীকুমার ও সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ থেকে প্রতিনিধিগণ বিরত হন।

কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং Anti-circular সমিতির সদস্যগণ বেদনার্ত হৃদয়ে বি. এম. কলেজের রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির আতিথেয়তা গ্রহণ করেননি। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে না পারায় অনেকেই ক্রন্দন করে রাত কাটান।

রাজা সাহেবের হাবেলিতে বিরাট সভা হয়। সেখানে সভাপতি রসুল সাহেব এবং উপস্থিত প্রতিনিধিদের অভিনন্দিত করা হয়। প্রায় দশ মিনিট ধরে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়।

কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং Anti-circular সমিতির সদস্যগণের মত হল :

রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষেধমূলক আদেশ বেআইনি। অন্যায় আদেশ প্রতিপালন করা অন্যায়। রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতেই হবে।

অশ্বিনীকুমার জানালেন :

> আমরা স্টিমারঘাটে ও শোভাযাত্রার অঙ্গীকার মতো 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিইনি। প্রতিনিধিগণ যদি রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেন বরিশালবাসী সানন্দে তাতে অংশগ্রহণ করবে।

পুলিশ যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রস্তাব পাঠালেন—শোভাযাত্রা করুন। কিন্তু রাজপথে যেন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা না হয়। নেতৃবর্গ রাজি হলেন না।

আবার সংশোধিত প্রস্তাব এল : রাজা বাহাদুরের হাবেলি থেকে বি. এম. কলেজ পর্যন্ত নীরবে গমন করুন। তারপর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিন।

বেলা তখন দুটো Anti-circular সমিতির ১৫/১৬জন সদস্য রাজা বাহাদুরের হাবেলিতে প্রবেশ করেছিলেন। পুলিশ সাহেব মি. কেম্প তাদের গতিরোধ করেন এবং লাঠি দিয়ে সমিতির সহকারী সম্পাদক ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আঘাত করেন। ফণীবাবুর আঙুল আঘাতে রক্তাক্ত হয়।

শোভাযাত্রা করে সভাপতির রসুল, শ্রীমতী রসুল, আবদুল হালিম গজনভি, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, মতিলাল, ব্রহ্মবান্ধব, কাব্যবিশারদ, ভূপেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার সহ বঙ্গমাতার কৃতী সন্তানগণ সভামণ্ডপের দিকে অগ্রসর হলেন।

Anti-circular সমিতির সদস্যগণ রাজপথে আসার সাথে সাথে অশ্বারোহী সহকারী পুলিশ সুপার হেইনস্ তাদের ওপর অশ্ব চালিয়ে দেন। পুলিশ সুপার কেম্প্ তাদের বাধা দেন। শচীন্দ্র প্রসাদ বসুর বুক থেকে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রাঙ্কিত উত্তরীয় কেড়ে নেন। শচীন্দ্রকে ঘুষি মারেন। সুবেদার বাবুরাম সিং এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী দেশভক্ত যুবকদের ওপর নির্মমভাবে লাঠি চালনা করেন। যুবকদের রক্তে বরিশালের রাজপথ সিক্ত হল।

যুবকগণ কেউই পালিয়ে যান নি। মার খেতে খেতে তাঁদের কণ্ঠে ভীমনাদে ধ্বনিত হল—'বন্দে মাতরম্'। বরিশালের রাজপথে তখন 'বন্দেমাতরম্' নামের সংকীর্তন। আহত, রক্তাপ্লুত, তবুও কণ্ঠে মাতৃনাম—'বন্দে মাতরম্'। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে রাস্তার ধারে পুকুরের মধ্যে ফেলে দেয়। চিত্তরঞ্জন পুকুরের জলে দণ্ডায়মান। নিস্তার নেই। সেখানেও পুলিশের লাঠি অবিরাম তাকে আঘাত করে চলেছে। চিত্তরঞ্জন প্রতিটি আঘাতের উত্তরে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দিলেন—'বন্দে মাতরম্'।

পরে চিত্তরঞ্জন তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'বাবা পুলিশ যতবার আমাকে প্রহার করেছে, আমি ততবারই 'বন্দে মাতরম্' বলেছি।'

চিত্তরঞ্জনের প্রহারে আতঙ্কিত প্রতিনিধিগণ হাবেলির বাইরে আসার চেষ্টা করার সাথে সাথে হেইনস্ সাহেবের অশ্ব প্রতিনিধিদের ওপর দিয়ে চলতে থাকে। পুলিশের লাঠিতে নহবতের লণ্ঠন চূর্ণ হয়।

কৃষ্ণকুমার মিত্র, রজনী গুহ, বেচারাম লাহিড়ী—সকলকেই পুলিশ প্রহার করে। প্রহারে বেচারাম বাবু অজ্ঞান হয়ে যান।

পুলিশ প্রহারের প্রতিবাদ করায় কেম্প সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ, মতিলাল ও অশ্বিনীকুমার প্রতিবাদ জানালেন। তাঁদেরও গ্রেপ্তার করতে বললেন। কেম্প সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি নিয়ে গেলেন।

সভ্য ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ইমারসনের ঘরে অশ্বিনীকুমার ও বিহারীলাল রায়কে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'বেড়িয়ে যাও। তোমাদের মাথায় টুপি নেই।' অশ্বিনীকুমার জানালেন—তিনি জাতীয় পোশাক পরিধান করেন। গৈরিক উত্তরীয়ে আবৃত কাব্যবিশারদকেও লাঞ্ছনা করা হয়।

বিচারে সুরেন্দ্রনাথের দুশ টাকা জরিমানা হল। ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথকে বললেন: This is disgraceful'. সুরেন্দ্রনাথ বললেন—, 'I protest against such a remark, a remark of this ought not to come from the Court.' ইমারসন্ গর্জন করে বললেন, 'Keep quiet, this is contempt of Court, I draw up contempt proceedings against you'.

সুরেন্দ্রনাথ বললেন : 'I have done nothing. Do just as you please'.

আবার দু'শ টাকা জরিমানা।

হঠাৎ চতুর ইমারসন্ বললেন, 'I give you an opportunity to apologise.'

সুরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে জানালেন, 'I respectfully decline to apologise. I have done nothing wrong.'

বিচার প্রহসন শেষ। সুরেন্দ্রনাথ জরিমানা দিলেন। তবে তিনি ছাড়বার পাত্র নন। অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করেন। আপিলে সুরেন্দ্রনাথের জয় হয়। জরিমানার টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

এদিকে পুলিশের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত প্রতিনিধিগণ বীরদর্পে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে সভা মণ্ডপে উপস্থিত হন।

১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে শুভ নববর্ষে কীর্তনখোলার তীরে অবস্থিত বরিশাল শহর 'বন্দে মাতরম্' সংকীর্তনে ভারতের মুক্তিতীর্থে পরিণত হল। বরিশাল 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের 'পুণ্যে সুবিশাল' হল।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত নগ্নপদ ব্রহ্মবান্ধবকে বরিশাল 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র দিয়ে স্বাগত জানাল।

সভার শুরুতে 'বন্দে মাতরম্' গীত হল। কাব্য বিশারদের সময়োচিত রচিত সংগীত প্রতিনিধিদের উজ্জীবিত করে :

মাগো যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম্ বলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে।

....

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে।
আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে।

....

অশ্বিনীকুমার প্রস্তাব করেন—যেখানে পুলিশের লাঠির আঘাতে দেশভক্ত যুবকদের রক্তপাত ঘটেছে, এবং নেতা সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার বরণ করেছেন, সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হোক। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়। সভাস্থলেই নানা রকম দান আসতে থাকে। নরোত্তমপুর নিবাসী তারাপ্রসন্ন বসুর সহধর্মিণী তাঁর হাতের সোনার বালা অশ্বিনীকুমারের হাতে পাঠিয়ে জানান যে যতদিন না রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি অবাধে দেওয়া যাবে, ততদিন তিনি সোনার বালা পরবেন না।

কেম্প সাহেব হঠাৎ অধিবেশন মণ্ডপে এসে জানান যে সভাভঙ্গের পর রাজপথে কেউ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে পারবেন না।

সভায় উত্তেজনার মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া হয়। কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং বি. সি. চ্যাটার্জী জানালেন যে পুলিশ গুলি করে সভা ভণ্ডুল না করলে তাঁরা সভা ত্যাগ করবেন না।

বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতারা একে একে সভা ত্যাগ করলেন। মাতৃমন্ত্রের বিনিময়ে অধিবেশন নয়।

বরিশাল সম্মেলন যেন যজ্ঞ। যজ্ঞ ভঙ্গ হল। কিন্তু আগুন নিবল কী? প্রবল বেগে কীর্তনখোলা তীরের 'বন্দে মাতরম্' সংকীর্তন থেকে স্বদেশপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বাংলায় এবং বাংলা থেকে সমগ্র ভারতে।

বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। দিকে দিকে মৃত্যুপাগল ভারত সন্তানগণ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে উল্কার বেগে ছুটতে লাগলেন। হৃদয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের স্বদেশজননীর চিন্ময়ী মূর্তি। ভারত বিপ্লবের আধ্যাত্মিক নেতা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পথ ধরে, ঋষি বঙ্কিমের বাণী নিয়ে, মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য ভক্তিসহযোগে আত্মবলিদানের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে যুবক বাংলা কীর্তনখোলার তীরে 'বন্দে মাতরম্' সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে।

অরবিন্দ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল Bandemataram পত্রিকায় লিখলেন :

> It was thirty two years ago that Bankim wrote his great song and few listened. But in a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal..... ..sang Bandemataram. The mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism. Once that vision has come to a people, there can be no rest, no peace, no further slumber till the temple has been ready, the image installed, and the sacricfice offered. A great nation which has had that vision can never again bend its neck in subjection to the yoke of conqueror.

'বন্দে মাতরম্' ও বাংলার যাত্রাপালা*

প্রভাতকুমার দাস

প্রয়াণের 'দুই-চারি বৎসর পূর্বে' বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর অত্যন্ত আদরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী জানিয়েছিলেন, 'বন্দে মাতরম্' গানটি লোকের তেমন পছন্দ নয়, এমনকী তাঁর নিজেরও ততটা নয়। মহাপুরুষ-স্রষ্টা স্বয়ং এ তথ্যে খুশি হননি, গম্ভীর বদনে বলেছিলেন : 'একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এ গান লইয়া বাঙলা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙালি মাতিয়াছে।' আলোচ্য গানটির ভবিষ্যৎ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয় অনুভব করতেন তা আরো কয়েকটি ঘটনায় প্রমাণিত। যেমন *বঙ্গদর্শন* মুদ্রণকালে, পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ কাঁঠালপাড়া নিবাসী পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা পূরণের প্রস্তাবে যখন টেবিলে পড়ে থাকা একখণ্ড কাগজে লেখা 'বন্দে মাতরম্'-এর পাণ্ডুলিপিটি, বিলম্বে কাজ বন্ধ না রেখে ছেপে দিতে চান 'উহা মন্দ নয় ত' মন্তব্যে—তখন বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হয়ে টেবিলের দেরাজে নিরাপদ যত্নে সেটি গচ্ছিত রেখে বলেছিলেন ; 'উহা ভাল কী মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।' পণ্ডিত রামচন্দ্র সম্পর্কে অন্যতর যে তথ্যটি প্রচারিত, সেটির প্রবক্তা দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র, তিনি বলেছেন : 'বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন 'সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য সুরতাল সংযুক্ত করে প্রথম গেয়েছিলেন। সেদিন উপস্থিত রামচন্দ্রের কাছে 'গান যাহাই হউক, বন্দেমাতরম্ দ্বারা বঙ্গদর্শনের পেট ভরিবে না,' বরং তিনি একখানি উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করুন—এই মন্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন :

> এ গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না ; যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে, এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।

'বন্দে মাতরম্' সংগীতের প্রথম রচনাকাল নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেও বলা যায়, আলোচ্য সংগীত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে গভীর বিশ্বাস পোষণ করতেন তা

বাস্তবে সত্যে পরিণত হয়েছিল। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র রবিবার ৫৫ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন বয়সে 'ক্ষণভঙ্গুর দেহ' ত্যাগ করে 'মহামহিমময়লোকে প্রস্থান করা'র পর বছর দশেকের মধ্যেই এই গান দেশমাতৃকার উদ্ধারে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। 'একদিন না একদিন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ভক্তিপূর্বক ধ্বনিত হইয়া বাঙলায় নতুন জীবন আনিবে—নতুন শক্তি সঞ্চারিত করিবে'—শচীশচন্দ্র-কথিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃঢ়-বিশ্বাস তাঁর মানসভূমিতে লালিত আত্মপ্রত্যয় থেকে উৎসারিত। ১২৮৭ থেকে ৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত *বঙ্গদর্শন*-এ *আনন্দমঠ*-এর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় থেকে হিসেব করলে পরবর্তী পঁচিশ বছর পূর্ণ করেই তার প্রবল বিস্তার পরিলক্ষিত হয়েছিল, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল পর্বে। ব্রিটিশ রাজশক্তির অত্যাচার ও বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে দলমত সংগঠনের কাজে যেসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপক প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিল—তার মধ্যে যাত্রাগানের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দেশের অসংখ্য নিরক্ষর কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এই লোকজ নাট্যমাধ্যমের প্রসার ও জনপ্রিয়তা, সে-যুগের স্বদেশি আন্দোলনকালে চারণকবি মুকুন্দদাসের রচিত, গীত ও অভিনীত পালাতেই সুদূরপ্রসারী তীব্রতা পেয়েছিল। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, সেই বাঙালির মধ্যে ঐক্য ও স্বাদেশিকতার পরোক্ষ প্রচার প্রথম দেখা দিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তখনকার জনপ্রিয় পালাকার মতিলাল রায়ের পালায়, যিনি তাঁর নিজস্ব দল নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলার যাত্রাগানে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার ভদ্রাসনে রাধাবল্লভের আটচালায় রথের সময় যাত্রাকীর্তনের জমজমাট আদর বসত। বঙ্কিমচন্দ্র যাত্রা দেখতে ভালো না বাসলেও, গান শুনতে বড়ো আগ্রহী ছিলেন। শচীশচন্দ্র জানিয়েছেন :

> শিশুপালকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আসরের মধ্যে বসিয়া কলিকা টানিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অথবা দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ হইতেছে, এমন সময় দ্রৌপদী যে বেহালার সঙ্গে সুর মিলাইয়া তড়াক্ তড়াক্ করিয়া নাচিতে থাকিবে, ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না।

সেজন্য তিনি আসরে না বসে, দূরে বৈঠকখানায় বসে গান শুনতেন। তবে তথ্য হিসেবে এ ঘটনাও উল্লেখ্য, কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র একবার একটি অপেরা সম্প্রদায় সংগঠন করেছিলেন। আত্মীয়স্বজন ছাড়া বড়ো একটা অপর কাউকে সে দলে নেননি—তবে সেটি গঠিত হতে না হতেই অকালে অনন্তগর্ভে মিলিয়ে গিয়েছিল। তিনি কীর্তনের প্রতি অনুরাগ পেয়েছিলেন পিতা যাদবচন্দ্রের কাছ থেকে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যাত্রানুষ্ঠানে

আটদিনের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা চারিদিন, মতি রায়ের দুই দিন ও অপরাপরের জন্য বাকী দুই দিন নির্দিষ্ট থাকিত।' তাঁর মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র শুধু যাত্রানুরাগী ছিলেন না, *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় তাঁর লেখা একাধিক প্রবন্ধ বাংলার যাত্রাগানের চর্চায় সময়োপযোগী মূল্যবান বিশ্লেষণ হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল।

যাত্রার আসরে পৌরাণিক পালার ভিতর দিয়ে পরোক্ষে স্বদেশ প্রেমের প্রচার ও স্বাধীনতার বিষয়ে মনোযোগী করে তুলতে প্রথম সচেষ্ট হয়েছিলেন মতিলাল। পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যম পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ এবং চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁর আদর্শ মাথায় রেখেই নিজেদের পালা উপস্থাপনায় অভিনবত্ব প্রদর্শনে মনোযোগী হয়েছিলেন। ভূপেন্দ্র সম্পর্কে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেছেন—'ভূপেন্দ্র ছিলেন স্বদেশি মনোভাবাপন্ন। স্বদেশ প্রেমের বীজ মতিলালই রোপণ করেছিলেন।' নিজের শরীর ছাড়াও স্থানীয় যুবকদের শক্তিমান করে গড়ে তুলতে তিনি 'তারা সমিতি' গঠন করেছিলেন, যুবকদের শরীরচর্চার পাশাপাশি লাঠি খেলা, সড়কি খেলা, তলোয়ার খেলা, ছোরা খেলা শেখাতেন। তাঁর ক্লাবঘরে সারি সারি অস্ত্র ঝোলানো থাকত।

ভূপেন্দ্রনারায়ণ গত শতকের তিরিশের দশকে মতি রায়ের যাত্রা তথা নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় তুলে দেওয়ার আগে মহাভারতের সূর্যকন্যা তপতীর সঙ্গে পুরুবংশীয় রাজা সংবরণের পরিণয় কাহিনি অবলম্বনে 'তপতী সংবরণ' গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়ে অনেকটা *আনন্দমঠ*-এর মতোই অভিরাম স্বামীর শিষ্য কৃতবর্মার নেতৃত্বে এক বিশাল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কীর্তি কাহিনিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যে-সন্ন্যাসীরা সেবাব্রতে দীক্ষিত হলেও দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রচালনাতেও অভ্যস্থ। ভারতমাতার মহিমা কীর্তন করে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে ভূপেন্দ্রনারায়ণ যে পথ প্রদর্শন করেছিলেন তার অন্তঃপ্রেরণায় মতিলাল থাকলেও, বহিরঙ্গের আয়োজনে মুকুন্দদাসের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের ভাবধারার অনুবর্তন মুকুন্দদাস যে গভীর উপলব্ধির মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন, উত্তরকালের ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ও ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রমুখ পালাকারদের মধ্যে তা অনুসৃত হয়েছিল।

'আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের মতো' মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ওজস্বিণী ভাষার অগ্নিবর্ষণ আর সহস্রকণ্ঠে গীত মনোমোহন চক্রবর্তী রচিত 'বল সিংহনাদে জয় জয় রবে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের 'গভীরম্' মন্ত্র শুনে বরিশালে যে বিপুল জনজাগরণ সংগঠিত হয়েছিল তারই ফল হিসেবে চারণকবি মুকুন্দদাসের আবির্ভাব। তিনি মতিলালের যাত্রারীতির জনপ্রিয় বক্তৃতা তাঁর যাত্রা প্রকরণে নতুন করে প্রবর্তন করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী রাজ্যেশ্বর মিত্র অনুমান করেছিলেন :

বরিশালের স্বনামধন্য হেম-কবি (হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) যখন অসামান্য কথকতা করতেন, তার কোনো কোনো স্টাইলও হয়তো সেখানকার যজ্ঞেশ্বরের (মুকুন্দদাসের আসল নাম) অভিনয়নৈপুণ্যে সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে।

তার ওপরে বর্তমান বক্তার ধারণা অহীভূষণ ভট্টাচার্য যে দিবদাসরূপী বিবেক সৃষ্টি করেছিলেন 'সুরথ উদ্ধার' পালায়, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তার সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যও মুকুন্দদাস নিজস্বরীতির আবিষ্কারের কাজে লাগিয়েছিলেন। সর্বোপরি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পরিধান বা *আনন্দমঠ*-এর সন্তানদলের অনুকরণে গৈরিক পাগড়ি ও আলখাল্লা পরা তাঁর অতি সাধারণ বেশ, আসরে আসরে যাত্রাদর্শকদের মধ্যে এক উন্মাদনা সৃষ্টি করত। সাদা পোশাকের যাত্রা হিসেবে অভিহিত তাঁর সৃষ্ট স্বদেশি দল তাঁর উদাত্তকণ্ঠে তাঁর সংগীত-সংলাপ-বক্তৃতায় মুখর যাত্রার মুগ্ধ শ্রোতাদর্শক ছিলেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্বদেশানুরক্তরা। তাঁর জাগরণের গানে সাধারণ মুসলমানেরা এতটাই উদ্দীপিত হতেন যে মুকুন্দদাসের গান গাইতে গাইতে তাঁরা রাস্তা হাঁটতেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত গীত 'মাতৃপূজা' পালার অভিনয় এমনই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার তাঁর অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও নানা কৌতুকক্কর খেলায় সেসব নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে বাংলার গ্রামে গঞ্জে নগরে শহরে ঘুরে ঘুরে তাঁর যাত্রা পরিবেশন করতেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য 'মাতৃপূজা' নামে যে পালাভিনয়ের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার ও পরে তিনশো টাকা জরিমানাসহ তিনবছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়, সেই পালার পাণ্ডুলিপি তো দূরের কথা প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় বিষয়বস্তু, কাহিনি, সংলাপ কিংবা অভিনয়ের তথ্যপূর্ণ বিবরণ কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শুধু 'মাতৃপূজার গান' সংকলনটি বাজেয়াপ্ত হলেও, যে গানটিতে 'কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে একদম দফা সারলে' বা 'ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা' পঙ্ক্তিতে স্পষ্টত যে ইংরেজকে কটাক্ষ করা হয়েছে, সেটির কারণেই তিনি যে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তা জানা গেছে। সরকারি বিশেষজ্ঞদের চোখে অত্যন্ত বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত এই গানেরই একটি অংশে তিনি বলেছিলেন :

বন্দেমাতরম্ বাজাও ডঙ্কা, জাগুক ভাই সকলে
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ
প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর গানের মুগ্ধ শ্রোতারা পরিবেশনকালে করতালি আর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে তাঁকে উৎসাহিত করতেন। এমনকী ১২৪(ক) আইনে রাজদ্রোহের অপরাধে যেদিন তাঁকে রাজপথে গ্রেপ্তার করা হয়, সেদিনও দূরে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে তাঁর অনুরাগীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন।

বিচারের রায় অনুযায়ী বাংলার জেলে রাখা নিরাপদ হবে না বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত মুকুন্দদাসকে দিল্লি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে তিনি কারামুক্তির পর কলকাতা হয়ে বরিশাল ফিরে এসে দেখলেন তাঁর অবর্তমানে স্ত্রীবিয়োগ ছাড়াও সংসারের দারিদ্র্যে বাবা-মায়ের অবস্থা করুণ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এই অবস্থায় তিনি প্রথমে মুদির দোকান খুলে আর্থিক পূর্বাবস্থা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়ে পুনরায় দল গঠনে মনোযোগী হন। বাজেয়াপ্ত মাতৃপূজা'র উপর নিষেধাজ্ঞা নিশ্চয় তখনো প্রত্যাহৃত হয়নি—তবে উত্তরকালে অনেকেই পালার নামকরণ 'মাতৃপূজা' করলেও, মুকুন্দদাস আর সে চেষ্টা করেননি। বরং গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' অনুকরণে তিনি 'সমাজ' নামে একটি পালা লিখে নতুন করে পুনরায় যাত্রা আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু চৌদ্দবছর পরে লেখা 'পল্লীসেবা' নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে পূজারি চরিত্রের কণ্ঠ দিয়ে শ্যামামায়ের উদ্দেশ্যে গান পরিবেশিত হলেও তার বক্তৃতা অংশে তিনি উচ্চারণ করেছেন 'বন্দে মাতরম্'-এরই আবাহন মন্ত্র। পূজারীর দীর্ঘ গদ্য বক্তৃতায় বলা হয়েছে :

বাঙলায় আজ যে ঘোর অমানিশা। রাজরাজেশ্বরী—এসো মা, আজ সপ্তকোটি বাঙালির ভগ্ন-হৃদয়ে তোমার ভৈরবী মূর্তি নিয়ে।...সৃষ্টি করো বাঙলায় আজ এক নতুন বীর জাতি, দেও তাদের নতুন প্রাণ, নবভাবে নবোদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হয়ে করুক তারা পতিগৃহে তোমার শারদীয় উৎসবের মঙ্গল-ঘট স্থাপনা। বাজুক দামামা, কাড়া, ঘণ্টা, ঢোল, শঙ্খ, করতাল, জয়ডঙ্কা, খোল, নাচুক ধমনী শুনিয়ে সে রোল ; সপ্তকোটি কণ্ঠ-কলকল-নিনাদে বিশ্ববিকম্পিত করে বাঙালি করুক তোমার বিজয়বার্তা ঘোষণা। দেও তাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ধর্মের তেজ, প্রাণে নতুন প্রেরণা, জয়োল্লাসে মাতৃগরবে গর্বিত বাঙালি করুক তোমার পূজার বেদী রচনা ; বীরচারী বাঙালি বীরাচারে করুক তোমার জগন্ময়ী রূপের বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়াও নাটকটির শেষাংশে সেবকের কণ্ঠে একপ্রস্থ 'বন্দে মাতরম্'-ধুয়া সংবলিত গান গীত হয়েছে যার প্রথম স্তবক :

জাগো ভারতবাসীরে
কত ঘুমে রবেরে,
বল সবে হয়ে একমন
বন্দেমাতরম্।

আর শেষ হয়েছে মেয়েদের গান দিয়ে ;

বল ভাই মেতে যাই বন্দেমাতরম্
বন্দেমাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দেমাতরম্।
ভারত সন্তান, নিয়ে মায়ের নাম,
হও আগুয়ান, নাচবে এ প্রাণ
নাম মধুরম ;
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।
নাম গানে, এ মরা প্রাণে,
জ্বলেছে আগুন, আগুন জ্বলিবে দ্বিগুন
নামই রুদ্রম।
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।
আসবে প্রাণে বল, মায়ের নাম কর সম্বল,
দেল দরিয়ায় উঠবে তুফান,
মন্ত্র গভীরম ;
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

মুকুন্দদাস তাঁর বন্ধু বিধুভূষণ বসুর লেখা *দীনবন্ধু* নাটকটিকে 'ব্রহ্মচারিণী' রূপে প্রস্তুত করেছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। সে নাটকের শেষে ছদ্মবেশী মা গৃহস্থ প্রজা দীনবন্ধুর ঘরে এসে বাগান ভরা ফুল আর বুক ভরা ভক্তি দিয়ে দুর্গোৎসব করার পরামর্শ শুনিয়েছেন। মাটির প্রতিমার পরিবর্তে খাঁটি প্রতিমার আবির্ভাবে পালাটি শেষ হয়েছে।

মুকুন্দদাস 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাঁর বহুশ্রুত 'ফুলার—আর কি দেখাও ভয়?' প্রথম পঙ্ক্তি সংবলিত গানটিতে। তাঁর শেষ চার পঙ্ক্তিতে বলেছেন:

বন্দেমাতরম্ মন্ত্র কানে,
বর্ম এঁটে দেহে মনে।
রোধিতে কী পারবে রণে—
তুমি কত শক্তিময়।

'বন্দে মাতরম্' বলে উদাত্ত কণ্ঠে উদ্দাম নৃত্য করবার আহ্বান, দামামা, কাড়া, ঘণ্টা, ঢোল, শঙ্খ, করতাল, জয়ডঙ্কা খোল বাজিয়ে যে শক্তির প্রকাশ—তার একটা বীরোদাত্ত রূপটি জনমানসে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করত, যে জন্যে হয়তো মামলার সওয়াল জবাবের সময় সরকার পক্ষের উকিল নলিনীভূষণ গুপ্ত তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন : 'His

motion and posture more than sadition of his language'

২

বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিবরণ থেকে জানা যায়, কোনো এক সন্ধ্যায় সাহিত্যসেবীদের সমাগমে নবীনবাবু কথায় কথায় *আনন্দমঠ*-এর সুপরিচিত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন : 'এমন ভালো জিনিসটিকে আধ সংস্কৃত আধ বাঙলায় লিখিয়া মাটি করা হইয়াছে ; এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মতো। লোকের ভাল লাগে না।' ঈষৎ কুপিত স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জবাব দিয়েছিলেন : 'আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে, তাই ওরকম লিখিছি। লোকের ভাল লাগে কিনা ভেবে আমি লিখ্‌বা!' আসলে গোবিন্দ অধিকারীর কীর্তনের ভক্ত হয়েও কিংবা কোনো এক রথযাত্রার সময় পশ্চিমপ্রদেশবাসী কোনো বন্ধু-অতিথিকে গোবিন্দ অধিকারীর প্রেমার্দ্র কণ্ঠে গলদশ্রুলোচনে শ্রীরাধার মানভঞ্জন শোনার পর 'এমন সঙ্গীত আমি কখনও শুনি নাই' বলে কাঁদতে দেখলেও,—তাঁর রচনার সঙ্গে একজন যাত্রাওয়ালার প্রতি তুলনায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবীনচন্দ্র একবার কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তদানীন্তন সাহিত্যের অবনমনের কথায় বলেছিলেন :

> আপনি বঙ্গসাহিত্যের একমেটে সরস্বতীকে বটতলার ধূলা কাদা ও পূঁতিগন্ধময় হইতে উদ্ধার করিয়া, এবং দোমেটে করিয়া, অমল শুভ্র বর্ণে ও বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত করিয়া, শত শোভাপূর্ণ-সহস্রদলে স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাব প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন বঙ্গসাহিত্য আবার সেই 'কি মজার শনিবার,' 'হদ্দ মজার রবিবার' সাহিত্যের দিকে গড়াইতেছে। আপনি কেমন করিয়া চাহিয়া আছেন?

চিন্তাযুক্ত বিষণ্ন মুখে বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিযোগের যথার্থ স্বীকার করে বলেছিলেন : 'নাতি। 'গড়াইতেছে' কেন, গড়াইয়াছে বল। সত্যই আমার যে বটতলা হইতে তুলিয়াছিলাম, বঙ্গ সাহিত্য আবার সেই বটতলায় গিয়াছে।' আসলে বর্তমানে বটতলার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলেও উনবিংশ শতক কেন, বিশ শতক পেরিয়ে আজকের একবিংশ শতকেও সাহিত্যের কোনো অধোগতির মান ও রুচি নির্ধারণে বটতলার তুলনাতেই শিক্ষাভিমানী ভদ্রসমাজ অভ্যস্থ। সময়াভাবে প্রসঙ্গটির বিস্তার স্থগিত রেখে, অন্তত তথ্যের জন্য উল্লেখ করা যায়—বিগত বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাঙালির জনজীবনে বিনোদন ও জাগরণের ক্ষেত্রে বটতলার সংলগ্ন যাত্রা পাড়ার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

বিশেষ করে, শুরু থেকে পরবর্তী একটানা সাতটি দশকে, যাত্রাপালার বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাসটি পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব, পর্বে পর্বে কত শক্তিমান পালাকারের আবির্ভাবে যাত্রাপালার সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একথা অস্বীকার করা যায় না, রুচিগত দিক থেকে, সমসাময়িক দর্শক-শ্রোতাদের মন জোগানের রশদই তাদের পরিবেশন করতে হয়েছে, কিন্তু দশকে-দশকে এমন কৃতী মানুষও যাত্রাসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন যাঁদের তুল্য মনীষী সাহিত্য সংস্কৃতির ভিন্ন ধারাতেও অপ্রতুল বিবেচিত হবে। যাঁরা দেশের প্রয়োজনে সাধারণের মন জাগাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করতে হয় ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র নাম, যাঁর একাগ্র চেষ্টায় বাংলার যাত্রাগান সময়োপযোগী সুপরিকল্পনায় যথার্থ আধুনিকতার পথেই বিবর্তিত হয়েছে।

জন্মসালের হিসেবে বর্তমান বর্ষটি তাঁর শতবর্ষ হিসেবে চিহ্নিত। ১৯০৭-এর ১ ফেব্রুয়ারি তিনি তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও, কলকাতায় ছাত্রজীবন কেটেছে—প্রবেশিকা থেকে প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে, অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করেও জীবনে শিক্ষকতা বৃত্তির বাইরে যাননি। কর্মজীবনে বেশি সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে কাজ করলেও অবসর সময়ে যাত্রাপালা রচনাকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০-৩১ থেকে শুরু করে ১৯৭৬-এ তাঁর প্রয়াণের বছর পর্যন্ত দীর্ঘসময়ে প্রায় একশো পঁয়ত্রিশটি পালা অভিনীত হয়েছে পেশাদার যাত্রায়—এবং সেগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি যাত্রাগানের ঐতিহাসিকতায় এক একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সাহিত্য সম্রাট হিসেবে নন্দিত হয়েছিলেন, তেমন জীবিতাবস্থাতেই ব্রজেন্দ্রকুমার আখ্যাত হয়েছিলেন পালাসম্রাট হিসেবে।

ছাত্রাবস্থায় তিনি *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের পালারূপ দিয়ে তাঁর যাত্রাপালা রচনার সূত্রপাত করলেও পরিণত বয়সে তিনি পেশাদার যাত্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনিকে যাত্রায় রূপ দিতে সচেষ্ট হননি। হয়তো এর একটি কারণ, তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ পালাকার-গীতিকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় চল্লিশের দশকে প্রথম *রাজসিংহ* উপন্যাসের পালারূপ 'রূপনগরের মেয়ে' রচনা করে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন। যেজন্য এ কাজে প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়ানো তাঁর অভিপ্রায় হয়নি। সৌরীন্দ্রমোহনের সেই প্রথম প্রচেষ্টার পরে, ১৩৫২ থেকে ১৩৮৮ দীর্ঘ ছত্রিশ বছরে চলচ্চিত্র কিংবা রঙ্গমঞ্চের তুলনায় পেশাদার যাত্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব কটি কাহিনিরই পালারূপ পরিবেশিত হয়েছে। এই দীর্ঘ পর্বেরই কোনো এক সময় সম্ভবত স্বাধীনতালাভের পরে পরেই ব্রজেন্দ্রকুমার, কৃষ্ণযাত্রার আঙ্গিকে নাটিকা আকারে 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আনন্দমঠ'-এর পালারূপ দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র তরুণকুমার দে জানিয়েছেন, প্রকাশক সেইসব গ্রন্থে কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের নামোল্লেখ করেননি দেখে—বিরক্ত ও বিব্রত ব্রজেন্দ্রকুমার সে

পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে আর কোনো পালারূপ দেননি।

ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর পালা রচনার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন মতিলাল রায়, মুকুন্দদাস এবং ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রীকে অনুসরণ করে। প্রথাগত যাত্রাপালা রচনার রীতি তিনি ধীরে ধীরে পরিবর্তন করেছেন—সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তাঁর প্রথম ক্রান্তিকারী পালা 'চাঁদের মেয়ে' থেকে বলা যায় নতুন যাত্রা যুগের সূচনা হয়েছিল। সে পালার ভূমিকায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণে, বলেছিলেন :

> বঙ্কিমচন্দ্র যখন বন্দেমাতরম্ গান লিখিয়াছিলেন তখন তিনি ভাবেন নাই এই স্রোতই একদিন ভারতে বন্যা আনিবে। আমি বঙ্কিমচন্দ্র নই, জয়যাত্রার পুরোভাগে সঙ্গীন লইয়া দাঁড়াইতে পারিব না, কিন্তু পিছন হইতে জয়ধ্বনি দিতে আমারও অধিকার আছে।

বস্তুতপক্ষে মনেপ্রাণে তিনি সর্বদা শিক্ষিত মহলে যাত্রাপালার সুনাম প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন।

'বন্দে মাতরম্' সংগীতের ভাবাবেগ, বাঙালি জনসাধারণের হৃদয়ে যে উন্মাদনা জাগিয়েছিল ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর একাধিক পালায় তার বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর লেখা 'মায়ের ডাক' পালার কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯৪৫-এ প্রভাস অপেরা এবং নট্ট কোম্পানি দলে অভিনীত আলোচ্য পালা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবন অবলম্বনে রচিত। 'বাংলার যে দুরন্ত ছেলে জাতির উপরে ব্যক্তিকে কখনও স্থান দিল না, যাহার পদনখ হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত দেশের সেবায় নিবেদিত, বারবার মরিয়াও যে কখনও মরিল না, তরুণ ভারতের সেই মুকুটহীন রাজা' নেতাজি সুভাষচন্দ্রের স্মরণে 'মায়ের ডাক' উৎসর্গ করে তিনি ভূমিকায় বলেছিলেন :

> যে লৌহমানবের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মায়ের ডাক নাটক রূপায়িত, তাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া এই রূপক-নাট্যকথা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

চরিত্রলিপিতে ইংরেজপক্ষের প্রধান হিসেবে এসেছেন বিশ্বজিৎ, দুঃশাসন, বিভীষণ, শিরোমণি, শ্বেতকেতু প্রভৃতি। শেষোক্ত নামটির মধ্যে 'চন্দ্রশেখর'-এর শৈবলিনীর স্বপ্নদৃশ্যে 'শ্বেতশূকর' কিংবা মুকুন্দদাসের 'শ্বেত ইঁদুর' পেরিয়ে সুভাষচন্দ্রের শেতাঙ্গ শিক্ষক ওটেনকেই চিত্রিত করা হয়েছে।

এই শ্বেতকেতুকে সব্যসাচীরূপী সুভাষচন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়েছে মায়ের ছেলে

বলে—'কে তোর মা?' এই জিজ্ঞাসায় সে জানিয়েছে 'আমার মা এই সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা আর্যভূমি।' *আনন্দমঠ* উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে প্রথম গীত 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের পর মহেন্দ্রের 'এ ত দেশ, এ ত মা নয়'—সংলাপের পর ভবানন্দ জানিয়েছিলেন : 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা সুফলা, মলয়জসমীরণ শীতলা শস্যশ্যামলা'—ভবানন্দ নিজেদের মায়ের সন্তান হিসেবেই পরিচয় দিয়েছে অশ্রুসজল কণ্ঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রজেন্দ্রকুমার *আনন্দমঠ*-এর যে ছোট নাটিকার রূপ দিয়েছিলেন তাতে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত প্রায় সমস্ত সংলাপ সহ হুবহু তুলে দিয়েছিলেন মূল উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদ থেকে। নাটকের শেষ হয়েছে 'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম / তুমি হৃদি, তুমি মর্ম ত্বং হি প্রাণা শরীরে'—ইত্যাদি অংশের গান দিয়ে। 'মায়ের ডাক'-এর অন্যত্র রাজা বিশ্বজিৎ আদেশ দিয়েছিলেন অহিংস সংগ্রাম বন্ধ করতে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণের। উত্তরে বিশিষ্টরূপী মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন : 'আপনার এ আদেশের পরেও আমি মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করছি 'বন্দে মাতরম্'। এই পালায় বশিষ্ঠের সহচর হিসেবে রূপায়িত হয়েছিলেন রামানুজ রূপে জহওরলাল নেহরু। বিবেক এসেছেন কবি-র শরীরে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মুকুন্দদাসের স্বদেশবোধ সঞ্জাত বাণী মাহাত্মের প্রচারক হয়ে।

বছর তিনেক পরে প্রায়ই একই পটভূমিতে 'ধরার দেবতা' নামে একটি পালা লিখেছিলেন নিউ গণেশ অপেরার জন্য। সে পালায় নায়ক ছিলেন শুকদেব রূপী গান্ধিজী, আর তাঁর রাজনীতির সহযোগী অম্বরনাথ—বাস্তবে যিনি জওহরলাল। কাঞ্চনগিরির রাজা কীর্তিধ্বজ এখানে ইংরেজ শাসক, স্বেচ্ছাসেবকদের কণ্ঠে ধ্বনিত 'বন্দে মাতরম্' বন্ধ করে, দেশ ছাড়ো ধ্বনি স্তব্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করেছে। 'সমুদ্র মন্থনে যত সুধা উঠিয়াছে, সবটুকু দেশবাসীকে বিলাইয়া দিয়া যিনি নিজে সমস্ত হলাহল আকণ্ঠ পান করিয়াছেন সেই মৃত্যুঞ্জয়ী নীলকণ্ঠকে প্রণাম' জানিয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার 'ধরার দেবতা' পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, 'মায়ের ডাক' পালার সার্থকতার পথেই জিতেন্দ্রনাথ বসাক, ১৯৫১ নাগাদ লিখেছিলেন 'বিদ্রোহী বাঙালী'—যার নায়ক সর্বদমন, উকিল সীতানাথের পুত্র পরিচয়ে চিত্রিত হলেও, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবনের ছায়া অবলম্বনে রচিত সেটি একটি কাল্পনিক পালা মহাবিদ্যালয়ের বি. এ. ক্লাসে ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ কোটিন, এ পালায় ওটিনের ছায়ায় গড়ে উঠেছে—এবং শ্রেণিকক্ষে নেটিভ ইণ্ডিয়ান বিতর্কে সর্বদমন সজোরে অধ্যাপকের গালে চপেটাঘাতও করেছে। কিন্তু সর্বদমন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সাধনায় ভারতের বুক থেকে বিদেশি শাসনের

মূলোৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর। পরের দৃশ্যে কিশোর বালক রাম নামে একটি চরিত্রের কণ্ঠে গীত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে ভারতের জাতীয় সংগীত :

বন্দনা করি মায়
সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা চন্দন শীতলায়।

যাহার জ্যোৎস্না পুলকিত রাতি
যাহার ভূষণ বনফুল পাতি,
সুহাসিনী সেই মধুর ভাষিণী সুখদায় বরদায়।

সপ্তকোটির কণ্ঠ নিনাদ
যাহার গগন ছায়,
চৌদ্দটা কোটি হস্তে যাঁহার
চৌদ্দটা কোটি ধৃত তরবার
এত বল তাঁর তবু মা আমার অবলা কেন গো হায়।।

সম্ভবত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কৃত মূল সংগীতের প্রথমাংশের এই অনুবাদ—'তীর্থ সলিল' কাব্যগ্রন্থ থেকে পালায় স্থান দিয়েছেন জিতেন্দ্রনাথ এবং পাদটীকায় নির্দেশ দিয়েছেন : 'এস্থলে বাধা না থাকিলে 'বন্দে মাতরম্' গানটি গীত হইবে।' তবে আলোচ্য পালাকার যখন *আনন্দমঠ*-এর পালারূপ দিয়েছিলেন—প্রেমানন্দের কণ্ঠে মূল 'বন্দে মাতরম্' গানটি গীত হয়েছে। এই *আনন্দমঠ*-ই যাত্রার আসরের জন্য পৃথক উদ্যোগে প্রস্তুত করেছিলেন আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেন লাহিড়ী। সেই দুটি পালা অভিনীত হয়েছিল সত্যম্বর অপেরায় ও নাট্যভারতী দলে। শেষোক্ত পালাটি প্রযোজিত হয়েছিল ১৯৭৯-তে।

'ধরার দেবতা'-র বছরে ব্রজেন্দ্রকুমার লিখেছিলেন 'স্বামীর ঘর' নামে আর একটি পালা—যেখানে প্রধান বিপ্লবী চরিত্র সত্যকামের ছেলে বিকর্ণের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গানটি প্রায় সম্পূর্ণ গীত হয়েছে। সত্যকাম এই পালায় বন্দনাকে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে উদ্‌বোধিত করেছে দেশকে মা হিসেবে কল্পনা করে, তার শাসনভার তুলে নেবার জন্য। বলেছে : 'আমার এই দলিত নিষ্পেষিত সর্বহারা জন্মভূমি শুধু আমার মা নয়, আপনারও মা। আমার সঙ্গে আপনি গ্রহণ করুন এর সেবার ব্রত, প্রণাম করুন রাজকুমারী—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্।'

আলোচ্য পালাতে *আনন্দমঠ* এসেছে অন্যভাবে, যেখানে দশ হাজার সৈন্য অস্ত্রশিক্ষায় নিরত, এখন তারা নিয়মিত হরিনাম গান করলেও—একদিন দেশের

প্রয়োজনেই পাগল হয়ে উঠবে—এই আশ্বাস বিদ্রোহী উদয়ন নায়ক সত্যকামকে দিয়েছে।

'বন্দে মাতরম্' এই ধ্বনি ব্রজেন্দ্রকুমার আর যেসব নাটকে ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে ছোটোদের জন্য লেখা 'উজানীর চর', 'প্রতিদান' ছাড়া পেশাদার দলে অভিনীত 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্যসেন', 'বিদ্রোহী নজরুল' পালা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'উজানীর চর' নাটকে ব্রজেন্দ্রকুমার হানিফ আর দুখীরাম নামে দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এদের দুজন মারা যাওয়ার সময় পরস্পর বিপরীত ধর্মের স্মরণ নিয়েছে—হানিফের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্' আর দুখীরাম বলেছে 'আল্লা হো আকবর'। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত *প্রতিদান* নাটকে 'রিপুদল বারিণিং মাতরম্' পর্যন্ত অংশ গীত হলেও স্বাধীনোত্তর ভারতের করুণ একটি বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরেছিলেন। এতে নায়ক অধীর মল্লিক বি. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করেও চাকরি ছেড়ে দেশোদ্ধারের কাজে যোগ দেন। পরে যাঁর আহ্বানে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই দেশনেতা মন্ত্রীত্ব পাওয়ার পর—দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার, স্বজন পোষণের নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের এই অপব্যবহারের পরিণতিতে অধীর আহত বোধ করেছে।

ব্রজেন্দ্রকুমারের পূর্বসূরি ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যিনি বড়ো ফণী নামেই সমধিক পরিচিত তিনিও যাত্রাজগতে তাঁর সমকালে প্রাতস্মরণীয় মাষ্টারমশাই হিসেবেই বন্দিত হয়েছিলেন। ফণিভূষণ 'মায়ের দেশ' নামে একটি পালা লিখেছিলেন পৌরাণিক রাজা পৃষতাস্ব, রানি পদ্মাবতী ও রাজকুমার পদ্মবর্ণের উপাখ্যান অবলম্বনে। নিজের ইচ্ছার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন উৎসর্গপত্রে : যাঁরা / প্রকৃত দেশসেবক, / আমার/ এই / মায়ের দেশ / তাঁদেরই / কর্মালোকে / উদ্ভাসিত হোক।' এই পালায় চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের শেষে শুধু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি মুখরিত হয়নি, জনদেব নামে পুরোহিতের কণ্ঠে গীত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—/ বন্দনা কর, বন্দনা কর বন্দনা কররে'—গীতটি।

দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ আজীবন প্রগতিশীল ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ 'নীলকুঠি' নামে একটি পালা লিখেছিলেন, ১৮৬১ সালের নীলকর যুগের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনি 'অত্যাচারিত বাঙালির হাতে সমর্পণ করে সব কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে' দেওয়ার জন্য। নাটকটি কোন্ সময় রচিত ও অভিনীত হয়েছিল সে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তবে নিউ নারায়ণ অপেরা এবং মুকুন্দদাসের দলে সগৌরবে অভিনীত হয়েছিল এই উল্লেখ দেখে মনে করা যায় পালাটি স্বাধীনতালাভের আগে পরেই কাছাকাছি সময়েই অভিনীত হয়ে থাকবে। মুকুন্দদাসের দল বলতে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে একসময় যে সব দল বাংলার নানা প্রান্তে সংগঠিত হয়েছিল, হয়তো এ দল তারই কোনো একটি।

যাই হোক, খুলনা মহকুমার বড়থালীর তীরবর্তী মোরেলগঞ্জ গ্রাম আলোচ্য পালার ঘটনাস্থল। সে গ্রামে জমিদার প্রিয়নাথ আর তাঁর পুত্র অরবিন্দ নীলকুঠির মোরেল সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এই পালায় বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চরিত্রে—বাস্তবে তিনি অবশ্য ১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ খুলনাতেই কর্মরত ছিলেন। প্রশাসক হিসেবে তাঁর কঠোর বিধানে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের মোসাহেব বাঙালিদেরও শাস্তি দিয়েছেন—এই আনন্দে নীলকুঠির খোলা প্রাঙ্গণে বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন পাতায় মোড়া ফুলের মালা হাতে প্রিয়নাথ মুখুজ্জে। গ্রামবাসীর হয়ে তাদের কামনার কথা বলেছেন প্রজানুরাগী সেই জমিদার 'বাংলার এই আদর্শ মানুষটি যেন ঘুরে ফিরে বাংলায় এসেই জন্মগ্রহণ করেন।'

পালার শেষে প্রিয়নাথের আদেশের পরের দিন থেকে চণ্ডীপাঠ শুরু করার পরিবর্তে মন্দিরের পুরোহিত অঘোরনাথ—উচ্চারণ করতে চেয়েছেন জাতীয় জীবনের নতুন স্তোত্র, কেননা :

> আদর্শ পুরুষ হাকিমবাবুরই এক মন্ত্র আছে তার মধ্যে অসংখ্য দেবদেবীর স্তোত্র নিহিত। সে মন্ত্র সারা ভারতবাসীকেই উনি দান করেছেন। মন্ত্রের নাম 'বন্দে মাতরম্'।

সেই ধ্বনি অনুসরণ করে অঘোরনাথের শিষ্য থানেশ্বরের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গানের প্রথমাংশ গীত হয়ে পালা শেষ হয়েছে। স্বদেশিযুগে 'বন্দে মাতরম্' আর বাঙালির জীবন—একাত্ম হয়েছিল বলেই, পালায় স্থানকালপাত্রের বিবেচনায় তখনো এই গান বাস্তবে রচিত হয়েছিল কিনা সে প্রশ্নের যাথার্থ নিয়ে নিশ্চয় কেউ মাথা ঘামায়নি। আজও নিশ্চয় তার কোনো প্রয়োজন নেই,—শুধু দেশের সংকটকালে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে উন্মাদনা জাগাতে যাত্রার আসরও যে উদ্বেল আয়োজন করতে এগিয়ে এসেছিল, জাতীয় জীবনে তার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বরং সেদিনের সেই গৌরবের কথা স্মরণে রেখে পালার যুবক-চরিত্র অরবিন্দের সংলাপ উচ্চারণ করে আজ আমরাও বলতে পারি:

> হে বঙ্গবীর কৃতী পুরুষ। দমননীতির কঠোর উপাসক। হে সত্যের শেবক। হে উদার সহিষ্ণুসিদ্ধ পুরুষ। হে বরেণ্য মহামানব। পূজারীর এই ক্ষুদ্র পূজা গ্রহণ করুন।

বন্দে মাতরম্ ও ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১)

তরুণকুমার দে

একশো বছরেরও বেশি আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *আনন্দমঠ* উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত বা স্তোত্রটি ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে ওই শব্দযুগল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্লোগান হয়ে উঠেছিল—অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশনে ওই গানটি জাতীয় সংগীতরূপে গীত হয়েছিল। সেই সূত্রে গানটি সম্প্রতি শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। এর আগে বিভিন্ন সময়ে 'বন্দে মাতরম্' ও *আনন্দমঠ* প্রসঙ্গে নানা বিতর্ক উঠেছে। কেউ বলেছেন, উপন্যাসটি সংগ্রামের প্রতীক, কেউ বলেছেন তা নয়। একই সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্'-কে কেউ জাতীয় গানের যোগ্য বলে মনে করেননি, কেউ বা জোর গলায় তাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

এই বিতর্কের কালে দাঁড়িয়ে বর্তমান প্রবন্ধে যাত্রাপালায় 'বন্দে মাতরম্'-এর ব্যবহার নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। যতদূর জানা যায়, চারণ সম্রাট মুকুন্দ দাস তাঁর পালায় মাঝে মাঝে যে Extempore বক্তৃতা দিতেন, তাতে তিনি 'বন্দে মাতরম্' ব্যবহার করেছিলেন, গেয়েছিলেন।

চারণ সম্রাটের স্বদেশি যাত্রার প্রভাবে পেশাদার যাত্রায় ওই যুগে মাঝে মাঝে দেশাত্মবোধক যাত্রাপালা পরিবেশিত হয়েছিল (অঘোর কাব্যতীর্থের শান্তি, কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের মাতৃপূজা, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের রণজিতের জীবনযজ্ঞ, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের মুক্তি, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর জরাসন্ধ প্রভৃতি)। কিন্তু ওই পালাগুলোর কোনোটাতেই 'বন্দে মাতরম্' গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা বলতে পারছি না[১]। তবে মুকুন্দ দাসের ধারায় স্বদেশি যাত্রার অনেকগুলি পালা বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ লিখেছিলেন। বিনয়কৃষ্ণের বন্দে মাতরম্ নামে একটি স্বদেশি যাত্রার পালাও ছিল। সেটি প্রাক্ স্বাধীনতা যুগেরই প্রকাশনা ছিল।

বর্তমান প্রবন্ধে ব্রজেন্দ্রকুমার দের পালায় প্রাক্ ও উত্তর স্বাধীনতা যুগে 'বন্দে মাতরম্' শব্দযুগল ও গানটির ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। ব্রজেন্দ্রকুমারের কাছে 'বন্দে মাতরম্' শব্দযুগল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত দ্যোতনা বহন করেছে কিনা, তাও এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে। ব্রজেন্দ্রকুমারের গুরুস্থানীয় মুকুন্দ দাসের পালায় 'বন্দে মাতরম্'-এর ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই প্রাক্কথনে তুলে ধরা হবে।

চারণ কবি

চারণ কবির একটি বিখ্যাত গান ছিল :

বন্দেমাতরম্ বলে নাচরে সকলে
কৃপাণ লইয়া হাতে।
দেখুক বিদেশি হাসুক উট্টাহাসি
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়ে চারণ কবি এই গান গেয়ে উদ্দীপ্ত করেছিলেন সাধারণ মানুষকে। মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত বুঝেছিলেন—বিরাট এক শক্তি অবরুদ্ধ রয়েছে ওই দেহের মধ্যে। সেই শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্য তিনি চারণ কবিকে স্বদেশি যাত্রার দল গঠন করতে বলেন। সেই জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন চারণ সম্রাট। ব্রজেন্দ্রকুমার দে লিখেছিলেন—'স্বদেশি যাত্রার দল গঠন করে ও নিজে সামাজিক বই অভিনয় করে স্বাদেশিকতার যে প্রাণবন্যা তিনি উভয় বঙ্গে বইয়ে দিয়ে গেছেন, দেশবাসী তা কোনোদিন ভুলবে না, আজ যারা যাত্রায় সস্তা রাজনীতি আমদানি করে মনে কচ্ছেন—বড়ো বিদ্যা করেছি জাহির, তাঁরা মুকুন্দ দাসের স্বদেশি যাত্রা শুনলে এ পথে পা মাড়াতেন না।' (পালানাটকের পালাগান, দর্শক, ১৫-১১-১৯৮৭)।

ব্রিটিশের কারাগার (অথবা ব্রজেন্দ্র কুমারের ভাষায় 'বিশ্রামাগার') থেকে ফিরে এসে আবার চারণ সম্রাট স্বদেশি যাত্রা গাইতে শুরু করলেন। সেই সময়ে পল্লীসেবা পালায় তিনি একটি ৩৬ লাইনের গান বসিয়েছিলেন, যার প্রতি দুটি লাইনের পরে 'বন্দে মাতরম্' ব্যবহৃত হয়েছিল।

হিন্দু পরিবারের ছেলে ছিলেন তিনি। বৈষ্ণব ও শাক্ত দুই সাধন পদ্ধতিই তাঁর মধ্যে মিশেছিল। ফলে তিনি দেশমাতাকে জননীরূপে দেখে যে সব গান লিখেছিলেন তার মধ্যে দেবী এসে গিয়েছিল। বিষ্ণু, হরি, কৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই গানের রূপকে প্রতিফলিত হয়েছিল। যেমন—'মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে', 'ভারতের কর্ম রথের সারথী শ্রীভগবান্', 'আমাদের জন্মভূমি, দেবতার লীলাভূমি,' 'আয় মা তারিণী করাল বদনী', 'মায়ের পূজার কর আয়োজন রক্তজবা বিল্ব চন্দন', 'তুই না জাগিলে শ্যামা', 'শব হয়ে শিব চরণে পড়িয়া' ইত্যাদি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি হিন্দু-ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর অনেক গানেই বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলনের কথা বলা হয়েছে:

১. 'হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে, তফাৎ কেন কর জী...'
২. 'হিন্দু পার্শী জৈন সাঁই মুচী ডোম মেথর কসাই—

আমরা সকলেই এক মায়ের ছেলে এই মহামন্ত্র ভুলবো না।'

৩. 'রাখিস রে রাখিস মনে, হিন্দু-মুসলমান ভাই দুজনে...'

তা ছাড়া আর একটি বিখ্যাত গান মনে করা যেতে পারে :

'বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনও ঘুমাও!
কত যুগ গেছে কেটে দেখেছ কত স্বপন
এবার বদর বলে ধর বৈঠা জীবন-মরণ পণ।'

পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে, মুসলমান মাঝিরা নৌকা ছাড়বার সময়ে বদর পীরকে স্মরণ করত। এই প্রথা হিন্দু মাঝিদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। চারণ কবির জন্মস্থান 'নদী হার মেঘলা' পূর্ববাংলা। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গানে 'বদর' চলে এসেছিল, যেমন শ্যামা, কৃষ্ণ, শিব এসেছিল।

চারণ কবির অন্যান্য বহু গানেও 'বন্দে মাতরম'-এর ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন :

১. 'বন্দে মাতরম্ বাদাম ছেড়ো না,
বিপক্ষ সম্মুখে হেরিয়া।'

২. 'বন্দে মাতরম্ মন্ত্র কানে,
বর্ম এঁটে দেবে মনে।'

৩. 'বল ভাই মেতে যাই বন্দে মাতরম্...'

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। 'পল্লীসেবা' পালার চতুর্থ দৃশ্যে তিনি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন পল্লিসমিতির চালক নিত্যানন্দের বোন সুলভার সংলাপে, 'তিনি বর্তমান ভারতের মন্ত্রগুরু।' এই প্রসঙ্গে *আনন্দমঠ* ও *দেবী চৌধুরানী*র প্রসঙ্গও এসেছিল।

কৃষ্ণযাত্রা

ব্রজেন্দ্রকুমার দে এক সময়ে কৃষ্ণযাত্রার পালা রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কৃষ্ণযাত্রায় সাধারণত পৌরাণিক কাহিনির পালাই অভিনীত হত। নিমাই সন্ন্যাস জাতীয় পালাও কৃষ্ণযাত্রায় পরিবেশিত হত। কারণ নিমাইকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবতার রূপে বর্ণনা করে পৌরাণিক আবহাওয়াই সৃষ্টি করা হত। ব্রজেন্দ্রকুমার কৃষ্ণযাত্রার জন্য ঐতিহাসিক পালা লিখেছিলেন (চন্দ্রগুপ্ত, কেদার রায়, ঝাঁসির রানি ইত্যাদি)। সেই সঙ্গে

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কৃষ্ণযাত্রারূপও প্রদান করেছিলেন (*আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর* ইত্যাদি)। *আনন্দমঠ* পালাটিতে তিনি স্বরচিত কয়েকটি গানের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' গানটি সম্পূর্ণই ব্যবহার করেছিলেন। তবে তিনি এই পালায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকেও কখনও সরে আসেননি।

আকালের দেশ

আকালের দেশ (রচনাকাল ১৯৪৩) পালাটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। কিন্তু পালাটি শুধুমাত্র পঞ্চাশের মন্বন্তরের চিত্র বললে সম্পূর্ণই ভুল বলা হবে। বরং দুর্ভিক্ষজনিত সমস্যা ও দুর্ভিক্ষের কারণ উচ্ছেদের দিকেই ছিল পালাকারের ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে পালাকারের মঞ্চনাটক মহাযুদ্ধের বলি (রচনাকাল ১৯৪৩) এবং উজানীর চর (রচনাকাল ১৯৪৭)-কেও পাশাপাশি বিচার করতে হবে।

আকালের দেশ পালায় প্রথমেই দেখা গিয়েছিল চাষিরা দলে দলে অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে। এমনকি, তাদের তৃষ্ণার জল পর্যন্ত ছিল না। অথচ রাজশক্তির গুদামে অপরিমেয় খাদ্যশস্য মজুত ছিল। এই সময়ে পরবর্তী মরসুমের ফসলে যখন মাঠ সবুজ হয়ে উঠেছিল, তখন রাজপ্রতিনিধি সুকণ্ঠ (নামটি স্মরণীয়)[২] তার ময়ূরপঙ্খী বজরার ভাসবার পথ সুগম করবার জন্য নদীতীরে দেওয়া বাঁধ কেটে দিয়েছিল। আশার ফসল নষ্ট হয়ে যায় দেখে চাষিরা ক্ষিপ্ত হয়ে সুকণ্ঠের ওপর চড়াও হয়েছিল, সুকণ্ঠ গুরুতর আহত হয়েছিল। তবে চাষিদের নেতৃস্থানীয় জনার্দনের চেষ্টায় সুকণ্ঠ বেঁচে গিয়েছিল। আহত সুকণ্ঠকে শুশ্রুষা করেছিল জনার্দনের স্ত্রী লক্ষ্মী। সুকণ্ঠ সুস্থ হয়ে উঠে তাকেই অসম্মান করেছিল এবং নিজের অনুচর দিয়ে অপহরণ করেছিল। লক্ষ্মী ছিল জনার্দনের উপদেষ্টা এবং সহকর্মিণী। লক্ষ্মীর পরামর্শে জনার্দন চাষিদের নিয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিল। পাশাপাশি কিছু চাষি সশস্ত্র বিদ্রোহও করেছিল। রাজশক্তির পতন ঘটেছিল। তখন লক্ষ্মীর নির্দেশে সুকণ্ঠ প্রজাদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে থাকে। কারণ নানা ঘটনার মাধ্যমে সুকণ্ঠের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ওই সময়েই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছিল :

'জনার্দন : বিদায় রাজপ্রতিনিধি। বন্দে মাতরম্।
সুকণ্ঠ : সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
সকলে : বন্দে মাতরম্।'

উজানীর চর

স্বাধীনতালাভের প্রায় একশো দিন আগে পালাকার লিখেছিলেন ক্ষুদ্র নাটিকা উজানীর চর। নিজের স্কুলের ছাত্রদের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল ওই নাটিকা। উজানীর চরের প্রথম দৃশ্যটিতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। দুর্ভিক্ষপীড়িত হিন্দু মুসলমান নরনারী দুর্ভিক্ষের কারণরূপে চিনে ফেলেছিল

শাসকগোষ্ঠীকে। তারা শাসকের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন করবার শপথ গ্রহণ করেছিল। সেই সময়ে দুটি ধ্বনি আন্দোলনকারীদের মুখে বসানো হয়েছিল : 'বন্দে মাতরম্' এবং 'আল্লা হো আকবর।'

মনে হয় সেই সময়ে জাতীয় কংগ্রেস দলের পাশাপাশি মুসলিম লিগও বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল বলেই পালাকার ওই দুটি ধ্বনি ব্যবহার করে ব্রিটিশ বিতাড়নে দুটি দলেরই একত্র সংগ্রামের প্রস্তাব রেখেছিলেন। বস্তুত ছেচল্লিশের দাঙ্গার ভ্রাতৃহননের পরে এটাই সবচেয়ে বেশি কাম্য ছিল। পালাকার আলোচ্য দৃশ্যে একটু পরেই দেখিয়েছিলেন যে, হিন্দু (তথা কংগ্রেস) এবং মুসলমান (তথা মুসলিম লিগ)-দের সম্মিলিত আন্দোলন বানচাল করবার জন্য ব্রিটিশ গুলি চালাচ্ছে এবং সেই গুলিতে দুজন আন্দোলনকারী মারা যাচ্ছে—দুঃখীরাম ও হানিফ। হানিফ 'বন্দে মাতরম্' বলতে বলতে মারা গিয়েছিল। পরে হানিফের ধরে থাকা পতাকা তুলে নিয়ে দুঃখীরাম 'আল্লা হো আকবর' এবং 'বন্দে মাতরম্' বলতে বলতে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উজানীর চরের সপ্তম দৃশ্যের গোড়াতেই দাঙ্গাকারীদের 'আল্লা হো আকবর' এবং 'কালী মায়িকি জয়' ধ্বনি দিয়ে হত্যালীলায় মেতে উঠতে দেখা গিয়েছিল। অর্থাৎ তখন কংগ্রেস আসরে ছিল না, ছিল মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার মত সাম্প্রদায়িক দলগুলি। উজানীর চরে দেখা গিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে হিন্দু নেতা যোগেশ আর মুসলমান নেতা জামাল দাঙ্গায় মেতে ওঠে। কিন্তু তাদের ছেলে মহিম আর করিম দাঙ্গায় প্রাণ দিলে তাদের সম্বিৎ ফিরেছিল। মহিম আর করিমের মৃত্যুকালীন সংলাপ ছিল :

'মহিম : আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগ রে সকল দেশ।

করিম : বন্দে মাতরম্। আল্লা হো আকবর।'

অর্থাৎ আবার ওই দুটি ধ্বনি ফিরে এসে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীকেই প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এখানে আর একটু পেছনে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বিশেষ করে যে সম্প্রদায়টি সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, সেটি হল হিন্দু। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে সে সময়ে ভারতের নানা দিকে মুসলমান নবাব বা নেতারা ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, সেই সময়ে কিছু হিন্দু (তাদের মধ্যে বাঙালিরা ছিলেন অনেক) বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। নবাব ও দেশীয় রাজারা ব্রিটিশের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যচালনা পদ্ধতির কাছে পরাভূত হবার পরে দেশবাসীর মুক্তির আকাঙক্ষা যাঁদের নেতৃত্বে স্ফূরিত হচ্ছিল, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মনে-প্রাণে হিন্দু ধর্মের অনুরাগী। এঁরা বাইবেলধারী ব্রিটিশের বিপক্ষে গীতাকেই অবলম্বন করেছিলেন। ফলে প্রথম থেকেই কোরান-হাদিশের প্রেমিক মুসলমানরা এঁদের সঙ্গে মিশতে পারেননি। আবুল কালাম আজাদ, হুমায়ুন কবীর, বাদশা খাঁ, ফজলুল হক প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতারা কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদী অংশটির সঙ্গে মানিয়ে নিলেও, অনেক মুসলমানই মানসিক দিক

থেকে আহত হয়ে হয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল করেছিলেন অথবা কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম্'-কে গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়েছিল সেটি হচ্ছে তার দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ 'ত্বং হি দুর্গা...' ইত্যাদি অংশ। এই অংশে দেশমাতা আর মা দুর্গা একাকার হয়ে গেছে। মূর্তিপুজোর বিরোধী মুসলমানেরা অনেকেই এতে অভিমানাহত হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমান বা অহিন্দু অন্য সম্প্রদায়ের অনেকেই কিন্তু তা সত্ত্বেও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিকে জাগরণের প্রতীক বলে মনে করতেন। এখানে স্মরণীয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি। সেখানে 'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল' বলা হয়েছিল। ওই ক্ষেত্রে কিন্তু বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ ছিল না। ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান এবং ব্রিটিশ শাসক—সবাই বুঝেছিলেন কবি কী বলতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে পালাকারের বিদ্রোহী নজরুল পালার খান মইনুদ্দিনের একটি সংলাপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'বিদ্রোহী কবিতা জাতির বন্দে মাতরম্ গান।' অর্থাৎ সেকুলার বিদ্রোহী কবির অমর সৃষ্টিকে 'বন্দে মাতরম্'-এর সদৃশ বলে মনে করেছিলেন পালাকার, যদিও দুটির রচনাকালের মধ্যে ছিল বেশ কয়েক দশকের ব্যবধান এবং স্রষ্টাদের সামাজিক অবস্থানেও ছিল প্রচুর প্রভেদ। সম্ভবত পরাধীনতা ও দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা দুটি রচনাতেই নিহিত বলে পালাকার এ জাতীয় সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন।

'বন্দে মাতরম্' গানের শেষাংশ হিন্দুর দেবীকে নিয়ে আসবার জন্যই যত ঝামেলা। হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী দুর্গাকে ব্যবহার করেছিলেন দেশমাতার প্রতীকরূপে। এখানে তাঁর সাম্প্রদায়িক কোনো মনোভাব ছিল—এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিকারী কিছু মুসলমান এই ত্রুটিটির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন বা এখনও করছেন। ব্রজেন্দ্রকুমার দে সেই জন্যই বীরাঙ্গনা ভবশংকরী (পালা—বাঘিনী), লক্ষ্মীবাঈ' (ঝাঁসির রানি), প্রীতিলতা (পালা—মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন)-র পাশাপাশি নিয়ে এসেছিলেন সোফিয়া (রাজা দেবিদাস), সখিনা (ঝড়ের দোলা), চাঁদবিবি (পালা—চাঁদবিবি), রিজিয়া (পালা—সুলতানা রিজিয়া)-র মতো অনেক চরিত্র, যাঁদের একদল যেমন হিন্দু ছিলেন, অন্যদল ছিলেন মুসলমান। তাঁর পালার গানে ছিল, 'চাঁদ-কেদারের দেশের মানুষ ঈশা খাঁর বংশধর..' (ঝড়ের দোলা) জাতীয় লাইন। সোনাই দীঘির নিশাচর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গেয়েছিল—'খোদা-ভগবান, ঘুমিয়ে নেই রাখছে হিসাব—সামাল কীর্তিমান।' বাঙালি পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র দায়ুদের মৃত্যুর সময়ে ফকির গেয়েছিলেন—'শিওরে তোমার দাঁড়ায়েছে ভাই খোদা যীশু পরমেশ।'

'বন্দে মাতরম্'-কে কেন্দ্র করে কিছুকাল হল দুই দল রাজনীতিবিদের মধ্যে বচসা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদল 'বন্দে মাতরম্'-এর স্রষ্টাকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করে 'বন্দে মাতরম্'-কে বাতিল করার পক্ষে সওয়াল করছেন। অন্যদল তাঁদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধার অভিযোগ তুলছেন। যাঁরা

বঙ্কিমচন্দ্রকে আদ্যোপান্ত সাম্প্রদায়িক বলছেন, তাঁদের আচরণ প্রসঙ্গে অনীক পত্রিকার জুন, ১৯৭৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—'যদিও বামপন্থার ঝাণ্ডা উড়িয়ে এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করা হয়েছে তবুও প্রার্থী নির্বাচনের সময় আমাদের বামপন্থীরা কংগ্রেস বা অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলের মতোই হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে হিন্দু বামপন্থী এবং মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে মুসলমান বামপন্থী খুঁজে প্রার্থী নির্বাচিত করেছেন।... এটা তাঁরা করেছেন যে-কোনো মন্ত্রে নির্বাচনী বৈতরণী পেরোতে হবে এই সুবিধাবাদী রাজনীতি করার তাড়নায়' (পৃষ্ঠা-৩)।

প্রতিদান

ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর নাটিকা প্রতিদানে (রচনাকাল ১৯৫৪) দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে তুলে ধরে শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত করেছিলেন। প্রতিদানের গোড়াতেই কংগ্রেসের জনসভা দেখানো হয়েছিল। নেতা নবকৃষ্ণের জ্বালাময়ী ভাষণের শেষ হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে। পরে সমবেত কর্মীরাও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়েছিল। বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বি সি এস-এ প্রথম স্থানাধিকারী অধীর মল্লিক নিয়োগপত্র ছিঁড়ে ফেলে কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিল। উৎসাহিত কর্মীরা তখন আবার 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়েছিল। নেতা নবকৃষ্ণ ওই সভাতেই অধীরকে বলেছিল, 'এ স্বার্থত্যাগ কখনও বৃথা যাবে না। দেশ যেদিন স্বাধীন হবে, এর প্রতিদান তুমি নিশ্চয়ই পাবে।' এর পরে সে আবার 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করেছিল। সভা শেষ হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে। অবশ্য 'ত্বং হি দুর্গা' অংশটি গীত হয়নি।

এর পরে অধীর কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিল। নবকৃষ্ণ ও তার শিষ্য কমল এক সময়ে ট্রাম-বাস পোড়ানো এবং ব্রিটিশ মহিলাদের খুন করায় মেতে ওঠে। তারা না জানিয়ে অধীরের হাতে একটি বোমাভর্তি ব্যাগ রেখে যায়। অধীর পুলিশের কাছে ধরা পড়ে, প্রহৃত হয় এবং তার জেল হয়।

দেশ স্বাধীন হয় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্য দিয়ে। অধীর চাকরি না নেবার ফলে তার পরিবারের কেউ অনাহারে মারা যায়, কেউ স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। দেনার দায়ে বাড়ি দখল হয়ে যায়। অধীরের ছোটো ভাই স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে 'বন্দেমাতরম্' শুনে গান গায়, 'স্বাধীনতা চাই নে শ্যামা, শুধু দুটি খেতে দে' (তুলনীয় বিদ্রোহী কবির 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন...')। অধীরের মেজভাই সুধীর পড়া ছেড়ে চানাচুর বিক্রি করে সংসার চালাত। স্বাধীনতার প্রথম দিনে ভলন্টান্টিয়ার্সের শ্লোগান শুনে যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। পরে তার জ্ঞান ফেরে কিন্তু মানসিক স্থৈর্য ফেরে না, সে পাগল হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পরে অধীরের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। সে একদিন নবকৃষ্ণের কাছে চাকরির দাবি জানালে নবকৃষ্ণের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। ক্ষিপ্ত অধীরের মুখে তখন এই সংলাপ ছিল :

অধীর : তুমি রোদের আঁচ না লাগিয়ে—সংঘের fund চুরি করে মাননীয় মন্ত্রী হয়ে বসবে কেন? কোন্ গুণে তুমি সরকারি অর্থে মোটর হাঁকিয়ে যাবে আর কাদা ছিটকে আসবে আমাদের গায়ে?...ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে যারা রক্ত দিয়েছে,—তোমাদের মত দিশি শয়তানদের তারাই আজ কান ধরে নামিয়ে দেবে। দরকার হয়, তার জন্য আবার আমরা বুকের রক্ত ঢেলে দেব।

অতঃপর নবকৃষ্ণের হাতে অধীর খুন হয়ে যায়। বিচারে নবকৃষ্ণ বেকসুর খালাস পায়। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্য দিয়ে তাকে জনতা বরণ করে নেয়।

প্রতিদান নাটকে 'বন্দে মাতরম্'-এর অপব্যবহারের দিকটিকেই ব্রজেন্দ্রকুমার তুলে ধরেছিলেন। বস্তুত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি কংগ্রেস দলের কর্মীরা যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সদস্যরাও এটি প্রয়োগ করতেন। ১৯৪৭-এ ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরে কংগ্রেসের হাতে শাসনভার চলে এসেছিল। সেই সুযোগে বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তি প্রশাসনের নানা স্তরে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নেওয়া শুরু করেছিল। সংবিধান রচিত হবার কালেই তেভাগা ও তেলেঙ্গানার আন্দোলন দমন, কম্যুনিস্ট দলকে নিষিদ্ধ করা, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের প্রতি নানা নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখা প্রভৃতি নানা কাজের মাধ্যমে কংগ্রেস দল বহু মানুষের বিশ্বাস হারিয়েছিল। তখনও কংগ্রেস কর্মীরা খদ্দর পরতেন, 'বন্দে মাতরম্' বলতেন এবং প্রকারান্তরে জানিয়ে দিতেন যে, ভারতের স্বাধীনতা তাঁরাই এনেছেন। সেই সময়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির অপব্যবহার লক্ষ্য করেছিলেন পালাকার। তাঁর সেই অভিজ্ঞতাই প্রতিদানে বর্ণিত হয়েছিল।

পালাকার ক্রমশই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর বাসস্থান যে কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল সেই ব্যারাকপুর থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন অকংগ্রেসি প্রার্থী পঞ্চানন ভট্টাচার্য। তাঁর নির্বাচিত হবার পেছনে ওই অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল। সেইসব বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার। ব্রজেন্দ্রকুমার যে কতখানি বিরক্ত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ অধীরের সংলাপেই পাওয়া যায়। সেখানে ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রীদের 'দিশি শয়তান' বলেছিলেন তিনি অধীরের মুখ দিয়ে। খুনের অপরাধী আইনের ফাঁকে ছাড়া পেয়ে এসে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির দ্বারাই সংবর্ধিত হয়েছিল। পালাকার বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন যে ব্রিটিশ রাজত্বে যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে দেশপ্রেমিকেরা প্রাণ দিতেন, স্বাধীন ভারতে সেই ধ্বনি অসাধুদের শ্লোগানে পরিণত হয়েছিল ; ফলত স্বাধীন ভারতে যাদের জন্ম তাদের কাছে 'বন্দে মাতরম্' কোনো মহান গুরুত্ব বহন করতে পারেনি।

স্বামীর ঘর

কিন্তু পালাকার যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, তার প্রমাণ

রয়ে গেছে স্বাধীন ভারতে লেখা স্বামীর ঘর পালায়। পালার ভূমিকায় তিনি কংগ্রেসি শাসনকে 'বুলেটরাজ' আখ্যা দিয়েছিলেন। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন, 'ফাঁসীর মঞ্চে যাঁহারা জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের সাধনার ফল আজ অপরে ভোগ করিয়া জনসাধারণের গায়ে খোসা ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে, দেশের সেই শহীদগণের চরণ-স্মরণে স্বামীর ঘর উৎসর্গীকৃত হইল।' অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতা এসেছিল বিপ্লবীদের (এঁদের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকেরাও আছেন) আঘাতের জন্য। কংগ্রেস দল স্বাধীনতা ভোক্তা, কিন্তু আনয়নকারী নয়। 'স্বামীর ঘর' পালায় তিনি দেখিয়েছিলেন শাসকশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে নিপীড়িত দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকই জয়ী হয়েছিল। কিন্তু তিনি এটা মনে করেননি যে, কম্যুনিস্ট পার্টি ওই সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবে। তখন কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল খুবই ছোটো। তিনি সম্ভবত চেয়েছিলেন, সব দল ও মতের সৎ মানুষেরা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুক। তারা আবার ব্রিটিশ ভারতের মতোই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সম্বল করেই একত্রিত হোক—এটাই ছিল তার কামনা। পালার বিপ্লবী নায়ক তার ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিল খদ্দরের পোষাক আর কানে দিয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র। শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক নেত্রী বন্দনাকে দীক্ষাও সে দিয়েছিল একই ভাবে :

সত্যকাম।। প্রণাম করুন—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্

বন্দনা।। বন্দে মাতরম্।

এর ঠিক পরের দৃশ্যে সত্যকামের ছেলের মুখে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গানটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। মা-দিদিমা কারও তাড়নাতেই বিকর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া আর খদ্দর পরা ছাড়েনি। সামান্য পরে রাজসৈন্য বিপ্লবীদের গ্রাম আক্রমণ করতে এলে তারা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' বলতে বলতেই। যুদ্ধে বিকর্ণ এবং আর এক বিপ্লবী উদয়ন প্রাণ দিয়েছিল। দুজনেই মৃত্যুর মুহূর্তে 'বন্দে মাতরম্' বলেছিল, যা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বিপ্লবীরা সবাই করতেন। পালার শেষে অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠী পরাজিত হয়েছিল। বিপ্লবীরা বন্দনাকে শাসনভার দিয়েছিল। সে সময়েই পালার সমাপ্তি হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্'-এরই মধ্য দিয়ে।

মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন

'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির পাশাপাশি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিও ব্রজেন্দ্রকুমার ব্যবহার করেছিলেন 'মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন' পালায়। যে সভায় মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনসহ অন্যান্য কাদের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেখানে বিদ্রোহী কবির 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু...' গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল। গানের শেষে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি প্রযুক্ত হয়েছিল। ওই দৃশ্যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিও পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছিল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করা, রেল লাইন অকেজো করে

দেওয়া প্রভৃতি কাজের সময় বিপ্লবীরা ঘনঘন 'বন্দে মাতরম্' বলেছিলেন, পালাতে এভাবেই দেখানো হয়েছিল। জেল-হাজতে থাকবার সময়েও বিপ্লবীরা ওই দুটি ধ্বনিই উচ্চারণ করেছেন—এমনই চিত্রিত হয়েছে। প্রীতিলতা ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করবার সময়েও 'বন্দে মাতরম্' বলেছিলেন। মাস্টারদার ফাঁসির সময়ে ব্রজেন্দ্রকুমার একটি রূপকল্প এনেছিলেন। আন্দামানে বন্দী চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সে সময়ে যেন মাস্টারদার কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' এবং 'ইনকিলাব' শুনছেন এবং তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'বন্দে মাতরম্' ও 'জিন্দাবাদ' উচ্চারণ করছেন। এ ছাড়া তাঁর মঞ্চনাটক মহাযুদ্ধের বলিতেও তিনি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি ব্যবহার করেছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে প্রয়াসী বিপ্লবীদের কণ্ঠে।

ধরার দেবতা

গান্ধিজির জীবনের শেষ পর্ব নিয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার লিখেছিলেন রূপক পালানাটক—ধরার দেবতা। সেই পালায় 'বন্দে মাতরম্' বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রিটিশ আমলে বিংশ শতাব্দীতে 'বন্দে মাতরম্' বলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষ কারাবরণ করত। ধরার দেবতার দ্বিতীয় দৃশ্যেই অসহযোগ আন্দোলনকারীদের 'বন্দে মাতরম্' বলে প্রহৃত ও গ্রেফতার হতে দেখা গিয়েছিল। স্বাধীনতাও এসেছিল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্য দিয়ে। কিন্তু পালাকার বহু ব্যবহৃত 'বন্দে মাতরম্'-র চেয়েও তীব্রতা দেখিয়েছিলেন 'ভারত ছাড়ো' ধ্বনির মধ্যে। পালার মধ্যে এটাও পালাকার দেখিয়েছিলেন যে, ভারত ছাড় আন্দোলনের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ব্রিটিশ সরকার দাঙ্গার আশ্রয় নিয়েছিল। সেই দাঙ্গার সময়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি হারিয়ে গিয়েছিল। তার বদলে জয় মা দুর্গে, নারায়ণ জাগৃহি ইত্যাদি ধ্বনিত হচ্ছিল।

বাস্তবে যেটা ঘটেছিল, সেটা হচ্ছে কংগ্রেসে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকবার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুত্ব প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হত। আর এর পরিণামে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা পর্যায়ে বহু মুসলমান স্বাধীনতা কর্মী কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' সে সময়ে তাঁদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই নিরিখে পরবর্তীকালের 'ভারত ছাড়ো', 'জয় হিন্দ' বা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি হিন্দু-মুসলমান-শিখ-বৌদ্ধ সকলের কাছেই বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। 'বন্দে মাতরম্' বলে আসফাউল্লার মতো অনেক মুসলমান বিপ্লবী প্রাণ দিলেও, অন্য শ্লোগানগুলি ছিল অনেক সেকুলার। আর এটা হয়েছিল 'বন্দেমাতরম্' গানের শেষ দিকটির জন্য।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তমলুকে কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান ও কম্যুনিস্ট—সবাই একত্রে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। সাঁতারাতে ওই সময়ে যাঁরা স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদীরাও ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই সেখানে সবার ওপরে স্থান পেয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্' সেই কাজ করেনি তা নয়, যথেষ্টই

করেছে। আনন্দমঠের সন্তানেরা 'হরে মুরারে মধুকৈটভহারে' বললেও তাদের সাংগঠনিক শক্তি, সংগ্রামে ব্রতী হওয়া এবং মৃত্যুবরণ করার কাহিনি যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু শুধু নয়, অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বহু সচেতন মানুষ বিদেশি শাসকের চিতারোহনে ওই 'বন্দে মাতরম্'-কেই শ্লোগানরূপে মেনে নিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমার এটাও যে বুঝেছিলেন, তার প্রমাণও রয়ে গেছে ধরার দেবতা পালার নন্দিনী চরিত্রে। নন্দিনী মা ছিলেন না, সেই 'ত্বাং হি দুর্গা-র বদলে ছিলেন 'মেয়ে'। তার মুখে গান ছিল, 'পাগল ছেলে, যাস নে ফেলে বন্দিনী মায় অন্ধকারে।' এই গানটির কোথাও অবশ্য তিনি দুর্গা বা লক্ষ্মীর বন্দনা করেননি। বরং লিখেছিলেন, 'দুঃখনিশি হবে ভোর, ডাকছে পাখী উষার দ্বারে।'

মায়ের ডাক

ব্রজেন্দ্রকুমার শেষজীবনে বক্তৃতা জয়হিন্দ্ বলে শেষ করতেন। তাঁর মায়ের ডাক পালায় 'জয়হিন্দ্'-র ব্যবহার দেখা গেছে। 'জয়হিন্দ্'-এর স্রষ্টা নেতাজীকেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো সংগ্রামীরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনকে তিনি 'লাঠি' বলেছিলেন। সেই সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামকে চিহ্নিত করেছিলেন 'গোলা' রূপে। পালার দুটি স্থানে তিনি 'বন্দেমাতরম'-এর পাশাপাশি 'জয়হিন্দ্' বসিয়েছিলেন। প্রথমবার নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের সময়ে শরৎ বসু ও সুভাষ বসুর মুখে যথাক্রমে 'বন্দে মাতরম্' ও জয়হিন্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে নেহেরুর মুখে এই দুটি শ্লোগানই বসিয়ে পালা শেষ করেছিলেন। মায়ের ডাক পালার শেষ দৃশ্যটি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। সেখানে প্রচারিত হয়েছিল যে, নেতাজি প্রয়াত। কিন্তু তাঁর সংগ্রাম ভারতবাসীকে তীব্র আন্দোলনের পথে এগিয়ে দিয়েছে। সেই আন্দোলনের তীব্রতাই ব্রিটিশকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেছে—পালায় এই ছিল তাঁর বিশ্লেষণ। অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার বিশ্বাস করতেন 'বন্দে মাতরম্' তীব্র ব্রিটিশ বিরোধে সংপৃক্ত হলেও, 'জয়হিন্দ্' ছিল তীব্রতর। কারণ পাকিস্তান প্রস্তাব ওঠবার সময়ে কংগ্রেসের বহু মুসলমান নেতা বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে 'জয়হিন্দ্' ধ্বনিকে সামনে রেখে নেতাজির নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সায়গল-শাহনওয়াজ-ধিলোঁ স্বাধীনতা-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

মায়ের ডাক পালার সূচনার দৃশ্যেই একটি গান দিয়েছিলেন পালাকার : 'ও মা শ্যামা জননি!' সেখানে দেশকেই 'জননী' বলা হয়েছিল। সেখানে এ-ও বলা হয়েছিল 'আমার চোখে নাই ভগবান, শুধুই শ্যামা মা-টি।' পালার শেষ দিকে আরও একটি গানের লাইন ছিল, 'তোমার নামে হোক মা আমার এ জীবনের শেষ।' এখানেও মা ছিল সেই দেশজননী। তাকে কোনো দেবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়নি। ওই পালায় আজাদহিন্দ ফৌজের নারী বাহিনীর (ঝাঁসির রানি বাহিনী) সমবেত মার্চিং সঙেও ছিল 'বন্দিনী মা-র

মুক্তি লাগি মা-বোনেরা ওঠ্‌রে জাগি'। এখানেও দেবীর রূপকল্প ব্যবহৃত হয়নি। শ্যামা মা কালীর রূপকল্প বহন করেনি, 'শষ্য শ্যামলাং মাতরম্'-কে প্রকাশ করেছে।

রাজসন্ন্যাসী

'বন্দে মাতরম্' স্তোত্রটি তাঁকে যে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ রয়ে গেছে রাজসন্ন্যাসী পালার একটি সংলাপে। ভাওয়ালের সন্ন্যাসী রাজকুমার নিয়ে লেখা ওই পালায় স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায় (মৃত বলে ঘোষিত) সেজকুমার দেশে ফিরে এসে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। দেশে এসে তার কাছে সবই চেনা মনে হচ্ছিল। একটি লিরিকপূর্ণ সংলাপের পরে একটি গান ছিল। তারপরেই আবার সে বলেছিল :

কে বা ওই কাঁদিছে করুণে?
আয় আয় আয় বলে
কে ও নারী করে আবাহন?
মনে হয়, ওই কোলে ছিল মোর
পরম আশ্রয়, ওই কোলে মাথা রাখি
অন্তিমে মুদ্রিত হবে আঁখি।
মাথা মোর নত হয়ে আসে,
প্রাণ চাহে করপুটে করিতে বন্দনা—
'শুভ্র জ্যোৎস্ন-পুলকিত যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।

লক্ষণীয় 'বন্দে মাতরম্' শব্দ দুটি ব্যবহার না করলেও পরের কয়েকটি লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়া দেশকে মায়ের রূপে ধরা হয়েছে। 'ত্বং হি দুর্গা' না পছন্দ হলেও দেশকে মা বলতে তো কোনো বাধা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সাম্যবাদী নেতাও তো 'পিতৃভূমি' রক্ষার জন্য দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন। Fatherland আর Mother Country শব্দ দুটি তো বহু বছর ধরেই পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত।

বাঙালি

'বাঙালি' ব্রজেন্দ্রকুমারের একটি অতি পরিচিত জনপ্রিয় পালা। বাঙালি পালার একটি দৃশ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার সত্যপীর নামক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রকাশ করেছিলেন। সত্যপীর হিন্দুমায়ের ছেলে, পরে মুসলমানের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিল।

দুটি ধর্মের প্রতিই সে বিরক্ত হয়ে নতুন এক ধর্মমত প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিল। নবাব দায়ুদ খাঁ তাকে সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে দায়ুদ খাঁর সংলাপ অবশ্যই মনে পড়িয়ে দেয় 'বন্দে মাতরম্' গানকে :

দায়ুদ।। তুমি হিন্দু বা মুসলমান হতে যেয়ো না। তুমি হবে মানুষ। তোমার দেবতাকে তুমি আরাধনা না করেই পেয়েছ।

সত্যপীর।। কে? কে সে দেবতা, যাকে চাওয়ার আগেই পাওয়া যায়?

দায়ুদ।। তোমার জন্মভূমি। এই সুজলা সুফলা বঙ্গজননী, তোমার সে আরাধনার ধন।

লক্ষণীয় এখানে দেশজননী বা মা রূপেই বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু তাকে দুর্গা বা হিন্দুর কোনো দেবীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়নি। এর পরে ফকিরের একটি গানও ছিল। সে গানেও 'বাংলা মা' বলা হয়েছিল। কিন্তু তাকে কারও সঙ্গে তুলনা করা হয়নি।

উপসংহার

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ব্রজেন্দ্রকুমার 'বন্দে মাতরম্' গানটিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। গানটির যে প্রভাব স্বাধীনতা আন্দোলনে পড়েছিল, তাকে স্মরণ করেছিলেন, নিজের পালায় বারবার তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু গানটির শেষাংশের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন সেটিকে কাটিয়ে উঠতে। ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধকে সরিয়ে রেখে ধর্মনিরপেক্ষ দেশাত্মবোধ প্রচার করেছিলেন তাঁর নানা পালায়। 'বন্দে মাতরম্'-এর পাশাপাশি 'ভারত ছাড়ো,' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'জয়হিন্দ' ধ্বনিগুলিকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁর নানা সৃষ্টিতে। একই সঙ্গে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 'বন্দে মাতরম্' গানের দ্বিতীয়াংশ বাদ দেবার প্রস্তাবও পরোক্ষে সমর্থন করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' শব্দযুগ্মের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু এর কট্টর-বিরোধী বনে যাননি। আবার নিজের হিন্দু পটভূমি সত্ত্বেও হন এর যুক্তিহীন ভক্ত।

উল্লিখিত পালাগুলির রচনাকাল :

(পালায়িত) আনন্দমঠ—১৯৪৯, আকালের দেশ—১৯৪৩, উজানীর চর—১৯৪৭, প্রতিদান—১৯৫৫, স্বামীর ঘর—১৯৪৯, মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন—১৯৬৯, ধরার দেবতা—১৯৪৮, মায়ের ডাক—১৯৪৫, রাজসন্ন্যাসী—১৯৪৭, বাঙালি—১৯৪৬।

তথ্যসূত্র ও নির্দেশিকা :

১. ব্রিটিশের রোষসিক্ত পালাগুলি কিন্তু ছাপা হয়নি, হারিয়ে গেছে। যেগুলি ছাপা হয়েছিল, তাতে কাঁচি চালানো হয়েছিল। ফলে মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রকৃতপক্ষে কী ছিল জানা অসম্ভব।

২. সাধারণত শঠ ও অত্যাচারী শাসকেরা প্রকাশ্যে মধুরভাষী হন। সেটাই তাদের কৌশল। আকালের দেশের সুকণ্ঠ, রক্তের নেশার মধুকণ্ঠ নামের উৎস সেখানেই নিহিত ছিল।

বন্দে মাতরম্—শতবর্ষের আলোকে

অসীম মুখোপাধ্যায়

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর অক্ষয় নবমীর দিন বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত এই গান—'বন্দে মাতরম্'। এই গানটি তাঁর *আনন্দমঠ* উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এটি জাতীয় প্রেরণার পবিত্র মহাকাব্য।

তাঁর এই উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদ উল্লেখনীয়—

'সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনিতে দুই জনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোকাতুর, গর্বিত কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ হাস্য মুখ, বাঙ্ময়, প্রিয় সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্তার জন্য বড়ো ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যাম করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন :

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা, সুফলা মলয়জ শীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে—জিজ্ঞাসা করিল ; 'মাতা কে?'

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাহিতে লাগিলেন :

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্ল কুসমিত দ্রমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং, সুমধুর ভাষিনীম
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র বলিল, 'এত দেশ, এত মা নয়—'

ভবানন্দ বলিল, 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ সমীরণশীতলা, শস্যশ্যামল' :

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বললেন আবার গাও :

ভবানন্দ আবার গাহিলেন—'বন্দে মাতরম'...।

বাংলাদেশে যে জাতীয়বাদ ও রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ হয় তা আকস্মিক ঘটনা নয়; এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের বহু ঘাতপ্রতিঘাতের ইতিহাস।

সিপাহি বিদ্রোহের সংগ্রামী ঐতিহ্য, নীলকর চাষিদের ওপর ইংরেজ বণিকের অকথ্য অত্যাচার, হিন্দুমেলার প্রভাব, মধ্যবিত্তদের মধ্যে পাশ্চাত্য ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাব, স্বাধীনচেতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, নতুন-কাব্য সাহিত্য-নাটকের সৃষ্টি, ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে নতুন বিচারধারা ও চিন্তার প্রসার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয়দের নিয়ে সিভিল সার্ভিস তৈরি করার আন্দোলন, রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-কে কেন্দ্র করে ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিপ্লবী ও দেশমাতৃকার সেবা, বিবেকানন্দের যুগান্তকারী শিকাগো বক্তৃতা, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সতীশচন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে 'অনুশীলন সমিতির জন্ম এবং জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের মধ্যে দিয়েই দেশবাসীর মনে তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষ ও জাতীয় চেতনার জন্ম হয়।

বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও লালা লাজপত যে ভারতকেন্দ্রিক চিন্তাধারার প্লাবন আনলেন, তার বীজ বপন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, তাঁর মাতৃমন্ত্র ও 'বন্দে মাতরম্' সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার প্রথম অনুপ্রেরণা জোগালো। তারপর বিবেকানন্দ তো দেশের যুবক সমাজকে সোজাসুজি বললেন, ঠাকুর-দেবতাদের পঞ্চাশ বছর ঘুমুতে দাও। এখন তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হচ্ছে মাতৃভূমি। এই মাতৃভূমির মুক্তির জন্য নির্ভয়ে আত্মবলিদান দিতে হবে।

বঙ্কিমের মাতৃমন্ত্র আর বিবেকানন্দের আত্মবলিদানের উদাত্ত আহ্বানেই বাংলার যুবকরা দীক্ষিত হল বিপ্লবমন্ত্রে। এই বিপ্লবীর দলই জোয়ার আনলো স্বদেশি আন্দোলনে এবং স্বদেশি আন্দোলন থেকেও কর্মী এল বিপ্লবী দলে।

সমগ্র বাঙালি জাতির প্রতি কার্জনের অপমান, অবিচার, অত্যাচার ও উপেক্ষা ইংরেজ-বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠে এবং আগুনে প্রথম ঘৃতাহুতি দিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পত্রিকা 'সন্ধ্যা'। সন্ধ্যার প্রকাশ্যে সকলে গায় :

যায় যাবে জীবন চলে

জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' বলে—

শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করে ফিরে এসে এক সংবর্ধনা সভায় বিবেকানন্দ বলেন—আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্যা দেবতা হ্উন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোনো ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন। তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—উনি বলেন, 'পরাধীন জাতির কোনো ধর্ম থাকতে পারে না, একমাত্র ধর্ম হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন।'

বিবেকানন্দের প্রভাবেই লক্ষ লক্ষ যুবকের মনে দেখা দিল দেশপ্রেমের জোয়ার, স্বাধীনতা অর্জনের তীব্র বাসনা। বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে দিয়েছিলেন বন্দেমাতরম্ মন্ত্র, গড়েছিলেন দেশ মাতৃকার মূর্তি। বিবেকানন্দ শুধু সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠাই করলেন না, দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মৃত্যু ভয়হীন বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পর্বও শুরু করে দিলেন। এই পটভূমিকাতে বিপ্লব যজ্ঞের হোতা অরবিন্দের আবির্ভাব।

বিবেকানন্দের জাপানি ভক্ত ওকাকুরার অনুপ্রেরণাতেই অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা ও বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা হলেন অনুশীলন সমিতির অন্যতম পরিচালিকা।

১৯ জুন ১৯০২ কলিকাতায় মহাসমারোহে পালিত হল শিবাজি উৎসব। বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের গুণগ্রাহী সমর্থক মহারাষ্ট্র কেশরী বালগঙ্গাধর তিলককে আমন্ত্রণ জানানো হল কলকাতার শিবাজি উৎসবে। তিলককে সংবর্ধনা জানানোর জন্য সেদিন হাওড়া স্টেশন জনসমুদ্র। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই শুরু হল সহস্র কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি আর তিলক মহারাজ কী জয়।

শিবাজি উৎসবের প্লাবনের সময়ই রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় দীর্ঘ কবিতা রচিত হল 'শিবাজি উৎসব' :

কোন্ দূর শতাব্দের
কোনো এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে
অরণ্যের অন্ধকারে বসে
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া

এই দমননীতি আরও প্রকট হইয়া উঠিল। ... নিষিদ্ধ আচরণগুলি এই ঃ রাস্তায় বা প্রকাশ্যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা।

৬. কলিকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় রিপোর্ট বাহির হইল—সারা অক্টোবর মাসে (১৯০৫), বিশেষত পূজার সময়, সমগ্র বরিশাল জেলায় ... শহরে ও জিলার সর্বত্র সভাসমিতির অধিবেশন হইতেছে এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করিতেছে। কোনো কোনো স্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হইয়াছে।

৭. হুকুমের পর হুকুম জারি করিয়া ফুলার সাহেব প্রকাশ্য স্থানে সভাসমিতি বন্ধ করিয়াছেন। কোনো ছাত্র বা অন্য কেউ রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিলেই পুলিশ তাহাকে ফৌজদারি কয়েদীর মতো গ্রেপ্তার করে।

৮. পরদিন দুপুরবেলা (১৯০৬ সনের ১৪ই এপ্রিল, বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে) সভাপতি এ. রসুল ও তাঁহার বিলাতী মেম গাড়িতে এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল ঘোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পদব্রজে চলিলেন। তাঁহাদের কেহ বাধা দিল না। কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে 'বন্দে মাতরম্' ব্যাজ ধারণ করিয়া যুবকের দল যেই রাস্তায় আসিল, অমনি ছয় ফুট লম্বা মোটা লাঠি দিয়া পুলিশ তাহাদের গুরুতর প্রহার করিতে লাগিল এবং 'বন্দে মাতরম' ব্যাজ জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে মারিতে মারিতে পার্শ্বের পুকুরে ফেলিয়া দিল। কিন্তু এই অবস্থাতেও সে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে বিরত হইল না।

৯. চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীর মুখপত্র 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় জ্বালাময়ী ও অনন্যসাধারণ ভাষায় তাঁহার (ফুলারের) বিরুদ্ধে যে সকল লেখা প্রকাশিত হইত তাহার জন্য সম্পাদক হিসেবে অরবিন্দ ঘোষ বিদ্রোহের অভিযুগে অভিযুক্ত হইলেন (১৯০৭, আগস্ট)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিবর্তনের পথ সন্ধান করা যেতে পারে। ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায় পরিচালিত শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন। ১৩১৪ সালের ৯ই ভাদ্র আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখছেন, 'Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দে মাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভালো কাগজ হয়েচে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানি নে।' মধ্যে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীর সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও বরিশালের সম্মিলনী পুলিশের তাণ্ডবে অনুষ্ঠিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সভাপতি হওয়া নিয়ে কাগজপত্রে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল, মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন *বঙ্গবাসী* সাপ্তাহিক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যোগ্য সভাপতি কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু বা নবীনচন্দ্র সেনকে আগে সভাপতি

করা উচিত ছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ২৫ চৈত্র ১৩১২ আগরতলা থেকে চিঠি লিখছেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ঘুরিয়া মরিতেছি। সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়ে গেছি। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা কিন্তু আমার মন বিদ্রোহী হইতেছে। বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে। শনি আমাকে ঘুরাইতেছে। রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না।'

এই বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

> পরযুগে অনেকে বলিতেন যে, গভর্মেন্টের ধর্ষণনীতি অবলম্বনের পর হইতে কবি রাজনীতির পথ ত্যাগ করেন। সেকথা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সহিত যথার্থভাবে তিন মাস মাত্র যুক্ত ছিলেন—১৩১২ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'বিদায়' কবিতায় প্রকাশ করেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস : 'বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই। কাজের পথে আমি তো আর নাই।' এইটি লিখিত হয় চৈত্রমাসে (১৩১২)। তখনো বরিশালের যজ্ঞভঙ্গ হয় নাই, ইংরেজের রুদ্রশাসন দেখা দেয় নাই। বাংলাদেশে রুদ্রপন্থীদের রাজনৈতিক ইত্যাদি সংঘটিত হয় নাই। ... বাঙালি তাঁহার গানগুলি কণ্ঠে তুলিয়া লইল। তাঁহার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিল না।

গানগুলি কী? রবীন্দ্রনাথ এসময়ে প্রবলভাবে স্বদেশি গান লিখছেন। ১৩১২ ভাদ্র-আশ্বিনের ভাণ্ডারে প্রকাশ হল পনেরোটি স্বদেশি গান। ১৩১২ আশ্বিনের বঙ্গদর্শনে দুটো স্বদেশি গান। ১৩১২ কার্তিকের বঙ্গদর্শনে তিনটি স্বদেশি গান। এই সব গানগুলোর মধ্যে দেশকে 'মা' বলে ভাবা হয়েছে (বন্দেমাতরম্ গানের মতো) এই এই গানে : (১) আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি। (২) মা কি তুই পরের দ্বারে। (৩) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক। (৪) আমার সোনার বাংলা। (৫) ও আমার দেশের মাটি। (৬) সার্থক জনম আমার। (৭) আমরা পথে পথে যাব সারে সারে।

লক্ষ্য করবার বিষয়, গীতবিতানে যে ৪৬টি স্বদেশমূলক গান সংগৃহীত হয়েছে, তার ২৩টি গানই ১৩১২ সালে রচিত, ১০টি গান ১৩১২ সালে আগে এবং বাকি ১৩টি মাত্র ১৩১২-এর পর। পরবর্তী গানগুলো বেশির ভাগই নাটক রচনার সূত্রে প্রস্তুত। প্রমদারঞ্জন ঘোষ তাঁর 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন' (১৯৬৩) গ্রন্থে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের নাতি স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনেছি, ওই যুগে দেশের গান রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জল ঝরতো।'

পরবর্তীযুগে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশমূলক গান লেখেননি কেন? এলমহার্স্ট তাঁর Poet and Plowman গ্রন্থে ১৯২২ সালের ১৫ মার্চের দিনলিপিতে লিখেছেন

> My father was', Rathi said, "warned by the British Government not to compose any more songs that might fire patriotic fervour.'

রোটেনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলি রক্ষিত হয়েছে যে গ্রন্থে, Imperfect Encounter, সেই গ্রন্থেও আমরা খবর পাচ্ছি লর্ড কার্জন কী পরিমাণ ক্রুদ্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ওপর। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যাণ্ডে গেলেন তখন সেখানকার রবীন্দ্র-অনুরাগীরা চেষ্টা করেছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কোনো ডিগ্রি দেওয়ানোতে। অক্সফোর্ডের চ্যান্সেলর তখন লর্ড কার্জন। ফক্স স্ট্র্যাঙওয়েজ তাঁর ধারণা বলছেন :

লর্ড কার্জন did not wish a University of which he is Chancellor to take public notice of one who had added politically to the labours of the Viceroy.

এর আগে, ১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গ-আসাম সরকারের গোপন ইস্তাহারের ফলে শান্তিনিকেতন সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের পক্ষে শিক্ষার অনুপযোগী বিবেচিত হয়েছিল, ছাত্ররা দলে দলে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেছিল এবং শিক্ষক হীরালাল সেনকেও শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের জন্য একটা কোড নম্বরও ধার্য করেছিল পুলিশ।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ভয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের কথা ভাববেন না, এটা অনুমান করা শক্ত. অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *ঘরোয়া* গ্রন্থে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন অন্যদের সঙ্গে তখন পুলিশ প্রায়ই হানা দিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ্য সভায় পাঠ করেছিলেন অথবা প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

দেশনায়ক : ১৩১৩, ১৫ বৈশাখ, পশুপতি বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে।

স্বদেশি আন্দোলন : ১৩১৩, কার্তিক, ভাণ্ডার, ডন সোসাইটির সভায়।

সাহিত্য সম্মেলন : ১৩১৩ কলিকাতা কংগ্রেসের সাহিত্যসম্মেলন।

ব্যাধি ও প্রতিকার : ১৩১৪ শ্রাবণ, *প্রবাসী*

যজ্ঞভঙ্গ : ১৩১৪ *প্রবাসী*

পাবনা সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ : ১৩১৪

পথ ও পাথেয় : ১৩১৫, ১২ জ্যৈষ্ঠ, *চৈতন্য লাইব্রেরি*

সমস্যা : ১৩১৫, আষাঢ়, *প্রবাসী*

সদুপায় : ১৩১৫, শ্রাবণ, *প্রবাসী*

পূর্ব ও পশ্চিম : ১৩১৫, ভাদ্র, *প্রবাসী*

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সংক্ষিপ্ত) : ১৩১৫ ভাদ্র, *বঙ্গদর্শন*

দেশহিত : ১৩১৫ আশ্বিন, *বঙ্গদর্শন*

১৩১৫-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় বহু পরে ১৩২৬ সালে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতাপাঠের সময়।

রাজরোষের ভয়ে না হলেও, 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে রবীন্দ্রদৃষ্টি পালটাচ্ছে বোঝা যায়, এই সময়কার তাঁর বিবর্তন লক্ষ্য করলে। ১৩১৩ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সাহিত্যসম্মেলনেও তিনি 'বন্দে মাতরম্'কে মহামন্ত্র বলছেন। কিন্তু সুরাট কংগ্রেসের তাণ্ডবের পর ১৩১৪ সালের ২৩ পৌষ রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন—

> আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়, আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।

'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে মত পরিবর্তন দুটো কারণে ঘটছে। একটা, দেশের লোকের 'বন্দে মাতরম্' আওড়ানোই কেবল তাঁর ভালো লাগছিল না, সেই মন্ত্রের সঙ্গে প্রকৃত দেশসেবার কোনো যোগাযোগ ছিল না বলে। ২,৩ দ্বিতীয় কারণ, দেশকে মা বলে ভাবা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না।

দ্বিতীয় কারণটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনে সাকার দেশমাতৃকা কল্পনা কতটা কষ্টসাধ্য ছিল, তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে, রথীন্দ্রনাথের আচরণে। এলমহার্স্ট তাঁর Poet and Plowman-এর স্মৃতিচারণায় লিখছেন :

> Rathi Tagore once told me of how, after his return from studying in America in 1909, he was nearly persuaded to join the revolutionaries in Bengal who had decided that forceful methods were the sole means left to them of bringing about the overthrow of the Imperial Government. He had at the last moment been inhibited, however, by the form of oath he was told he would have to swear at his initiation in front of the image of the Goddess Kali.

সন্ত্রাসবাদীদের কাছে 'বন্দে মাতরম্' ছিল প্রিয় মন্ত্র। [৪]

প্রমদারঞ্জন ঘোষ লিখছেন :

> সে বছর দেশমাতার মূর্তি হিসাবে শিবাজীর পূজিত ভবানীদেবীর মৃণ্ময়ীমূর্তির পূজা নাকি ছিল উৎসবের অঙ্গ। প্রতিমা পূজা রবীন্দ্রনাথের সংস্কারে বাঁধে। তাই তিনি ভবানীপূজায় যোগ দিলেন না। ধুমধামের সঙ্গে পূজা হল। সেবার তিলক নাকি পঁচিশ হাজার লোকের সঙ্গে মিছিল করে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। মিছিলে আগে ছিল অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ভারতমাতার প্রসিদ্ধ ছবিখানা।

১৮৯৯ সালে সরলাদেবীরা অনেকে কাশী বেড়াতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখে প্রণাম করেছিলেন। 'এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে রবিমামার কানে যখন পৌঁছল তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোরা এই রকম করে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলি? মিথ্যাচার করলি?'

সরলাদেবী কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে ভোলেননি, রবীন্দ্রনাথের হাতে ব্রহ্মসঙ্গীতের বিপুল পরিবর্তন ঘটছিল। রামমোহন যুগের পরবর্তী ব্রহ্মোৎসবের রবীন্দ্রের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অপাণিপাদ নন, তিনি সর্বতো অক্ষি সর্বত্র শিরোমুখ। রামমোহন রায়ের সময়কার নিরাকার ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথের হাতে সাকার হয়ে গেছে। 'অথচ ভাবের চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেই—মাটি-খড়ে, ধাতু-প্রস্তরে, বর্ণে-চিত্রে ভাবের উপলক্ষ্য ভগবানকে পূর্ণ লক্ষ্য করে মূর্ত করে আঁকড়ে ধরলেই রবীন্দ্রনাথ উত্ত্যক্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন।

একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সংস্কারে দেশকে মূর্তিমতী মা বলে ভাবা কষ্টসাধ্য হচ্ছে, তার থেকেও বড়ো দুঃখের কারণ, রবীন্দ্রনাথের কর্মপদ্ধতি দেশের লোকে গ্রহণ করছে না।[৫]

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ পাঠ করলে যে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল, রাজনৈতিক আন্দোলনের চাইতে তিনি গুরুত্ব দিতেন দেশগঠনের উপর বেশি। পল্লীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে প্রথমে, তার পর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন। একেই তিনি বরাবর বলে এসেছেন আত্মশক্তি।

রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি বনাম রাষ্ট্রশক্তির এই দ্বন্দ্ব বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামতে দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁরা তাঁর এই আত্মশক্তির ওপর জোর দেওয়াটা তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করতে পারেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পল্লি গঠনের কাজ অন্য দৃষ্টিতেও দেখা যেতে পারে, যাতে মনে হবে তাঁর এই দর্শন ছিল বিপ্লবাত্মক।

যে-কোনো যুগান্তকারী বিপ্লবের সময়ে দেখা যায়, একটা দেশে রাষ্ট্রশক্তির সার্বভৌমত্ব খণ্ডিত হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় দেখা গিয়েছিল রাজার হাতে সার্বভৌমত্ব পুরো আয়ত্তে নেই, ইংল্যাণ্ডের বহু লোকের আনুগত্য চলে গিয়েছিল পার্লামেন্টের প্রতি। আমেরিকার স্বাধীনতা বিপ্লবের সময় জনসাধারণের আনুগত্য ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আর থাকেনি। ফরাসী বিপ্লবের সময় জনসাধারণের আনুগত্য চলে যায় এস্টেটস জেনারেলের দিকে। সোভিয়েট বিপ্লবের সময় জনসাধারণ অনুগত হয় বিভিন্ন সোভিয়েট সংগঠনের। চীনা বিপ্লবের সময় কুওমিনটাঙ্ সরকারের কথাবার্তা শোনার লোক কমে যায়।

এই সব বিপ্লব পর্যালোচনা করলে যেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল বিপ্লব শুধু সংহারমূলক ক্রিয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াও। যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা সংগঠন

ধ্বংস হচ্ছে তার পরিবর্তে কোন্ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা সংগঠন আসবে, তার প্রকাশ না হলে বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশাত্মমূলক সংগঠনের কাজ সচেতনভাবে এই দৃষ্টিতে না দেখলেও, তাঁর কাজ বিপ্লবের এই মূল নীতির অনুসারী। ইংরেজকে দূর করাই সবচেয়ে বড়ো কাজ নয়। ইংরেজকে দূর করার পর কে এই সৃষ্টি কাজে অগ্রসর হবে, এই চিন্তা তাঁকে বিব্রত করেছিল। পল্লির দারিদ্র্য, অনৈক্য, অবিদ্যা, সংগঠনের অভাব—এই অবস্থায় দেশবাসী কোনো মহত্ত্বর সৃষ্টির দিকে এগুতে পারবে না। সুতরাং ইংরেজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হবার আগে দেশকে তৈরি হতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর যাবতীয় রাজনৈতিক প্রবন্ধের একমাত্র বক্তব্য। ইংরেজ সরকারের সার্বভৌমত্ব সংহার করার আগে বা সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের নিজের কোনো সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন তৈরি না হয়ে ওঠে, তাহলে কোনো বিপ্লবই সার্থক হবে না—বর্তমান পরিভাষায় বলা যায় এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯০৫-১৯০৬ সালে এই জাতীয় বক্তব্য আর কেউ রাখেননি। পরবর্তী যুগেও একমাত্র মহাত্মা গান্ধি এগিয়ে এসেছিলেন এই সৃষ্টিমূলক কাজে—তাঁর হরিজননীতি, চরকানীতি, পল্লি সংগঠন ইত্যাদির মধ্যে। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তব্যে মিল ছিল না। কিন্তু সৃষ্টিমূলক কাজে গান্ধির উৎসাহের জন্যই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে শ্রদ্ধা করতেন।

রাজনীতি থেকে রবীন্দ্রনাথের সরে আসার মূল কারণ, তিনি এই সৃষ্টিমূলক সংগ্রামে কোনো সমর্থন পাননি তদানীন্তন রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের তুমুল কোলাহলের পর যখন দেশ ঝিমিয়ে পড়ল, রবীন্দ্রনাথও ক্রমশঃ সরে আসতে লাগলেন এবং নিজের সাধ্যমতো শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের কাজে, নিজের জমিদারিতে সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটি তাঁর এই প্রসঙ্গে লেখা বলে রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন, অ্যানড্রুজকে লেখা চিঠিতে (৭ জানুয়ারি, ১৯২১)। ১৯০৮ সালের পর তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধের অনুপস্থিতির কারণ এটাই সবচেয়ে বড়ো বলে মনে হয়।

'বন্দে মাতরম্' এর প্রতি তাঁর বিরূপতাও সম্ভবতঃ এই কারণ থেকেই শুরু হয় এবং বাড়তে বাড়তে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র বিপক্ষতায় পরিণত হয়। প্রমদারঞ্জন ঘোষ লিখেছেন, শান্তিনিকেতন উপাসনায় বক্তৃতা করতে গিয়ে দেশের কথা এসে গেলে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। তাঁর মুখে যেন খই ফুটতে শুরু করত। প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি সময় তাঁরা শুনলেন রবীন্দ্রনাথের মুখে, 'বন্দে মাতরম্' নয়, নমস্তুতে।

১৯১৬ সালে, *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের শুরুতেই বিমলা জানিয়ে দেয় :

> অথচ স্বদেশি কাণ্ডের সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন

তা নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলতেন, দেশকে সেবা করতে রাজি আছি। কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

পুরো *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসটিই বলা যেতে পারে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখা।

নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার এক সাংবাদিককে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, " 'বন্দে মাতরম্' যথেষ্ট হইয়াছে। এখন 'বন্দে মাতরম্' স্থানে 'বন্দে মারতম্' বল। জাতীয় পতাকা উড়াইয়া কিংবা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা চরকায় কাটিয়া তোমরা স্বরাজ পাইবে না। জনসাধারণের জন্য গঠনমূলক কার্যের দ্বারা এবং তোমাদের দেশবাসীকে কার্যতঃ সেবা করিয়াই তুমি উহা অর্জন করিতে পারিবে।"[৬]

১৯৩৪ সালে *চার অধ্যায়* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

> শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি।

১৯৪০ সালে 'ল্যাবরেটরি' গল্পে লিখলেন :

> বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি?

১৯১০ সালে *গোরা* শেষ করেন রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে :

> গোরা কহিল, 'মা তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'

দেশকে মা ভাবা রবীন্দ্রনাথের এই বোধ হয় শেষ। এরপর ১৯১৪ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি দেশকে মা বলে ভাবতে বিরক্ত হতেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাঁর 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রতি অনুরাগ। শেষ পর্যন্ত গানটির প্রথম স্তবকটি যে তিনি অনুমোদন করেছেন, তা-ও বোধ হয় বাধ্য হয়ে।

'বন্দে মাতরম্'-এর অন্তর্লীন অর্থের জন্য ততটা হয়তো নয়, বিরূপতার বড়ো কারণই ছিল মন্ত্রটির অনুৎপাদক ব্যবহার। যে রবীন্দ্রনাথ একসময় তাঁর বক্তৃতা বা প্রবন্ধ শেষ করতেন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে, সেই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' শুনলেই ক্ষেপে যেতেন কিছুদিন পরেই।[৭] পরবর্তী কালে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের অর্থ যা-ই হোক, এটা হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক এবং দলীয় যুদ্ধ রব। 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লা হো আকবর' হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার যুদ্ধ-চিৎকার, যেমন 'বন্দে মাতরম্' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' হয়ে ওঠে পরে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নির্বাচনী দলধ্বনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটির কংগ্রেসের এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের এই ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের মন। এই বিক্ষোভের পরবর্তী ধাপ হল রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা থেকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

১. বহুদিন পূর্বে বর্তমান লেখকের গৃহে একবার কয়েকজন বিপ্লবী নেতা সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন *ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), * প্রতুল গাঙ্গুলি, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ প্রভৃতি। কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিলেন, "বিপ্লবী জীবনে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণির গীতি-কবিতাগুলি আমাদের যে কি সাহস ও সান্ত্বনা জোগাইত তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। সারা দিন পুলিশের হাত এড়াইবার জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রান্তদেহে অবসন্ন মনে কোনো জলাশয় দেখিলে তাহার জলে তৃষ্ণা দূর করিয়া একাকী এই সব গান গাহিতে গাহিতে দেহের শ্রান্তি দূর করিয়াছি।"

বোমার মামলায় আলিপুর আদালতের কাঠগড়ায় বিপ্লবী আসামীগণকে সমবেত করা হইত। একদিন বিচারক আসার পূর্বে একটি তরুণ বন্দী সহসা রবীন্দ্রনাথের গান গাহিয়া উঠিল: সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। ..... আদালতের সমস্ত লোক স্তব্ধ হইয়া এই গানটি শুনিল। *(বাংলা দেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, রমেশচন্দ্র মজুমদার)*

২. ... আমি যখন 'স্বদেশি সমাজ' লিখেছিলুম তখন তৎকালীন কংগ্রেসওয়ালারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। বিদেশি গভর্মেন্টের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রফানিষ্পত্তির কাজকেই তাঁরা ভারতবাসীর মোক্ষসাধন বলে স্থির করেছিলেন। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেছিলেন বেস্থাম প্রভৃতি পণ্ডিতরা স্টেট্ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেছেন আমি অশিক্ষাবশত সেসব কিছুই জানিনে বলেই এমন কথা বলতে পেরেছি যে

প্রজারা নিজেদের শাসনশক্তি নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারে। ... বহুকাল থেকে এ কথা বলতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি যে দেশের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে আমি কেবল বিদেশের সঙ্গে সখ্যস্থাপনের জন্যে ব্যস্ত। তারা জানে অথবা জেনেও জানে না যে বিদেশের জনসভায় বিদেশি সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যা বলে থাকি তা একেবারেই শ্রুতিসুখকর নয়। (৪ কার্তিক, ১৩৩৯, হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি, চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড)

৩. ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিংবা ভারতবর্ষ কোনোদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা কববে না এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজী বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাকব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা religiously wrong অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলি নে। আমি বলি স্বাধীনতা বাইরের কোনো একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না ; দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালেব তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়।

২২ মাঘ ১৩২৮, কাদম্বিনী দেবীকে চিঠি, চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড

৪. তোরা প্রাণ খুলে বল বন্দেমাতরম্।
তোদের ঘুমের নেশা ভাঙ্গিয়ে দিলে
ক্ষুদিরামের একটি বম্। *(রমেশচন্দ্র মজুমদারেব ইতিহাসে উল্লিখিত)*

৫. ... আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাইনি—যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেচে সেই 'আমার জন্মভূমি'তে আমরা মানুষ। (প্রথম চৌধুরীকে চিঠি, ২ ফাল্গুন ১৩২৪, চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড)

৬. ... জরুরি চিঠি জরুরি প্রবন্ধ সমস্ত ঠেলে রেখে মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিষ নয়—মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্বুদের মত উঠেচে আর ফেটে গেছে—কিন্তু যে গানগুলোকে দেখতে বুদ্বুদের মত তারা আঁলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্তার খেলনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেইজন্যেই যখন তারা গড়ে উঠতে থাকে তখন কর্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আস্‌চে যে, "সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর।" যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুশি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্তারা বলেন, "তিনি আবার কে? এক ত আছে বন্দে মাতরম্।" তাঁদের গড় করে আমাকে আজ বল্‌তে হচ্চে—'আমার বন্দেমাতরং ভুলিয়েচেন ঐ তিনি। আমি দেশছাড়া ঘরছাড়ার দলে। আমি ভুগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে। (১৮ কার্তিক, ১৩২৮, প্রমথ চৌধুরিকে চিঠি)

৭. "...অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ সেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে।—বন্দে মাতরম্।"

(১৩৩২ ফাল্গুন, ভাণ্ডার, স্বদেশিদের উপর পুলিশের অত্যাচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ)

বন্দে মাতরম্ কি সাম্প্রদায়িক সংগীত

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

না স্বীকার করে উপায় নেই, বাংলায় Nation শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে একটি প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করেছিলেন, অধিপতি.... তা যে প্রচলন হয়নি সে তো রবীন্দ্রনাথ জেনেই গিয়েছিলেন...

Nation শব্দটির অন্তরাকৃতির খোঁজে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, Nation শব্দটি একটি মানস পদার্থ...জাতি, ভাষা, বিষয়, স্বার্থ, ধর্ম, ঐক্য, ভৌগোলিক অবস্থান Nation নামক পদার্থটির কোনো উপকরণই নয়...রবীন্দ্রমানস নিজের মতন একটা ব্যাখ্যাতত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন, তা এই রকম...অতীত সর্বসাধারণের স্মৃতি সম্পদ, বীরত্ব, মহত্ত্ব কীর্তির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে National ভাবের গাঠনিকতা...ধ্রুপদী গৌরব ও কাল সময়ের সর্বসাধারণের একত্রিত কর্মধারা ও কর্ম সঙ্কল্প ন্যাশনাল ভাবের ভিতরের প্রকৃতি সত্তা, এই নিরীক্ষণে হয়ত বলা যায় ভারতবর্ষীয় সমাজে এই ভাব শর্ত নিয়ত রয়েছে বলেই ভারত একটি Nation...

Nation নিয়ে সব ঝুটঝামেলা মিটে যায় ইংরেজরা গায়ের জোরে ভারত দখল করার পর পশ্চিমী আলোকিকতা থেকে অনেক কিছুই নিয়েছে ভারত। এই Western Impact যে প্রধান দুটি ভাবুকতা দিলে তার একটা হল National Issue জাতি-প্রতিষ্ঠা, জাতীয়তাবোধ, অন্যটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ...আবার পরশতার বিপরীতার্থক তত্ত্ব থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধের এই জাতীয়তাবাদের জন্ম...

Minority Ruler ইংরেজদের চিন্তা ভাণ্ডার থেকে এই Concept নেওয়া যা ইংরেজ আসার আগে সাতশো বছর মুসলমান Minority Rule না এলে এই Concept দিতে পারেনি...নীরদ চৌধুরী বলতেন ইংরেজ না এলে আমরা মানুষ হতাম না। বঙ্কিম এই দুই বোধের Icon ইংরেজদের হাত থেকে নিলেও এই স্বাতন্ত্র্য ছিল ভারতমুখী, তা ইংরেজদের ভোগমুখী, নয় ত্যাগমুখী....এর থেকেই জন্ম নেয় সংযম, সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্যধর্মী জীবনাচরণ....সাধারণ জীবনযাপনের শুদ্ধতাবোধ...একে বলা যায় উনিশ শতকী স্বাতন্ত্র্যবোধ ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া এই National Concept, কোনো আধারে ন্যস্ত না হলে অর্থাৎ National Conceptটি জাতীয় ভাব হয়ে উঠতে চাইলে একটা Icon-এর অনিবার্যতা এসে পড়ে...ভারতে সেই Iconটি পাওয়া যায় একমাত্র ধর্মভাবের পরিকাঠামোয়...অন্য কোনো গাঠনিকতা নিতান্ত বাড়ন্ত...

মধ্যযুগের পুরাণকল্পগুলি ধর্মভাব অভিব্যক্তির লোকায়ত সাহিত্য... এর মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে সামাজিক অনুশাসন ও শক্তির উপকরণ... প্রতীকী বলাও বুঝি যথার্থ নয়... এগুলি না রূপক, না প্রতীকী..., না সাঙ্কেতিক কোনো কিছুই নয়। সারা মধ্য যুগ একটানা মুসলিম শাসনের অবসিত কাল অবধি যা কিছু সংস্কৃতির সঞ্চয় পদকাব্য, কৃষ্ণকাব্য, রাধাকাব্য, মঙ্গকাব্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে...

এই সব মঙ্গল সাহিত্যে ম্যাজিক, দেবকল্পনা, কিংবদন্তী, লোকায়াত সংস্কৃতি আধারে কল্পলোকবাসী দেবদেবীর-ই রাজ্যপাট...জাতি ভাবনা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এই কল্পপুরাণগুলি নইলে মান্যতার সীমায় পৌঁছয় না...

বিশেষ করে ভাব জগৎটি সেই সব Romantic কবি মনের ঐশ্বর্য...ভারতে এই প্রত্ন ঐশ্বর্যের অন্ত নেই...বেদসাহিত্যমালা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ সংহিতাগুলি এই সব কল্পলোকের প্রান্তর।

তাই Nation ধারণাটি অক্লেশে পুরাণের কল্পভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়...জাতি নির্মাণ প্রকল্পেও তাই এই পুরাণপ্রতিমাগুলি যুক্ত হয়ে পড়ে...

২

দুর্গা Graphics যে সমাজে কল্পরূপ পেয়েছিল সে সমাজ কবেই ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায় হয়ে গেছে...সে সমাজ আর নেই, প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাও শূন্য...কিন্তু রেখে গেছে এই Graphicsটা...এক সময় এই Graphics দেববংশভূতা ছিল...একালে উনিশ শতকে কবি-কল্পনার ডানায় এই Graphics বিচিত্ররূপিনী হতে থাকে...আর তার বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা হতে থাকে দেবতা প্রিয় হতে পারে, হতে পারে প্রিয় দেবতা...কোনো বিঘ্ন নেই এই রূপ থেকে রূপান্তরে যাওয়া আসায়, দেবতা মানবে এই মিলন সাধনের পালায় তত্ত্ব গড়ে ওঠে যেমন একটা তত্ত্ব, শুভ-অশুভের সংঘাত, দেবাসুরের যুদ্ধ কল্পনা এক সময়ে সামাজিক Milieu-তে ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়...যেমন বিনাশায়ত দুষ্কৃতার গীতায় তেমনি দুর্গা Graphics-এ সেই দুষ্কৃতি বিনাশে Motif ব্যঞ্জনা বেজে যায়...

বঙ্কিমে এসে এই দুর্গা Graphics-কে দেশানুরাগের ভরা প্লাবনের দিনে যা জাতীয়তাবাদ নয়, দেশকল্পনা মাতৃকল্পনায় স্বপ্ন জাগাতে থাকে... যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীই প্রধান, দুর্গা-কালী, সেই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রতিকল্প হয়ে ওঠে সহজেই...

বলার হেতুই থাকে না যে, কোনো দেশ, কোনো জাতির মধ্যে দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করায় নন্দনসুখ যদি থাকে, ভারতবর্ষ সেই দেশ...তাই ভারতমাতা অবন ঠাকুরের হাতে ছবি হয়ে ওঠে, অতুলপ্রসাদের 'ওঠ গো ভারতলক্ষ্মী', দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী' আর রবীন্দ্র নাথের 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা...' ইত্যাদি এমন অন্তহীন রূপময়তা

দেখা যাবে...এছাড়াও মাতৃসম্বোধনের মত মধুর সম্বোধন আর কী আছে জগতে....এই সম্বোধনই তো একটা সংস্কৃতি...

বঙ্কিমে এসে দেশকে 'মা' নামে ডাকার যে রোমাঞ্চ...এ এক আলঙ্কারিতা...এখানে দুর্গা Graphics দেবী নয়, ঈশ্বরী নন পুরাণকল্পিতা দেববংশোদ্ভূতা কেউ নয়...বঙ্কিমে এসে এই Graphics সৌন্দর্যালঙ্কার মানবায়িত প্রতিতুলনায় পৌঁছে যায়... দেশ এবং দুর্গা ভাবব্যঞ্জনায় নিজের নিজের শব্দার্থ হারিয়ে বিমিশ্রণে এসে Third Dimension-এ ভিন্ন অর্থময়তায় যা হয়ে দাঁড়ায় তা একটা Metaphor...শক্তি সৌন্দর্য দেশশক্তি দেশমাতার এই অভিধা ডুবে যায়। দশশক্তির অভিজ্ঞানে এই দেশশক্তির অভিব্যক্তি দুর্গা Graphics-এর মধ্যে যে যুদ্ধ ছবির তীব্র ব্যঞ্জনা অনুভবোরণিত হয়...বঙ্কিমের এই দেশবর এই Milieu-তে প্রকাশ সামর্থ্য অর্জন করেছে...এর মধ্যে ঈশ্বর-ঈশ্বরীর কোনো ভাবঅস্তিত্ব তো নেই-ই, বরঞ্চ ঈশ্বরবঞ্চিত...

বাইরের দুর্গোৎসব, দেবী বন্দনার সঙ্গে এ দূরত্ব অনেক যোজন...এ তো দুর্গোৎসবের দেবী নয়, দেশালঙ্কার Metaphor যা কোনো সমাজের ঊর্ধ্বে ...জাতি, ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বে.......ধর্মভাবের অতীত এক প্রগাঢ় ধ্রুপদী সৌন্দর্যশক্তি...সৌন্দর্যরূপিণী দেশ আনন্দমঠে

ভবানন্দ গাইছেন :

বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্...

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন : মাতা কে?

ভবানন্দ গাইলেন :

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র বললেন :

এ ত, দেশ এ ত মা নয়...

ভবানন্দের গানও বলছে...এই দেশই সুখদাং বরদাং....ইনিই মা।

৩

অবিনির্মিত 'বন্দে মাতরম্', কালছায়া এক কালধ্বনি, দেশশক্তির উন্মোচনের সৌন্দর্যময় মহাজাগরণের গান...

ছাব্বিশ চরণের এই ধ্রপদী সংগীতটির ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রাক্ষরে সংগীতটির প্রকাশের ১২৫ বছর পূর্ণ হল...বঙ্গদর্শনে এই গানটি মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে... ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে গানটি প্রথম রচিত হয়...১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ডিসেম্বরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে প্রকাশিত হয়...গানটি আনন্দমঠে Theme song হিসেবে স্থাপিত হয়।

এ সংগীতটির মর্মস্বর, রাজশক্তির বিপ্রতীপে দেশশক্তির উত্থান, পরিশেষে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল...

ভবানন্দ ও মহেন্দ্রর সংলাপে লক্ষিত আছে ঃ মহেন্দ্র বলছে...রাষ্ট্রশক্তি দখল করবে কী করে?

ভবানন্দ বলল, মেরে...

মহেন্দ্র বলল,...একা...

ভবানন্দ : সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে

দ্বিসপ্তকোটি ভুজে ধৃতক্ষরকরবালে

এরপরেই যা বললেন, ভবানন্দ, যেখানে বঙ্কিমের দেশ ও মা, মা ও দেশ সমার্থক হয়ে ওঠে... অবলা কেন মা এত বলে...

ভবানন্দ যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথা বলে, যা পরবশতার থেকে মুক্তির কথা বলে...জাতীয়তাবাদের রণধ্বনি বলি আমরা...

জাতীয়তাবাদ যদি সত্যি হয় অথবা সত্য বলে গ্রহণ করি, সত্য যদি হয় স্বাধীনতা কামনা, সত্য যদি হয় দেশমুক্তি তাহলে যে রণধ্বনি দিয়ে সর্বাপেক্ষা অখিজাতিকে পরাধীনতার শেকল ভাঙার পণে ভাব ঐক্যে আনা সম্ভব, সেই ধ্বনি বা গীত বা Slogan-কে গ্রহণ করব না কেন? যদি এই গীতধ্বনি প্রেরণার গভীর বাণী হয়, তাহলে গ্রহণ করতে বাধা কোথায়? যদি এই বাণী জাতীয়তাবাদের ব্যঞ্জনাকে দেশমনে ঝঙ্কৃত প্রকাশসমর্থ ধ্বনি হয়ে উঠতে পারে...এবং দেশ যদি তা চায়, তবে সে তো আপনিই দেশধ্বনি হয়ে উঠবেই...

এখানেই সেই প্রশ্নটি তোলা যেতে পারে...জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণের প্রশ্নে তার অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল... রবীন্দ্রনাথ যেটুকুতে দেশ প্রকৃতি সৌন্দর্য ও মাধুর্যে প্রকাশমান, সেইটুকুই গ্রহণ করতে মতামত দিয়েছিলেন... প্রয়োজনের জন্যে

খণ্ডাংশটি যথার্থ...কিন্তু বন্দেমাতরমের সত্যার্থটি এই খণ্ডাংশে নেই...ভবানন্দের দেশভাবনা মাতৃভাবনা সমার্থক হয়ে যখন জাতীয়তাবাদের রণধ্বনি হয়ে ওঠে...অধিজাতিক মুক্তিগীতিহয়ে ওঠে এই মর্মধ্বনি অনুপস্থিত থাকলে...বন্দেমাতরমের সার্থকতাই ফুরিয়ে যায়...জাতির গান হয়ে উঠতেও ব্যর্থই হয়...

সম্ভবতঃ 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সমগ্রটি যে আলঙ্কারিকতার বাঁধনে প্রগাঢ় ঐশ্বর্যময় সেইখানেই বাঁধা...আর সেইখানেই বঙ্কিমমানসের এবং বন্দেমাতরমের সত্য...

৪

প্রশ্ন : 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি কী Secular ? একশো পঁচিশ বছরেরও এই প্রশ্ন চিরঅমীমাংসিত রয়েই গেছে...কেন না ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুর নয়...বহু ধর্ম, জাত ও বর্ণের দেশ ভারতবর্ষ...সমগ্র সংগীতটিকে গ্রহণের পক্ষে বাধা এখানেই... 'বন্দে মাতরম্' হিন্দু গীতি 'বন্দে মাতরম্' সাম্প্রদায়িক গীতি

এখানেই প্রশ্ন তোলা যায় : 'বন্দে মাতরম'-এর Motif কী?

১ 'বন্দে মাতরম্' সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত কী?

২ সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ নিয়ে রচিত কী...?

৩ জাতি বিদ্বেষ, জাতিগত ঘৃণা, বৈরিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত কী?

৪ কোনো সম্প্রদায় বিশেষকে পরোক্ষে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কিংবা তাচ্ছিল্যভরে লেখা কী?

৫ জাতিসংঘর্ষ সৃষ্টির লক্ষ্যে রচিত কী?

৬ হিন্দুত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত কী?

বঙ্কিম নিজে 'বাঙলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'-এ লিখেছেন ঃ

'যাহা অসত্য, ধর্ম বিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন ও স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনো হিতকর হইতে পারে না সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য।'

রাজসিংহ উপন্যাসের উপসংহার-এ লিখেছেন বঙ্কিম, 'কোনো পাঠক না মনে করেন হিন্দু মুসলমানের কোনোপ্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।' এই বঙ্কিমই বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী*-তে আয়েষার মুখে বলিয়েছেন 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।'

সুতরাং প্রশ্নই ওঠে না বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ প্রসঙ্গে বহু উদাহরণ বঙ্কিম সাহিত্য থেকেই দেওয়া যায়...তার অভাব হবে না...

তবে কেন আনলেন বঙ্কিম, দেশের জাতিবিন্যাস, বর্ণবিন্যাস, ধর্মবিন্যাস, আচার-সংস্কারবিন্যাস জানা সত্ত্বেও দুর্গা Graphics-কে।

বঙ্কিমের হিন্দু উৎস...বঙ্কিম বাঙালি বাংলা ও বাংলা ভাষা বঙ্কিমের দ্বিতীয় উৎস

বঙ্কিমের ছিল আপন ধর্মবিশ্বাস... সেই সঙ্গে ছিল জাতীয়তাবাদের এই সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল ইংরেজের সোনার শেকলে বাঁধা বঙ্কিমের ডেপুটি অলঙ্কার, বরাবর যার প্রতি বঙ্কিমের ছিল তীব্র ধিক্কার যা ছিল দেশানুরাগের আঁতুড় ঘর... সংঘাত প্রবৃত্তি...এই সংঘাত-ভাব রূপ পেতে চাইছিল...এই যুদ্ধ প্রবৃত্তি শেষে হয়ে ওঠে সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈর্ধৃত খর করবাল...হয়ে ওঠে বহু বল ধারিণীম, ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী... মেলানো মেশানো দেশশক্তি মাতৃশক্তির আধারে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি' এই অপরূপরূপে বাহির হলে 'জননী দেখে দেখে আঁখি না ফেরে' কিংবা 'ডান হাতে তোর খড়গ ঝলে...ললাট নেত্র আগুন বরণ' ইত্যাদি এ সকলের হৃদয় উৎস তো একটাই...পুরাণ-প্রতিমার শক্তি সৌন্দর্য রূপিনী এই Icon ছাড়া এই যুদ্ধ ধ্বনি এর চেয়ে আর কোনো অপরূপে প্রকাশ সম্ভব ছিল...?

এই সর্বভাব পূর্ণকরা শব্দবদ্ধ 'বন্দে মাতরম্' আর কী কোনো আধারে প্রকাশ সম্ভব ছিল...এই যে সাহিত্যিক স্বপ্নময় ভাবময় রূপময় প্রত্নপ্রতীক-এর বিকল্প আর তো কোথাও দেখিনি...বহুজাতি বহুবর্ণ ধর্মধারিণী এই ভারতে আছে কী কোথাও এমন দেশশক্তি সৌন্দর্যের উন্মোচন।

তাই বাঙলার পটে বিধৃত এই সমরঋদ্ধ ছবি সপ্তকোটির মধ্যেই মিলিয়ে নিয়েছেন বঙ্কিম। হিন্দু, মুসলিম, পারসিক বৌদ্ধ, জৈন ক্রীশ্চান ও সর্বজাতিবর্ণধর্মের মানুষ বাঙালীকে...

বঙ্কিমের দুর্গা structurality-র মধ্যে চিরজাগরুক সমরস্মৃতি জেগে থাকে যা শক্তির আহ্বান....এমন অনন্তমুখী কল্পকলা আর কী কবে পেরেছে দিতে এই আর্যাবর্তে দক্ষিণাবর্তে।

দেশ শাসনের রুদ্রতারা পাশে নিঃস্বরিক্ত দলিত দুর্গতদেশ দেশভালোবাসায় উদ্দীপনী ভাবকেই তীক্ষ্ণ জাতীয়বাদী তীব্র চেতনা প্রকাশ করতে গিয়েই এই পৌরাণিক অভিকর্ষ থেকে কোনো কবিসাহিত্যিক কেউ-ই দূরে যেতে পারেননি...গ্রীসেও পুরাণ প্রকল্প দিয়ে সমাজ দেশ ধর্ম নীতি নির্ধারণ করতে দেখি....তাদের ইলিয়ড ওডিসি-তে যেমন দিয়েছিল ভারতে রামায়ণ, মহাভারত ও প্রত্নপুরাণগুলি।

৫

'বন্দে মাতরম্' বঙ্কিমের কোনো এক প্রগাঢ় মুহূর্তের রচনা...প্রগাঢ় অনুভব ও Imagery গানটিতে ধ্বনিত হয়েছে...মহাভারতের খিল হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব ২য় অধ্যায়ে আর্যস্তবের ছায়া আছে তবু 'বন্দে মাতরম্' গীতটি কখনোই নয় কোনো ঈশ্বরস্তব ....

নয় কোনো সম্প্রদায়ের দেবদেবীর ধ্যানের মন্ত্র...নয় কোনো জাতি-সংকীর্ণতার শীর্ণ দেশাত্মগীতি...এ গান কোনো শাস্ত্রীয় সংগীতও নয়, এ গান সময়হারানো কোনো এক কালের পানে ছুটে চলা সৌন্দর্যরূপিণী শক্তিময়ী দেশবন্দনবাণী, এ গান হিন্দু মনের উচ্ছ্বাস নয়, চিরকালের শক্তিসৌন্দর্যের কাব্য...সার্বভৌম শক্তিগীতি...এ গান শুধু বাঙালির নয়, সর্বমানবজাতির গান...বিশ্বায়ত গান...এই সুন্দরময় গীতিময়তার মধ্যে জেগে আছে সত্যবোধ, মূল্যচেতনা, এক অনন্যপূর্ব সত্তায় পুনর্রণন...

এই গান জাগিয়ে রাখে ধ্রুপদী প্রশান্তি, যখন ধ্বনিত হয়...'অমলাং অতুলাং'...কিংবা 'সরলাং, সুস্মিতাং ধরণীম ভরণীম...তখন তো বিশ্বলোকের সাড়া পাই প্রচ্ছন্ন বৈভব, শক্তি, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য নান্দনিক স্বাচ্ছন্দ্যে দীপ্ত ধরনীম ভরণীম, বিশ্বদার্শনিকতা প্রসারিত এই গান যে থেমে নিয়ে যেতে চায়, সেখানে কোনো ঈশ্বর-ঈশ্বরী পৌঁছতে পারেন না...মানবের অন্তর্লীন সত্তার সৌন্দর্যের অভিব্যক্তির ঘনঘন বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে...সৌন্দর্যের রহস্যে উন্মোচিত হতে থাকে অপরূপা অরূপ...শেষ পর্যন্ত এই দুর্গা 'মিথ', মিথকেই অতিক্রম করে যায়...

এই গীতি-প্রতর্ক আজও শেষ হয়নি...তখনি অনুভব করা যায়...এই গানের আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের শক্তি কত।

এই গীতিবন্দনা তার নিজের কাল পেরিয়ে এমন একটি অনন্তবিধৃত নির্মিত যা নির্মাণকারী বঙ্কিমচন্দ্রকেও বহুদূর পিছনে ফেলে, অলখকালের দিকে ছুটে চলেছে...

নমামি ত্বাং...

neither have we wife, son, hearth or home, we have only the *sujala, suphala, malayaja-shitala, shasya-shyamala*—'
Then Mahendra understood and said, 'Sing it over again'. Bhavananda sang and as he sang he wept :

Vande Mataram !
Sujalam, suphalam, malayaja shitalam,
Shasyashyamalam, Mataram !
Shubhrajyotsna pulakitayaminim,
Phullakusumita drumadala, shobhinim,
Suhasinim, sumadhura bhashinim,
Sukhadam, varadam, Mataram !
Saptakotikantha kalakala ninada karale
Dwisaptakoti bhujaidhrita-khara-karavale
Abala kena ma eta bale !
Bahubala dharinim, namami tarinim,
Ripudalavarinim Mataram !
Tumi vidya, tumi dharma,
Tumi hridi, tumi marma,
Twam hi pranah sharire !
Bahute tumi ma shakti,
Hridaye tumi ma bhakti?
Tomaraipratima gari mandire mandire !
Twam hi Durga dashapraharana dharini,
Kamala, Kamaladalabiharini,
Vani, vidyadayini, namami twam,
Namami, Kamalam, amalam, atulam,
Sujalam, suphalam, Mataram,
Vande Mataram !
Shyamalam, saralam, susmitam, bhushitam,
Dharanim, bharanim, Mataram !

* * * *

BANKIM CHANDRA CHATTERJI : Author of Vande Mataram

R. K. PRABHU

Bankim Chandra Chatterji, the author of the immortal song *Vande Mataram,* which bids fair to become the National Anthem of India, was born at Kanthalpara, near Calcutta, on 27th June 1838. The middle of the nineteenth century witnessed an unparalleled ferment in the social, religious and intellectual life of Bengal and some of the brightest luminaries in the firmament of that province, such as Hemchandra Banerjee and Michael Madhusudan Dutta, the poets, Keshab Chandra Sen and Maharshi Devendranath Tagore, the religious reformers, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, the social reformer and educationist, Kristo Das Pal, the politician, and Ramakrishna Paramahamsa, the Sage of Dakshineshwar, were all Bankim Chandra's contemporaries.

During the comparatively brief span of his life—he died on 8th April 1894 at the age of fifty-six—Bankim Chandra rose to become the greatest literary figure in Bengal, his works, mostly novels, exercising a profound influence not only on the literature of his own province but also on that of some of the other provinces of India.

Bankim's first literary work, *Rajmohan's Wife,* a novel, was written in English, but he appears to have realized soon after that the proper medium of expression for his creative ideas was his own mother-tongue, Bengali. His first attempt in Bengali fiction, *Durgesnandini* (The Chieftain's Daughter), which was published in 1865, marked a turning point in Bengali literature. It struck the patriotic imagination of the younger generation of Bengal as no other contemporary work had done and marked him out as a rising star of the first magnitude. This novel was followed by *Kapalakundala,* which turned out to be an even more brilliant production of his creative genius and firmly established his pre-eminence as a writer.

Realizing the power of his pen, Bankim Chandra shortly afterwards started a monthly magazine in Bengali, *Bangadarshan* (The Mirror of Bengal), and contributed voluminously to its pages, the

versatility of his genius shining therein in all its brilliance. Some of the budding geniuses of the day also found full scope for the expression of their ideas in its pages and the magazine remained till the close of its career the most popular periodical of the time.

More novels followed one after another from Bankim's pen, dazzling the mind of Bengal as no other literary works of the day did. Among these were *Chandrasekhar, Ananda Math, Devi Chaudhurani, Sitaram, Vishabriksha, Rajasinha, Kamalakanter Daphtar* and *Kamalakanter Jabanbondi.* He was a master of satire and wrote also a number of essays, skits and other minor works on the social hypocricies of his day. Among such works were the *Life* of *Muchiram Gur,* in which he exposed the folly and corruption prevalent among the lower ranks of officials, and *Lokarahasya,* a biting satire on the sycophantic society of his day. He was an ardent champion of women's rights and discussed their problems in a work entitled *Samya,* wherein he also dealt with the theories advanced by Mill in his *Subjection of Women* as well as the views on the subject expressed by writers like Rousseau, Carlyle and Lecky.

Well versed as he was in the ancient religious literature of the country, both Sanskrit and Bengali, he wrote two valuable works on religious subjects. One was *Krishnacharitra* (The Character of Krishna) and the other, *Dharmatattva* (Discourses on Religion). A supreme lover of Bengali and a master of Bengali prose, it was no wonder that Bankim should have tried to make that language the medium of instruction in the province of his birth. This he did as a syndic of the Calcutta University, though he had to encounter very strong opposition.

The *Vande Mataram* song appears to have been composed by him some time (1875 ?) before the publication of the novel *Ananda Math* in the early eighties and to have been incorporated into the latter work only when it was nearing completion. Though the entrancing beauty and exalted patriotic spirit of the song were recognized when the novel made its appearance, it did not attract any particular attention of the public till 1905, the year of the Partition of Bengal. The province-wide, agitation started against the wanton vivisection of Bengal in that year developed rapidly into a movement to rid the country of all alien domination. This led to widespread repression by the British bureaucracy and consequent intensification of the popular struggle. The white heat of indignation at the wrongs that

were being heaped on Bengal recalled to the memory of some ardent spirit (or spirits) in the province, in a flash as it were, the Sanyasi Rebellion recorded most eloquently in the pages of Bankim's *Ananda Math.* In particular the thrilling song *Vande Mataram,* appeared to these spirits as the one song that could be made the rallying cry of the entire province. The appropriateness of the symbolism of identification of the Divine Mother with the Motherland began to be recognized everywhere and *Vande Mataram* came to be recited at every patriotic function as the song *par excellence* of one and undivided Bengal. Patriotic circles in other provinces too soon took up the song and, substituting the word *trimshatkoti* (thirty crores) for *saptakoti* (seven crores) in it, sang it as if it were the national anthem of the country. It thus became, ultimately, the symbol of the unity and solidarity of the Indian people and of their determination to free their Motherland of all the shackles of foreign domination.

The first time that the *Vande Mataram* song was sung at any large political gathering was at the Bengal Provincial Conference held in 1906 under the presidentship of of Mr. Abdur Rasul. It is recorded that the whole assemblage was thrilled at the recitation of the song. In December of the same year the song was sung on the opening day of the Calcutta session of the Indian National Congress held under the presidentship of Dadabhai Naoroji. Since then the opening lines of the song have been sung at every session of the Congress. Though, it was not the only song sung at these sessions, *Vande Mataram* has throughout occupied the foremost place in the minds and hearts of all Congressmen because of the close association of the song with the national struggle all along its career.

In the early thirties when the separatist movement among a section of Muslims began to make headway in the country, objection was taken to the song on the score of its being originally an invocation to a Hindu goddess. This agitation led ultimately to the adoption of the following lengthy resolution by the Working Committee of the Indian National Congress in October 1937 with a view to define in exact terms the position of the song in the national movement :

'A controversy having recently arisen about the "*Vande Mataram*" song, the Working Committee desire to explain the significance of this song. This song appears in Bankim Chandra Chatterji's novel "*Anandamatha*" but, it has been pointed out in his biography, that

the song was written independently of, and long before, the novel and was subsequently incorporated in it. The song should thus be 'considered apart from the book. It was set to music by Rabindra Nath Tagore in 1896. The song and the words "*Vande Mataram*" were considered seditious by the British Government and were sought to be suppressed by violence and intimidation. At a famous session of the Bengal Provincial Conference held in Barisal in April 1906, under the presidentship of Mr. A. Rasul, a brutal lathi charge was made by the police on the delegates and volunteers and the "*Vande Mataram*" badges worn by them were violently torn off. Some delegates were beaten so severely as they cried "*Vande Mataram*" that they fell down senseless. Since then, during the past thirty years, innumerable instances of sacrifice and suffering all over the country have been associated with "*Vande Mataram*" and men and women have not hesitated to face death even, with that cry on their lips. The song and the words thus became symbols of national resistance to British imperialism in Bengal especially, and generally in other parts of India. The words "*Vande Mataram*" became a slogan of power which inspired our people, and a greeting which ever reminded us of our struggle for national freedom.

Gradually the use of the first two stanzas of the song spread to other provinces and a certain national significance began to attach to them. The rest of the song was very seldom used and is even now known to few persons. These two stanzas described in tender language the beauty of the motherland and the abundance of her gifts. There was absolutely nothing in them to which objection could be taken from the religious or any other point of view. The song was never sung as a challenge to any .group or community in India and was never considered as such or as offending the sentiments of any community. Indeed the reference in it to thirty crores of Indians makes it clear that it was meant to apply to all the people of India. At no time, however, was this song, or any other song, formally adopted by the Congress as the national anthem of India. But popular usage gave it a special and national importance.

The Working Committee feel that past associations, with their long record of suffering for the cause, as well as popular usage, have made the first two stanzas of this song a living and inseparable part of our National movement and as such they must command our affection and respect. There is nothing in these stanzas to which any

one can take exception. The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India.

The Committee recognise the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song. While the Committee have taken note of such objection in so far as it has intrdnsic value the Committee wish to the music of it. Therefore it was decided that orchestral renderings of Tagore's song should be examined and of *'Vande Mataram'* too. Unfortunately the tunes of some songs, though their words might be very good, were not 'capable of orchestral rendering. We wanted a National Anthem with both life and dignity in it. If either was lacking, it was not a good national anthem. If it was all dignity and no life, it was flat, and if it was all life and no dignity, it was theatrical. We had to strike a balance between the two. A Committee of Goverment or a Committee of the House would probably make a recommendation that the House itself would finally adopt as it adopted the National Flag."

Pandit Nehru, when he made these remarks appears to have lost sight of the fact that no less a person than Rabindra Nath Tagore himself had as far back as 1896 prepared a notation of *Vande Mataram.* This notation —which has been in vogue ever since the days of the Bengal Partition—was made public by Viswa-Bharati towards the close of 1947, when Mahatma Gandhi, in one of his post-prayer speeches in Calcutta, stressed the necessity for setting up a standard tune for *Vande Mataram* and other national songs and appealed to Viswa-Bharati to undertake the task.

There is no denying the fact that *Vande Mataram* with the long history and traditions associated with it has come to occupy a unique place in our national life. When the Constituent Assembly meets to adopt our National Anthem, it is to be hoped that the claims of this immortal song would be discussed in all their aspects before arriving at a final decision.

VANDE MATARAM

M. K. GANDHI

'*Vande Mataram.*' That was no religious cry. It was a purely political cry. The Congress had to examine it. A reference was made to Gurudev about it. And, both the Hindu and the Muslim members of the Congress. Working Committee had to come to the conclusion that its opening lines were free from any possible objection. It should be sung together by all on due occasion. It should never be a chant to insult or offend the Muslims. It was to be remembered that it was the cry that had fired political Bengal. Many Bengalis had given up their lives for political freedom with that cry on their lips. He felt strongly about '*Vande Mataram*' as an Ode to Mother India.... '*Vande Mataram*', the national song and the national cry of Bengal which sustained her when the rest of India was almost asleep and which was, as far as he was aware, acclaimed by both the Hindus and the Muslims of Bengal.

(Extract from post-prayer speech at Deshbandhu Park, Calcutta—22nd August 1947).

* * * *

There should be one universal notation for 'Vande Mataram'; if it was to stir millions, it must be sung by millions in one tune and one mode. (Extract from speech at Calcutta—29th August 1947).

* * * *

What I have said about the flag applies *mutatis mutandis* to the singing of *Vande Mataram.* No matter what its source was and how and when it was composed, it had become a most powerful battle cry among Hindus and Mussalmans of Bengal during the partition days. It was an anti-imperialist cry. As a lad, when I knew nothing of *Anandamath* or even Bankim, its immortal author, *Vande Mataram* had gripped me, and when I first heard it sung it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately now we have fallen on evil days. All that was pure gold before has become base metal today. In such times it is wisdom not to market pure

gold and let it be sold as base metal. I would not risk a single quarrel over singing *Vande Mataram*, at a mixed gathering. It will never suffer from disuse. It is enthroned in the hearts of millions. It stirs to its depth the patriotism of millions in and outside Bengal. Its chosen stanzas are Bengal's gift among many others to the whole nation. The flag and the song will live as long as the nation lasts.

পরিশিষ্ট

বন্দেমাতরম্

(মূল বাংলা রূপ)

বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটীকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং
নমামিতারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃশরীরে

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং

নমামি কমলাং
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং
মাতরম্
বন্দেমাতরম্
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।

BANDE MATARAM

Translated by W. H. LEE, I.C.S.

My Mother-land I sing !
Her splendid streams, her glorious trees,
The Zephyr from the far-off Vindhyan heights
Her fields of waving corn,
The rapturous radiance of her moonlit nights,
The trees and flowers that flame afar,
The smiling days that sweetly vocal are
The happy blessed Mother-land !
Her will by seventy million arms upheld,
Her strength no man scorn :
Thou art my head, thou art my heart,
My life and soul art thou !
My song, my worship and my art
Before thy feet I bow !
As Durga, scourge of all thy foes,
As Lakshmi, bowered in flower
That in the water grows,
As Vani, wisdom, power,
The source of all our might,
Our every temple doth thy form uphold
Unequalled, tender, happy, pure
Of splendid streams, of glorious trees,
My mother-land I sing !
The stainless charm that shall endure
And verdant banks and wholesome breeze
That with her praises sing !*

*From : The London Times, 13th September, 1906

BANDE MATARAM

(Addressed to India)

Translated by SRI RAJ NARAYAN BOSE

I worship thee, O Mother !
Thee the nice-watered, bearing nice fruits, cooled by zephyrs,
Verdant with the corn-plant,
Whose nights are cheered by the silver moonlight,
Whose bosom is decked with trees, bearing flowers in full bloom,
The smiling, the melodiously-speaking,
The giver of happiness, the giver of boons, the Mother.
Thou art terrible with the shouts of two hundred millions
And sharp swords seized by four hundred millions of hands ;
Who says, Mother, thou art weak ?
I bow before thee, endowed with great strength, the salvatrees,
The vanquisher of enemies, the Mother.
Thou art knowledge, thou art religion,
Thou art the heart, thou the vitals,
Thou the life in the body.
Thou art the strength of our arms,
Thou art the feelings of love and veneration in our hearts ;

From : *Old Hindu's Hope or A Proposal for the Establishment of a Hindu National Congress.*

Thine is the image
Set up in temple after temple.
Thou art Durga, bearing the ten weapons,
Thou art Lakshmi who dwellest in the lotus bud,
Thou art Saraswati, the giver of knowledge,
We pay homage to thee ;
We adore thee, O Mother !

The goddess of fortune, the pure and the peerless,
The nice-watered, bearing nice fruits, the Mother ;
We adore thee again and again,
The verdant, the simple, the well-decked,
All bearing, all cherishing, the Mother.

VANDE MATARAM

Translated by NAGENDRA NATH GUPTA

Obeisance to thee, Mother !
Sweet is thy water, sweet are thy fruits, cool is the
sandal-scented breeze from the south,
Green are thy cornfields, Mother !
Gladdened are thy nights by the white moonlight,
Decked art thou by the trees with flowers in bloom,
Sweet-smiling, sweet-spoken,
Bestower of happiness and boons, Mother !
Terrible with the shouts rising from seventy million
throats,
Twice seventy million hands armed with edged swords,
Why do thy call thee feeble, Mother !
Possessed of mighty strength, saviour, I bow to thee !
Vanquisher of the enemy, Mother !
Thou art knowledge, the faith art thou,
Thou art the heart, the core thou,
Thou art the life in the body,
Thou art the strength in the arm,
The devotion in the heart,
Thy image we build in temple after temple !
Thou art Durga holding ten weapons,
Lakshmi art thou seated on the petals of the lotus,
Saraswati thou, the giver of knowledge, to thee I bow,
I bow to thee, Lakshmi, the pure, the peerless,
Sweet-watered, sweet-fruited Mother !
Obeisance to thee, Mother !

Green-hued, unsophisticated, sweet-smiling, ornamented,
Nourisher of the Earth, Mother !*

BANDE MATARAM

Translated by SRI AUROBINDO

Mother, I bow to thee !
Rich with thy hurrying streams,
Bright with thy orchard gleams,
Cool with thy winds of delight,
Dark fields waving, Mother of might,
Mother free.
Glory of moonlight dreams,
Over thy branches and lordly streams,
Clad in thy blossoming trees,
Mother, giver of ease,
Laughing low and sweet !
Mother, I kiss thy feet,
Speaker sweet and low !
Mother, to thee I bow.
Who hath said thou art weak in they lands,
When the swords flash out in seventy million hands
And seventy million voices roar
Thy dreadful name from shore to shore ?
With many strengths who art mighty and stored,
To thee I call, Mother and Lord !
Thou who savest, arise and save !
To her I cry who ever her foemen drave
Back from plain and sea
And shook herself free.
Thou art wisdom, thou art law,

* English rendering by the late Nagendranath Gupta (1861-1940)

Thou our heart, our soul, our breath,
Thou the love divine, the awe
In our hearts that conquers death.
Thine the strength that nerves the arm,
Thine the beauty, thine the charm.
Every image made divine
In our temples is but thine.
Thou art Durga, Lady and Queen,
With her hands that strike and her swords of sheen,
Thou art Lakshmi lotus-throned,
And the Muse a hundred-toned.
Pure and perfect without peer,
Mother, lend thine ear.
Rich with thy hurrying streams,
Bright with thy orchard gleams,
Dark of hue O candid-fair
In thy soul, with jewelled hair
And thy glorious smile divine,
Loveliest of all earthly lands,
Showering wealth from well-stored hands !
Mother, mother mine !
Mother sweet, I bow to thee
Mother great and free !

BANDE MATARAM

Translated in Prose by Sri Aurobindo

I bow to thee, Mother,
richly-watered, richly-fruited,
cool with the winds of the south,
dark with the crops of the harvests,
the Mother !

Hey strands rejoicing in the glory of the moonlight,
her lands clothed beautifully with her trees in flowering bloom,
sweet of laughter, sweet of speech,
the Mother, giver of boons, giver of bliss !
Terrible with the clamorous shout of seventy million throats,
and the sharpness of sworeds raised in twice seventy million hands,
Who sayeth to thee, Mother, that thou art weak ?
Holder of multitudinous strength,
I bow to her who saves,
to her who drives from her the armies of her foemen,
the Mother !

* TRANSLATOR'S NOTE

It is difficult to translate the National Anthem of Bengal into verse in another language owing to its unique union of sweetness, simple directness and high poetic force. All attemps in this direction have been failures. In order, therefore, to bring the reader unacquainted with Bengali nearer to the exact force of the original, I give the translation in prose line by line.

Thou art knowledge, thou art conduct
thou our heart, thou our soul,
for thou art the life in our body,
in the arm thou art might, O Mother,
in the heart, O Mother, thou art love and faith.
It is thy image we raise in every temple.
For thou art Durga holding her ten weapons of war,
Kamala at play in the lotuses
and Speech, the goddess, giver of all lore,
To thee I bow !
I bow to three, goddess of wealth, pure and peerless,
richly-watered, richly-fruited, the Mother !
I bow to thee Mother
dark-hued, candid,
sweetly smiling, jewelled and adorned,
the holder of wealth, the lady of plenty
the Mother !

BANDE MATARAM

Translated by Ram Sharma*

Mother, to thee I bow !
Rich with fine streams and fruits art thou !
Cool breezes, cornfields green, are thine,
Mother mine !
The silver thrilling moonlight night,
Gay groves with blooms and flowers bedight !
Sweet smiles, mellifluous speech, are thine,
Giver of bliss and boons benign
Mother mine !
With many million ardent throats,
Singing thy praise with swelling notes
With many million sturdy hands,
Defending thee with sharpen'd brands,
How art thou weak, when these are thine,
Mother mine !

Yes, might immense is thine,
From throng on throng of ruthless foes,
From perils dire, and whelming woes,
Defender and Deliverer thou !
To thee I bow,
Mother mine !
Wisdom and Righteousness thou art !
Thou, sovereign spirit of the heart
And vital air within !

Thou givest vigour to the arm.
And to the breast devotion warm ;
In every home, in every shrine,

* Nabakrishna Ghosh (1837-1920)

The image all adore is thine,
Mother mine

Thou, ten-armed Durga, whom fell demons fear !
Thou, lotus-ranging Lakshmi, ever dear !
Goddess of Art, bright Saraswati thou !
To thee I bow !

O Fortune's Pow'r divine !
Faultlessly fair,
Beyond compare,
Rich with fine streams and fruits art thou,
Mother mine !

Mother, to thee I bow !
With robe of green, devoid of guile,
With grace adorne'd and lovely smile,
Earth ever bounteous, thou !
Nourisher, cherisher benign
Mother mine !

BANDE MATARAM

Translated by Harinath De*

Here is a fairly literal version of this national song, by an esteemed correspondent[1] of our, keeping as far as possible the spirit and rhyme-system of the original ...

"Mother, hail !
Thou with sweet springs flowing,

*1 Supposed to be HARINATH DE
From : *Indian Mirror*, Saturday, November 11, 1905.

Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn-crops growing,
Mother, hail !
Thou of the shivering-joyous moon-blanched night,
Thou with a fair groups of flowering tree-clumps
bright,

Sweetly smiling,
Speech-beguiling,
Pouring bliss and blessing,
Mother, hail !

Though now seventy million voices through
thy mouth sonorous shout,

Though twice seventy million hands hold
thy trenchant sword-blades out,
Yet, with all this power now,
Mother, wherefore powerless thou ?
Holder thou of myriad might,
I salute thee, saviour bright,
Thou who dost all foes affright,
Mother, hail !

Thou sole creed and wisdom art,
Thou our very mind and heart,
And the life-breath in our bodies,
Thou, as strength in arms of men,
Thou, as faith, in hearts, dost reign,
And the form from fane to fane
Thine, O Goddess !
For, thou hast the ten-armed *Durga's* power.
Riches thrones thee in her lotus-bower,
Wisdom thee with deity doth dower,
Mother, hail !

Lotus-throned one, rivalless,
Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and waters bless
Mother, hail !
Hail, thou, verdant, unbeguiling,
Hail, O decked one, sweetly smilling,
Ever bearing,
Ever rearing,
Mother, hail."

BANDE MATARAM

Translated by Basanta Coomar Roy

"Mother, hail !
Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn-crops growing,
Mother, hail !

Thou of the shivering joyous moon-blanched night,
Thou with fair groups of flowering tree-clumps
bright,
Sweetly smiling
Speech beguiling
Pouring bliss and blessing,
Mother, hail !

Though now three hundred million voices through
thy mouth sonorous shout,
Though twice three hundred million hands hold thy
trenchant sword-blades out,

Yet with all this power now,
Mother, wherefore powerless thou ?
Holder thou of myriad might,
I salute thee, saviour bright,
Thou who dost all foes affright,
Mother, hail !

Thou sole creed and wisdom art,
Thou our very mind and heart,
And the life-breath in our bodies,
Thou as strength in arms of men,
Thou as faith in hearts dost reign.

Himalaya-crested one, rivalless,
Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and waters bless,
Mother, hail !
Hail, thou verdant, unbeguiling,
Hail, O decked one, sweetly smiling,
Ever bearing,
Ever rearing,
Mother, hail !*

BANDE MATARAM

Translated by Naresh Chandra Sengupta

Hail thee mother ! To her I bow,
Who with sweetest water o'erflows

Translated anonymously, when it was illegal even to utter the word Bande Mataram.
From *Dawn Over India,* by BANKIM CHANDRA CHATTERJI
Translated and adapted from Bengali by BASANTA COOMAR ROY

With dainty fruits is rich and endowed
And cooling whom the south wind blows
Who's green with crops as on her grow ;
To such a mother down I bow !

With silver moon beams smile her nights
And trees that in their bloom abound
Adorn her ; and her face doth beam
With sweetest smiles, sweet's her sound !
Joy and bliss she doth bestow ;
To such a mother down I bow.

Resounding with triumphal shouts
From seventy million voices bold
With devotion served by twice
As many hands that ably hold.
The sharp and shining rapier bold
—Thou a weakling we are told ![1]

Proud in strength and prowess thou art,
Redeemer of thy children thou ;
Chastiser of aggressive foes ;
Mother, to thee thy child I bow.

Thou art knowledge, thou my faith,
Thou my heart and thou my mind,
Nay more, thou art the vital air
That moves my body from behind.
Of my hands thou art the strength
At my heart devotion thou,
In each temple and each shrine,
To thy image it is we bow.

Durga bold who wields her arms
With half a score of hands,

1 Another reading would give : "Why art thou so weak with so such strength ?"

The science-goddess, Vani too,
And Lakshmi who on lotus stands,
What are they but, mother thou,
To thee in all these forms I bow !

To thee ! Fortune-giver, that art
To fault unknown, beyond compare,
Who dost with sweetest waters flow
And on thy children in thy care
Dainty fruits dost rich bestow,
To thee, mother, to thee I bow !

To thee I bow, that art so green
And so rich bedecked ; with smile
Thy face doth grow ; thou dost sustain
And hold us—still unknown to guile !
Hail thee mother ! To thee I bow !*

BANDE MATARAM

(Published in THE STATESMAN, Oct 29, 1905)

Hail Mother !
Sweet thy water, sweet thy fruits,
Cool blows the scented south wind,
Green waves thy corn,—

Mother !

Land of the glad white moonlit nights,
Land of trees with flowers in bloom,
Land of smiles, land of voices sweet,
Giver of joy, giver of desire,

Mother !

* From : *The Abbey of Bliss* (*Tr. of Anandamath*, by NARESH CHANDRA SEN GUPTA)

Seventy million voices resounding ;
Twice seventy million arms in resolve uplifting—
Dare any call—Thee weak ?
Obeisance to Thee ! O Thou, mighty with
multiple might,
Redeemer Thou, Repeller of the enemy's hosts—
Mother !
In Thee all knowledge, Religion Thou,
Thou, the heart, Thou, the seat of life,
The breath of life in the flesh !
O Mother, the strength of this arm thine ;
Thine the devotion in the heart ;
Thine the image consecrate
From temple to temple !
The wielder of ten arms, Durga, Thou,
Thou the Goddess of wealth, bower'd in the lotus,
Thou the Muse dispersing wisdom,
Obeisance to Thee !
Salutations to Thee ! Holder of wealth, peerless,
With thy limpid water and luscious fruits,
Mother ! Hail, Mother !
Verdant, artless, sweet, smiling,
Radiance-holding, nourishing,
Mother, Mother, Hail !

BANDE MATARAM

(Published in INDIAN REVIEW, January, 1906)

Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn tops growing,
Mother, hail !

Thou of the shivering joyous, moon-blanched night,
Thou with fair groups of flowering tree-clumps bright,
Sweetly smiling,
Speech beguiling,
Pouring bliss and blessing,
Mother, hail !

Thou sole creed and wisdom art,
Thou out very mind and heart,
And the life-breath in our bodies,
Thou as strength in arms of men,
Thou, as faith in hearts doth reign,
And the form from fane to fane,
Thine, O Goddess !

For thou hast the ten-armed Durga's power,
Riches thrones thee in her lotus-bower,
Wisdom thee with deity doth dower,
Mother, hail !

Lotus-throned, rivalless,
Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and waters bless,
Mother, hail !

Hail, thou, verdant, unbeguiling,
Hail, O ! decked one, sweetly smiling,
Ever bearing,
Ever rearing,
Mother, hail !

BANDE MATARAM

(Published in HINDU PATRIOT, March, 1906)

Mother, O ! Thy glory singing !
Waters flowing, crops abounding,

Far from hills cool zephyr blowing,
Wavy fields with green corns ripening,
Mother !
With effulgent moon thy nights bewitching,
Laughing flow'rs the sylvan trees enriching,
Smiling sweet, of speech divine and soothing,
Joy-dispensing, given thou of blessing Mother !
Burst forth sev'n crore throats in awful shout
tremendous,
Grasp in hands twice seven crore thy swords all
flashing furious !
Thine is such might ! Powerless still thou, Mother !
Thou unequalled prowess wielding,
Saviour, I to thee am bowing,
Thou, our banded foes destroying Mother !
Thou are knowledge, and thou are faith,
Thou are the heart, and thou the mind,
Thou in corporal frames the breath !

Thine the strength all, that our arms hold,
Thou with rev'rence our hearts dost move,
Thine the forms in temples we mould,
Durga, thou ten weapons holding,
Kamala, on lotus sporting,
Bani, Goddess of all learning,
Thee am I adoring !
Kamala, I to thee am bowing,
Spotless thou and all transcending,
Waters flowing, crops abounding,
Mother O ! Thy glory singing !
Verdant thou and unpretending,
Gracious smiles benignant wearing,
Ye Oh Earth, thou all-supporting,
Mother !

(TRANSLATED BY SIMAB AKBARABADI)
URDU

بندے ماترم

(Translated by SIMAB AKBARABADI)

مادر وطن! ہم تجھے سلام کرتے ہیں
تیرے پانی کی ندیاں خوبصورت ہیں
تیرے پھل میٹھے ہیں
تو جنوب کی طرف سے آنیوالی ٹھنڈی ہواؤں سے
سرشار رہتی ہے
تو ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور ہے
تیری چاندنی سفید اور حسین ہے
تیری راتیں کھلی ہوئی ہیں
پھولوں سے لدے ہوئے درخت تیری رونق کو دوبالا
کر رہے ہیں
تیری مسکراہٹ میں مٹھاس ہے
تیری آواز میں رس ہے
تو سکھ دیتی ہے
تو ہماری خبرگیری کرتی ہے
ہم تیس کروڑ آوازوں کو ایک آواز بنا کر تیری فتح
کے گونجتے ہوئے نعرے بلند کریں گے
ہم ساٹھ کروڑ بازوؤں میں تلوار لیکر تیری حفاظت
کریں گے
تجھے کمزور کون کہتا ہے، ماں!
تو تو بڑی طاقت کی مالک ہے
تو دشمنوں کی چھاؤنیوں کو مٹانے والی ہے
تو ہماری خبرگیری کرنے والی ہے
ہم تجھے سلام کرتے ہیں

কথা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি: সরলা দেবীচৌধুরাণী

র্স র্স । — নর্স র্রর্স । নোধপাধপা । মপামগাগর। — ৪ । ম্র
ব ন্দে — — — — — মা — — ত রম্ — মা —

ম । গমপামপাধ । পধনোধনোর্স । নোর্সর্রর্স । র্সর্রর্সনো
— — — — — — — — — — — — ত র —

ধপাম । পা । র্স । নর্সর্রর্সনোনোধ । পাধপামপামগা । গর ॥ র্র
— — ম্ বন্ দে — — — — মা — — ত রম্ সু

গাম । —পারগা । রসানাসা । —৪ । রুরমাম । প গমাধপা । রপা
জ লা — ম্ সু ফ লা — ম্ — ম ল য় জ শী — ত লাম্

— ৪ । মপা । না । ধনর্সনা । সা । র্সনা । রর্স । র্সর্রর্সনোপাম
— শ স্য শ্যা — ম লাং মা— — ত র — —

পা । র্স । র্সর্রর্সনোধপা । রগামগা । গর ॥ মপা । নাধনা
ম্ বন দে — — — মা — — ত রম্ শু ভ্র জ্যোৎ স্না

র্সর্র । র্রর্সর্সর্স । র্সর্সর্স । সানানা । র্সর্সর্স । পানার্সর্স
— পু ল কি ত যা মি নীং ফু ল্ল কু সু মি ত দ্রু ম দ ল

পা
নর্স র্র র্র । [র্স নো ধ । নো ধ নো । ধ নো সা র্র । র্স
শো ভি নীং সু হা সি নী — ম্ সু ম ধু র ভা

নোধপাম]পানর্স । গা মপার্স । সার্নর্রর্স । র্সর্রসানো
ষি নীং — সু খ দাং ব র দা ম্ মা — — ত র —

ধপামপা । র্স । নোর্সর্রর্সনোধপা । রগামগা । গর । মর্র
— ম্ বন্ দে — — — মা — — ত রম্ মা —

মা । গমপামপাধ । পধনোধনোর্স । নোর্সর্রর্স । র্স র্র র্স
— — — — — — — — — — — — ত র

নোধপাম । পা । র্স । নর্সর্রর্সনোনোধ । পাপধমগা । গর ॥
— — — ম্ বন্ দে — — — মা — — ত রম

বন্দে মাতরম্ : কয়েকটি অভিমত

ড. মহম্মদ শাহিদুল্লা

...বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাঙালির জাতীয় জীবন ছিল না, জাতীয় জীবনের আদর্শও ছিল না। বঙ্কিম 'সর্ব মনোরম্য গিয়া'র মধ্যদিয়া তাঁহার জাতীয় আদর্শ চোখের সম্মুখে আনিয়া দিয়াছিলেন। দিশাহারা তরণী তাহার ধ্রুবতারা পাইল। বাঙালির জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হইল। এইজন্যই তিনি বাঙালির জাতীয়তার জনক ও নমস্য। কেহ বলিবেন, তাঁহার বাঙালি হিন্দু বাঙালি, অহিন্দুর জন্য তাঁহার কোন অবদান নাই। আমি বলিব বাঙালি বাঙালিই, সে হিন্দুই হউক অহিন্দুই হউক। অহিন্দু বাঙালিরও যিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন, তিনি সমগ্র বাঙালির তেমনই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন, যেমন হিন্দু বাঙালির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা। অখণ্ড বাঙালি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক বিরাট পুরুষ। এই বিরাট পুরুষের যে কোন অঙ্গের যিনি হিত সাধন করিবেন, তিনিই সমস্ত বাঙালির প্রিয়। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই অকৃতী বঙ্গসন্তান এই মহাপুষের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে।

কাজী আবদুল ওদুদ

...বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রবর্তক। তিনি অপূর্ব ভাষার আকর্ষণে বাঙালিকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তিনিই মাতৃরূপের প্রথম পূজারি। 'বন্দে মাতরম্' ও 'আনন্দমঠে'-এর প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, উহাতে সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ একান্তই মিথ্যা। উহার মধ্যে জন্মভূমির দিব্যরূপ ও দেশসেবায় সন্তানধর্মের ত্যাগ, নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। ...ইহাতে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন কোন প্রশ্নই নহে। মানুষের প্রশ্নই প্রশ্ন এবং সেইখানেই বঙ্কিম ও বন্দে মাতরম্ বিরাট। অতিরিক্ত হিন্দু হওয়ার দরুন বিরাট বঙ্কিম যদি কোথাও খর্ব হইয়া থাকেন, তাহাই অভিযোগের বিষয়। বঙ্কিমের দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা 'বন্দে মাতরম্ সাধনা হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত ভারতীয় মহামানবের সাধনা। স্বাতন্ত্রের মধ্য দিয়া হিন্দু মুসলমান সত্য নয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্য দিয়াই তাহারা সত্য। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে বঙ্কিম ও জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম্‌কে ছোটো করিবার চেষ্টা সাহিত্যের দৃষ্টিতে অনাবশ্যক ও অসমীচীন।

স্যার যদুনাথ সরকার

...বন্দে মাতরম্ গানটিতে আপত্তি উঠিয়াছে যে উহা হিন্দু মূর্তি পূজার স্তোত্র। সত্য বটে, হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর বর্ণনা যে সব 'সাধন' গ্রন্থে আছে তাহা খুঁজিয়া এ'পর্যন্ত একটিও 'সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্য শ্যামলা' রূপধারিণী দেবীমূর্তি পাওয়া গেল না। সত্য বটে, সন্তান নেতাগণ বারে বারে বলিতেছেন —আমরা অন্য মা মানি না। ...আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই...আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা...তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" ..."আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেন না, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্য মাতৃক।" (তৃতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ)। কিন্তু তাহাতে কী হয়? স্বয়ং গ্রীয়রসন্ সাহেব বলিয়াছেন, 'বন্দে মাতরম্' অর্থে 'জয় মা কালী' (An invocation to kali)।

আহা, এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে কি বিলাতে বহুভাষাবিদ মহাপণ্ডিত হওয়া যায়? সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ সাহেব পণ্ডিত 'বিম্বাধরের' অনুবাদ করিয়াছেন 'চন্দ্রের চক্রের মতো গোলাকার অধর'। ...তাই 'বন্দে মাতরম্' মানে হয়েছে 'জয় মা কালী!

গুরুসদয় দত্ত

...বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিংশকোটি বলেন নাই, তিনি বলিয়াছেন সপ্তকোটি। আগে বাংলাকে ভালোবাসিতে শিখিতে হইবে, তারপর ভারতবর্ষের উপর ভালোবাসা আসিবে। একবার যখন হায়দ্রাবাদে স্যার আকবর হায়দারীর আতিথ্য গ্রহণ করি তখন একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারী তাহাদের সঙ্গে একত্রে বন্দেমাতরম সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় মুসলমান মাত্রই বন্দে মাতরম্-এর বিরোধী নহে। বন্দে মাতরম্কে জাতীয় সঙ্গীত করিতে হইলে যেভাবে হারমনিয়ম যোগে উহা গান করা হয় সেই ভাবে করিলে চলিবে না। সমস্ত লোক যদি সঙ্গীতে যোগ দিতে পারে তবেই উহাকে জাতীয় সঙ্গীত বলা যাইতে পারিবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায

...দেশ ভক্তির আবশ্যকতার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে (আনন্দমঠের মূলকাহিনির সূত্রধর রূপে) যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল উৎস তো সেই দেশমাতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি এবং ভালোবাসার অনুভবকে জাগরিত করা। আনন্দমঠের সন্তানগণ কোন রূপ জাতি বিদ্বেষের বশে দেশভক্ত হয়

নাই। তাঁহারা স্বদেশকে 'ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে' মনে করিতেন, এবং এইভাব প্রেরণার বলেই স্বদেশকে অত্যাচার উৎপীড়নের কবল হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

...গীতায় যেরূপ কুরু-বিদ্বেষ প্রচারিত হইয়াছে বলিলে ভুল হয়, 'বন্দে মাতরম্'কেও তেমনই জাতিবিদ্বেষমূলক সঙ্গীত বলিয়া প্রচার করিলে সত্যকেই গোপন করা হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন—"দেশ প্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পরের সামঞ্জস্য চাই, তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে." বলা বাহুল্য, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এই দেশপ্রীতি সর্বদেশে, সর্বসময়ে, সর্বজনের আদর্শ হইবার যোগ্য। .